

4028
(82/222) (H2)

কবিতা

আমিন ১৩৬৬

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

ক্রমিক সংখ্যা ৯৯

তিনটি কবিতা

জীবনানন্দ দাশ

নির্জন হাঁসের ছবি

নির্জন হাঁসের ছবি দেখি যখন—চারিদিকে অন্ধকার ঘর,
কপোলা গরিমা ভার—যেন হীরকের হিংসা যুগের ভিতর।
যত দূর চোখ যায় কাকর মুখের যেখা নদী যেন ফির,
কাকর মেঘার মতো ঘেন্না অরণ্যের।
রাত যেন লেবুর ফুলের মতো নক্ষত্রের গন্ধ দিয়ে ঘেরা।
শান্ত সব প্রতিবিম্ব,—এই সব বেদনার সুর।

বড়ো-বড়ো গাছ

বড়ো-বড়ো গাছ কেটে ফেলছে তারা।
এই সব উচু-উচু গাছকে আমার ইচ্ছা লালন করেছিলো;
আমার দেহের ভিতর রক্তাক্ত কাঠের গন্ধ;
আমার মনে শহর ও সভ্যতার মতো শক্ততা;
আমি দিনের আলোয়
কিংবা নক্ষত্র যে-আভা আনে রাতের পর রাতে
এই মৃত গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি।

মাছবকে পাড় করাতে চাচ্ছে আঁধো মাছবের গ্রহাস।

অনেক দিন মেখেছি : উচু-উচু গাছ গাড়ির রয়েছে সব;

কবিতা
আশ্বিন ১৩৬৬

আরো অনেক দিন দেখেছি : উচু-উচু গাছ কাকের ভিড়ে নীল আকরান হ'য়ে
দাঁড়িয়ে রয়েছে সব ;
তবুও তারপর দেখেছি : রাত্রির সমুদ্রের পারে নিস্তর লুকাইত বীণ যেন
এক-একটা গাছ—
ছন্দকে বাছড়ের মতো আকাশের দিকে ভেসে যেতে ব'লে—
মাছকে দাঁড় করাতে চাচ্ছে ।

মনকে আমি নিজে

এই জীবনের ছকে-কাটা খেলার ঘরে এসে
হিসেব ক'রে তোমাকে ভালোবেসে
আমি যদি জরী হতাম—আলো পেতাম না তো ।
ভালোবাসার অকূল সাগর বটের পাতায় ভেসে
পাড়ি দিতে চেয়েছি আমি তোমাকে ভালোবেসে ।

তোমার ভালোবেসেছি ব'লে ঋণ
অথবা চুরি ক'রে আমি এই জীবনের দিন
পেয়েছি—চোর ভালোবাসার দর্দে জানী ব'লে
মরনদী মুখে জীবননদীর পটভূমি
জেনেছে এই নিখিলে শুধু রয়েছে। একা ছুমি ।

যদি এমন চ'লে যাবে তবে
কালের মহাসাগর হ'য়ে রবে
আমার হাতের জলের অঞ্জলি :—
মন ছাড়া কেউ বোঝে না তাই মনকে আমি বলি ।

কবিতা
বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

ভিখারিনী

জ্যোতির্ময় দত্ত

বুড়ি নয় । আসলে গাছের গ্রেত
কোনো এক পুরাকালে বাড়ি প'ড়ে গিয়ে
এখন ভিখিরি সেজে ব'সে আছে চটের বাকলে ।
এতো স্থির মনে হয় ফুটপাতে ইটের তলায়
কে জানে হয়তো আজো আছে তার শিকড় ছড়ানো ।

কখনো-কখনো, খুব নিস্তর দুপুরে,
যেখানে সে ছিলো, দেখি, বুড়ি নেই । শুধু
শীতল, গভীর, গাঢ় অন্ধ কিছু ফুটপাতে প'ড়ে ।
বহুকাল ব'সে থেকে রেখে গেছে শরীরের ছাপ ?
যদিও হারিয়ে গেছে এখনো রয়েছে প'ড়ে ছায়া ?

আছে সে কি সশরীরে ? নাকি কোনো দূর শতকের
মরীচিকা আজ ঐ ফুটপাতে কাঁপে ?
এমন রোদুর্বে বৃষ্টি গ্রেতেরাও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে ?
অথবা হয়তো এরা বায়ুতে গোপন লিপি
অবৃষ্টি কালিতে লেখা সাংকেতিক ভাষা :—

শহরের গায়ে কেউ এই সব চিহ্ন একেছিলো,
ভেবেছে উঠবে ফুটে এনপরে আশ্রয় দরলে,
স্পষ্ট হবে প্রলয়ের বাণী,
দুপুরে গরমে আজ সেই চিঠি ঝাঁপ হ'য়ে গেছে ;
এই জাখো, লেখা আছে ভিখারিনী, অন্ধ, খর, বৃষ্টি বাস্তবহারা,

কবিতা
আবিন ১৩৬৩

কয়েক আঁচড় মাত্র,—রূপ নিলো হ্যাংলা কুহুরি,—
এবং দুটকিগুলো—কুকুরের ছানি,—
চর্চাদার সেই চিহ্ন—তার পায়ে লেগে আছে যেন।
এ-প্রেক্ত-স্তনের মূলে উষ্ণ, ঘন দুধ আছে জমা।

হে স্বর্ষ! মার্তওদেব! ঘন মেঘে ঢাকো
তোমার প্রদীপ্ত মুখ; এ-নয়ন অন্ধ হ'য়ে যাবে।

বুটিতে ভিলছে এক কাক আর বুড়ি।
বুটির অ্যাসিঙে যদি ক'য়ে গিয়ে-গিয়ে
পুথিবাঁটা হ'য়ে যায় স্তীর্ণ এক ছড়ি
তবু তারা নড়বে না, বলবে না কেউ কোনো কথা।

কবিতা
বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

চারটি কবিতা

শিল্পী

মণিকৃষ্ণ তর্জাচার্য

তোমার প্রশস্তি রটে জনপ্রোতে হাটে ও বাজারে।

বিমুগ্ধ ভক্তের দল করছোড়ে চলে দেয় ত্ততি
নিপুণ সংলাপ টানো বালিক-হুলত কর্তব্যরে,
এখনো হয়নি কিন্তু এদিকের দীপিত প্রশস্তি।

প্রাকৃত প্রণয়ে ময় সংখ্যাতীত তোমার প্রেমিক,
মনোরম গল্প রটে, কানাকানি নিত্য বার শোনা;
হৃদক শিল্পীর পক্ষে মিলে গেছে সব ঠিক-ঠিক—
অপায়ে ঢেলো না, সবী, অহেতুক তোমার করুণা।

স্বপ্নাঠা উপভাসে আমি এক নিরেট অধ্যায়।
তোমার পায়ের শব্দে আতঙ্কিত নির্জন ছপ্পুর,
পরিব্রাজ্ঞ অনন্তরব : ভীতিকর অস্বপ্নী সন্ধ্যায়
অন্তরালে বেজে ওঠো শরীরিণী থেয়ালি নৃপুর।

সময়কে জেলে রাখো অন্ধ অবচেতনার তীরে,
পতঙ্গের মতো রাত্রি পুড়ে মরে তোমার শরীরে।

কবিতা

আদিন ১৩৬৬

কোনো জীবিত কবির প্রতি

তোমার মৃত্যুর পরে পনেরোটি গ্রন্থ বেরোবে
বিভিন্ন সাহিত্যপথে। শোকসভা বসবে জমাতি
বক্তৃতার কানেক-কানেক বীরত্ব কপালের খাম মুছে দেবে,
বিদ্বৎ সভাপতি নিজেকেই ভাববে সম্রাট।

তোমার কীর্তিকে ঘিরে অত্র কীর্তি করবে ঘোষণা
গ্রন্থকীট গবেষক, সামাজিক স্বযোগগদ্বানী;
উদ্ধৃতির কাঁটাভারে বাঁধা হবে কবিতার ফলের সোনা,
দূরবে প্রদায় চিত্রে পরিতুষ্ট বৃন্দমান প্রাণী।

জানি, তুমি যুদ্ধ হেসে চলে যাবে এই অবসরে
শোকের সমুদ্র থেকে আলোকিত উৎসের সমুদ্রে
পার হ'রে মহানদী প্রার্থনা জানাবে কর্তব্যে
আরক্ত পায়ের চিহ্ন বিচলিত সময়ের মুকে।

অংশত মাহুম আর একত্রির রহস্তের গীমা
খুঁজে-খুঁজে চলে যাবে অত্র এক পৃথিবীর পথে,
যৌবনের রক্তপথে উন্মোচিত মৃত্যুর মহিমা
আলো হাওয়া মেঘ পাখি খুঁজে পাবে নিরব্র জগতে।

মাটির পৃথিবী আর ভূস্থিহীন মাহুমের ঘরে
অদান ঐশ্বর্যে তুমি জলে ওঠো অতি সংগোপনে,
তোমার অস্তিত্ব শুধু আঁকা হবে আলোর অঙ্গরে
প্রেমিসের রক্তস্রোতে, কর্তব্যের, দৃষ্টিতে, চুপনে।

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

অন্ধকারের গল্প

বুঝ এসে ডুবে গেলো বলরাম সরকারের ঘাটে।

উজ্জল ছুপুরে রৌদ্র : শহরের মাছদের ভিড়ে
শদের শরীরে জন্মে হিম হ'লো জনতার হাটে,
অন্ধিম শীতল শান্তি শোকাহত স্রোতের গভীরে।

কতদিন নৃকিয়েছে কার্যমের খুঁটি কিংবা তাস
বন্ধুর আজ্যায় ; আঁধো রবিবারে অলস ছুপু
কাটানোর কথা ছিলো অন্তরদ গল্পের আকাশ
বুকে নিয়ে। কিন্তু তার রক্তস্রোতে তরঙ্গিত হব
অন্ধকারে আতঙ্কিত আকাজ্ঞার আঘাতে চঞ্চল,
এতক্ষণ নিয়ে গেছে বহুদূর জোয়ারের জল।

ভালোবেসে হেঁটেছিলো পনেরোটি বছরের পথ নিরুদ্দেশে
নৃষ্টিহারা রাজি আর আশিনের আনন্দে, শব্দায় :
জীবনের সমুদ্রে পার হ'তে গিয়ে অবশেষে
মাঝ-পথে ডুবে গেলো সামান্য গদায়।
অশান্ত অস্তিত্ব তার অগোচরে পেয়েছে সম্মান,
পরিণামে সব গল্প আলোর আতিথেয় কল্পমান।

সারাদিন চটকলে জেটতে কেনের ওঠা-নামা
অশান্ত বর্ষের শব্দে ; কাঠ খড় ইট চুন বালি
পাটের ঐশ্বর্য নিয়ে মহাজনী নৌকার হাঙ্গামা
চুকিয়ে মাঝিরা শোনে অথথ হাওয়ার করতালি।

কবিতা

আখিন ১৩৬৬

ঢেউগুলো নেচে নেচে সারাদিন গল্প বলে যাবে
জীবন মুড়তে ময় কাহিনীরা পরমাণু পাখে নিরবধি,
শতাব্দীর পুরাতন গাঢ়তম রক্তধারা স্মৃতিকে ভেজাবে,
অবিরল বয়ে যাবে রূপালি কান্নায় ভরা আকাশের মতো এক নদী।

এ-ঘাটে দাড়িয়ে শুধু মনে হবে সব আলো খুব দীর্ঘ-খীরে
ঘুমিয়ে পড়েছে মান আলোকিত ঘুমের গভীরে।

সমাপ্তি

কাহিনীরা সমার্থক সংযোজিত পুনরুৎপাদনে।
অন্ধকার রাত্রি তার চূর্ণ করে ধূসর দর্শন,
বার্ধক্যে বিপর রক্ত আলোকিত সর্বশেষ ধাপে
স্বতন্ত্রাং স্বভাবের তোমার আতিথ্য কিছুক্ষণ।

দৈহিক দূরত্ব আর ঐকান্তিক শতক শপথে
ক্রমশঃ নিকটতর, নগ্নতার স্রাব, অবগাদ;
প্রাণদ শক্তির উৎস লবণাক্ত শোণিতের স্রোতে :
সংগোপনে জন্ম দেয় মৃত্যুময় জীবনের স্বাদ।

সময় শোনে না কারো আর্দ্রানন্দ, বিনীত ভাবণ।
কৃত্রিম অস্তিত্বে প্রায় সকলেই মৃত প্রকাশক,
আমাকে বিস্মৃত করে প্রত্যাহার যে-অমুশাসন
পরিণামে কী আশ্চর্য আমি তারই নিষ্ঠুর ব্যতক।

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

নক্ষত্রের মৃত নদী নিশীথের মান ছায়াপথে,
বৈদিক স্তোত্রের মতো মৃত্যুহীন আমি যষ্ট স্বত্ব,
ভূমিও প্রশান্ত হও শারীরিক আলোর জগতে
সমাপ্তির অন্ধকারে তৈরি হবে বিচ্ছেদের নেতু।

কবিতা

আদিন ১৩৬৬

ভারতীয় সূর্যাস্ত

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

কত ছায়া এ-দেখালে, ছায়া পড়ে বৃকে
নক্ষত্রের, টিকটিকির, কুহুমিত মালতীতরার ;
শুধু এক ছায়া আর কোনোদিন পড়ে না দেখালে,
কে আকাশ ? কে বাতাস ? পৃথিবী চক্কর মেঘ দিল্লির বেতার ।

গন্ধ দাও, পরিবর্তমান মেঘ, শান্ত বটগাছ,
পেমালা-পিরিচ গুণো, অমনেটে কিছু অলৌকিক !
যাতে দিলে যেতে পারি পিপুলের গভীর কোঠারে,
বুঝে নিতে পারি ফের আর্ষ ছুই পাবির প্রতীক ।

আপ্ট'নি কিরিদি তার অবিমল রক্তে করেছিলো
ভক্তিরঙ্গ অমৃতব ; অনেকই উত্তরাধিকার
নিষেধের হ'লেও ভাবে এটা শুধু জাহ্নবে বিধাস,
এই স্রোত একদিন দীপ্ত হ'বে বহমান ছিলো
বাউলের, বণিকের, অকণ্ট চাহীর শিরায়,
স্বাবর কি অস্বাবর ভাক এলে বেলে যেতো নম্র অনীহায় ।

রাজা অস্তে মশা ওড়ে ; ডেকচোরার—চুপ ক'রে একা ।
হঠাৎ দেয়াল-গড়ি দু'র কোনো পিতামহ লুটী দেয় তার ;
খোঁয়া-পঠা স্থপ, রুটি রবটের মতো ভূতা আনে,
ছুরি-চামচের শব্দ ; এসে, ছুগ—সে আসেনি আর ।

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

কেউ নেই—

দরজার কারুকাজে পাখি ব'সে আলোছায়াতেই ।
কে আমাকে টেনে নেয় বার-বার পিপুলের নিচে ?
রক্তের গভীরে বৃষ্টি পজালির গোপন বিস্তার ;
ততই ছড়ায় তার ভালপালা বয়সের স্বর্ধ ঘর ঢলে,
দৃশ্য যুগ ধূমপান চলাফেরা করে অধিকার ।

কবিতা

আখিন ১৩৬৬

ব্যালেরিনা

অমিতান্ত চট্টোপাধ্যায়

দিনগুলো কোনোক্রমে কেটে যায়। অসহিষ্ণু ঋতু
উন্মিষে যুবক গেলো শ্রীত নৌকা দূরতম জলে;
দূরতম জলে এক নাচঘর, শান্ত...নীল, মৃদু
মুটে আছে—বুটির কোঁটার মতো আশ্চর্য হিজলে।

রাতে কোয়ার্টেট, রাখা...গ্যালংজের মাতাল জ্যোৎস্নায়
ভূষারে আগুন ছোঁতে, রক্তে টলে যুবন্ত সঙ্গার;
জলের বন্ধকে আর এইখানে পাবে নাইজ্জার...
দিনগুলো দৃঢ় গান, বাসি...কৃষ্ণ, কয়েটির হাড়।

চতুর্দিকে চম্ভালোক। নষ্ট...ছিন্ন একার শরীর;
লজ্জার জটিল যজ্ঞে আমরণ শিখিল রমণী
অনিজ্জুক নীবিবদ্ধ থলে দিলো। প্রিয় নৌকাটির
সন্ধান না-পেয়ে, ধৃত সর্বনাশে ভালোলা তরগী।

শিল্প তার খসে গেছে। বিনিস্র মঞ্চের সব আলো
জ্বলবে ক্ষুরিত গুঠে নিবাণিত, অন্ধ হাংসার;
প্রিয় নৌকা...শ্রীত নৌকা! কেন তুমি দূর দেশ জালো
বধন কবিরে চক্ষে মালা নেই, মাটি নেই তার।

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

নাচের পুতুল

(একটি ব্যালে-নাচের মেয়েকে)

কবিতা সিংহ

তনে ও কটিতে শুধু সামান্য সাতিন
পৃথিবীকে ছুঁয়ে আছে দুপায়ের অগ্রভাগ তার
তাকে ধিরে আলো ঘোর জ্বলে-পড়া শাদা মৌমাছি
চারপাশে রমকে থমকায় কালো অন্ধকার।

মনে হয় পিঠে তার ভান্না আছে কাচের পতাকা,
অথবা সে হাস এক উভে-বাওয়া আলোর পালক,
অস্থিহীন, অলৌকিক, বেহ তার উড়ন্ত বলাক।
উপরে জ্যোতির দিকে তার ছুই বাহ উদ্ভালক।

হীরক-কঠিন উর অন্ধকারে জ্যোতি-সমকোণ,
কটিতে বৃত্তচাপ, বাহ কাঁপে সেভারের তার;
তবুও নাচের চেয়ে অপরূপ নাচের উঠোন
কারণ শরীর তার উচ্চনার তৃষ্ণার ভূদার।

নাচ শেষ হ'লে পরে কিরে এসো, উইংসের অন্ধকার কোণ
যত কাছে যেতে পারে তত কাছে নিয়ে এসো মৃৎ;
বর্ণিলেপে বিক্ষারিত নাচে ছুটি মোহন নহন,
অন্ধকারে ভুবে গেছে উজ্জ্বল বাহ, কটি, বৃষ্ণ,

নাচ-শেষে কিরে আর, নেচে গুঠে অপেক্ষার মন,
এতক্ষণে তোর নাচ ছাড়িয়েছে নাচের উঠোন।

কবিতা
আখিন ১৩৬৬

দয়িতার প্রার্থনা

অন্তর্ভেদী দুটি কোথায় গেলে !
করপুটে ধরো কামনার গাভীর ;
মহানামব্রত চিন্নয় দীপ জ্বলে—
অরিবলয়ে বরতছ উদ্‌গ্রীব !

জিহ্বা হাওয়ায় কুলাচার উজ্জীন,
মাদলিকের উচ্চারে নিস্পৃহ ;—
দুর্দাস্তের সংজ্ঞায় সৌখিন—
কোশলে জ্বালো শব্দার জতুহ ।

সংগোপনের সহবাস অতিরিক্ত,
প্রাবিত তথ্যে পুনরাপি উৎসব ;
যত স্বভাব উদ্বাহে ধারানিত—
যতদূর বাই শরাহত কিংবদন্ত ।

অসহিষ্ণুর সংগ্রামে উৎসাহ,
নেপথ্যে কেন, হে চতুর জীহাবাক !
দুঃসহ প্রেম স্বথ-অন্তর্দাহ—
অতঃপরের কাছে এসো, যুবরাজ ॥

কবিতা
বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

কান্না

আত্মের রঙাবো

পাখিরের ঝাঁক, পশুপাল, যত গ্রামীণ যুগতী
দূরে, আমি নতজাহ গুল্মবনে : গভীর পৌখলি
কবোঞ্চ সবুজ, হিম, নরম বাধামতকগুলি
ঘিরেছিলো চতুর্দিক, তবে কিদে জুড়ালো তিথ্যাহ ?

কে দেবে তুফার শান্তি, রুশভহ ওই বেজবতী
মালঞ্চ নিম্নল, মৌন বনস্পতি, আচ্ছন্ন আকাশ !
স্বপ্নের আত্মনা ছেড়ে এই হলদে ভাঁড়, কী দুর্গতি,
যেমে উঠি যেই ওঠে স্বর্গাত পানীয়টুকু তুলি ।

একটু নত হই : যেন বিজ্ঞাপন শুড়ির দোকান—
তখনই আকাশ জুড়ে প্রাণ্ড প্রাণের সর্বনাশ,
দেবতা দুর্গা-কোষে শিলা হোড়ে পুষ্করিণী-পানে ;
তুঘিত বাসুক-পরে পানপাত্র খলিত—হতাশা—

রোগনে দেখেছি স্বর্গ, তবু কর্তে অতৃপ্ত পিপাসা !

অহবাব : শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

কবিতা
আদিন ১৩৬৬

হেমন্তের গান

পোল ভেলের্ন

বিবাহের রং পায়
কে যেন বেহালায়
সে কি হেমন্ত,
করণ ক্ষতগুলি
হ্রদয়ে ভ'রে তুলি,
বাধা নিরন্তর।

সময় বলে, যাই
বাতাস পেতে চাই,
প্রগতি পাখুর,
যে-দিন পলাতক
জমেছে তারই শোক
অজ্ঞতারাতুর।

গ্রন্থ থাপা ঝড়ে
আমায় নিয়ে ওড়ে
কোথায়, হে বিধাতা,
জানি না কোনখানে
চলেছি কার টানে
বেমন স্বপ্না পাতা।

অচুবাব : শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

কবিতা
বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

অবরুদ্ধ নায়ক

গোপাল ভৌমিক

সমুদ্রে সমুদ্র নেই,
চিত্তের পাহাড়
উজ্জত ও প্রলম্বিত :
যাসে ঢাকা সমুদ্রমি
মুয়ে-পড়া মানসিকতার
পরিচয়বাহী ব'লে
চিন্তা গড়ে
বিত্রোহী প্রাকার।

যতই পাহাড় হই
যত করি আকাশ কামনা,
হৃদয় পায় না পূঁজে
শান্তি কিংবা মধুর সাধনা।
সে তার ধ্যানের শব্দে
বার-বার দিয়ে বায় ডাক
সে চায় সমুদ্র, শান্তি,
পাহাড় মাথায় তোলা থাক।

পাহাড়ে সমুদ্রে তবু
কল্যাণ হই দেবশোনা ;
এক হাতে তরবারি
আর হাতে শান্তির সাধনা
নিয়ে তবু
দূর হ'তে দূরে পথ চলি,
পথ জুড়ে আরাবলি।

অনুভব

প্রফুল্লকুমার দত্ত

কখনো জোয়ার আসে অজুত অথিতকর। আমেব-উজ্জ্বল
জীবনের—এমনে সমস্ত প্রাপ্তির জুড়ে বিশ্বর খোলাটে
নোনা মাটি ফেলে যায় : ধূসর প্রলেপ নিয়ে বহু কাল কাটে,
সাময়িক বহু মনে সর্ববিধ ফসলের সম্ভাবনা নাশ।

আবার জোয়ার আসে ! সেও প্রয়োজনহীন হয়তো জগতে,
অথচ একধিমন চিরন্তন ব্যাধিগ্রস্ত বলে, স্বাভাবিক
হস্তধার তাকে চায় : বাসুচরে সমাধির নির্জীব নাবিক
আবার ভাসায় তরী আবহমানের নর অহুয়নী প্রোতে !

তোমার করুণা করে, আন্তরিক প্রচেষ্টায়। দুদিনের রুখে
আমার ভোবার পালা : বিদ্রাস্ত জীবনময় বেদনা অগাধ—
উদ্ভির বীজের ভাবী ধারাটিকে তিলোত্তমা বামাবার সাধ
বার্ঘ্য হ'লে, উদ্ভাদনা আমার সম্বন্ধে নেয় বিনামূল্যে কিনে।

তথাপি বাস্তববাদী তোমাদের যুক্তি, তর্ক এবং অবয়ব
সব তার ছিঁড়ে দিলে জান্তব বিলাপে ভরে ছুরেলা হৃদয়।

ছুটি কবিতা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

অরণ্য

হরিৎ, খরাট বৃক্ষ ; গুহ্মলতা প্রতিবেশী মান।
কে এখানে মেঘ আসে—এই বনে বক্ষ কেউ নেই !
পাচটি ইন্দ্রিয় ওই প্রিয়তম নিয়তির পাশে
অবিচল থাকে, তাগে নিষিদ্ধ হৃৎকের এক ব্যাপ্ত মহাদেশ
চতুর্দিকে ফুলে গুঠে রত্নদক্ষ প্রবল কেশরে।

গাঢ় অন্ধকার, ঘোরের সম্পন্ন ময়াল, ছোটো অত হরিণীরা
প্রস্তুত মহাশয় ভোজে বাঘ দূর নদী দেখে আসে,
নদী শান্ত জলধারা ; কে তখনো পিছনে তাকায়
কোথাও নিসর্গ যদি পাহাড় চূড়ায় থেমে থাকে ;
—নীলাকাশ, পাখি যেন পাখি ডাকে পাখি ডাকে পাখি...

অকস্মাৎ তবু ফেরে বন
ফেরে নারী, রমা পশু ; অজ্ঞাতশিশুর গর্ভ ঢেকে রাখে শিলা,
দেবদারু-দৃশ্য ভরা আরক্ত কাঁটার কাগে রেখার পাতালে,
বিশাল চুলের মণী অবলুপ্ত করে সব অধীন আত্মাকে ;
তখন কোথায় কোটী, হে গোলাপ, আত্মীয় আমার।
—হেসে গুঠে নষ্ট হাওয়া ; শোনে নদী, তন্ত্রিত পর্বত ;
এমেধে কোন বার্তা আসে, বনে কেউ বক্ষ একা নেই ;

পাশাপাশি শুয়ে আছে গভীর নিঃসঙ্গ ছুটি রাত্রির সন্তান।

কবিতা
আদিন ১৩৬৬

নির্বোধ

সর্বজ সময় থেকে সে আনে দুখের অধিকার।
ফোটার দুর্লভ ধ্যানে মানবিক মুহূর্তের ফুল,
ক'রে যাবে জেনে তবু বসন্তসন্ধানী ব্যগ্র পাখির সংসার
তার কাছে রেখে যায় কান্ডনের প্রথম মূল।

অথচ তাকেও খেরে নৈরাধিক নীতির নির্বোধ,
চরিত্ররক্ষায় থাকে অন্দরমহলে পুরনারী।
সতর্ক করুণ বার শব্দার্থে দম্পতি-সময়
মেপে, শেষে ভোর করে এক যুগ্মে প্রেম, শিল্প, প্রায়ের সংবেদ।

কবিতা
বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

তিনটি কবিতা

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আমার প্রস্তাব

আমার প্রস্তাব : এই রাতটাকে জালিয়ে দাও।
আমার প্রস্তাব : এদের, এই আপাত-অর্থহীনদের,
এই অন্ধকার আর হাওয়ার অভাবকে বাণী দাও।
আমার প্রস্তাব : আমার এই ঘরের মুচু কোণটাকে বন্ধকিয়ে
হঠাৎ পাপল ক'রে তোলে।

আনো অনেক শিশুর হাসি, বিচিত্র গেলনা,
অনেক উজ্জল আলো, আনো আনন্দ।

আমার প্রস্তাব : কুলতে দাও শীত, কুলতে দাও
সর্বদাই কিসের একটা অভাব, কুলতে দাও
না-জাগার না-মুহোতে পারার রাস্তা।

আমার প্রস্তাব : এদের জীবন দাও।

সে আমায় দিয়েছে

সে আমায় দিয়েছে এক আশ্চর্য আগুন—আমায় দিয়েছে সে
সেই আগুনে অনিবাধ জ্বলার মতো তেমনি বিরীট এক অন্ধকার।
তাতে প্রতি মুহূর্তেই খুলে গেলো আমার পথ, জ্বলে গেলো বুক।
তবু তাও শেষ নয়।

কবিতা

আখিন ১৩৬৬

আমি বলি তাই তারি কথা কখনো চূপ করে, কখনো গুমরে-
গুমরে, কখনো মরতে-মরতে, জ্বলতে-জ্বলতে। এই পাথের অশেষ,
এ আমার মুক্তি দিয়েছে, দাঁশ করেছে অসহ্য নিখতির, এ আমার
মস্তিষ্কে চিরবিমূঢ় করে দিয়েছে একবারে জন্মের মূহুর্তেই,
অবাধ্য আভার, অকাটা আধারে।

আমি কেবল ছুটবো, হাঁপাবো, মুঠো পুরে ভরবো অন্ধকার, ছুঁতে দেবো
আগুন। আর আগুন লেলিহান হয়ে শত শত প্রসারিত করে-
তাকে গ্রাস করবে অট্ট হেসে।

এই পোড়া মাটিতে যে-স্কল কোটাই আমার বেরনাম,
সে আগুনের ফুল—টেকা দেয় কোটি যোজন দূরে
তারার সঙ্গে। আকাশ তাকে দেখবার জন্মে হয়েছে পাশাপা-
শতল—সুখ ঘুরিয়ে বিক্ষারিত সে চেয়ে আছে তলার
দিকে, বোঁটা তুলে অবস্থা শূন্যে।

যাকে বাধতে চাই, ভালোবাসতে চাই যার রূপ খণ্ডে ভুলি
মনে-মনে, তাকে বুঝাই ভাকতে চাই একটু মুহূর্ত ধরে,
এই অনন্ত জলন্ত রাতের কারখানায়।

নয় বাঁধানো ছবিকে

নয় তোমার বাঁধানো ছবিকে, যা টাঙানোই আছে। তোমাকে, তোমার
জলন্ত ভূমিকে। আর এই তো আমি।

এই আমার চোখ যা তোমায় দেখেছে, এই আমার হাত যা উত্তত
তোমার হাতের দিকে, এই আমার বুক যার স্তত ফুল হয়ে ফুটে আছে।

কবিতা

বর ২৪, সংখ্যা ১

এই তো আমি। দেখলে না? তুমি দেখলে শুধু অন্ধকার? শুধু তোমার ভয়,
তোমার ঐ তুচ্ছ সংশয়? তুমি কিরে গেলো?

তোমার ফেরার পথে আবার হাওয়া ওড়ালো শাড়ির কোণ, ঘুরে
মেঘের মতো পাহাড় আবহ-সংগীতে হাজার আরো একবার তুললো
মুহূর্ত। তুমি পৌছলে না মন্দিরে এসেও, আরো একবার তুমি ছুলে না
যাকে ছোঁওয়ার ছিলো, দেখলে না যাকে দেখতে তুমি এলে, যে তোমায়
দেখেছিলো।

দেখলে শুধু অন্ধকার, শুধু তোমার ভয়—তুমি কিরে গেলো।
জানি আমার অনিদ্ভার, না-পাওয়ার আরো এক রাজি দীর্ঘতর হলো।
জানি কাল সকালে ভিক্ষুক আবার আগবে ধারে, দরিদ্রের অনিষ্ট
শিশু রাস্তায় কপাল কুড়াবে। জানি আবার দুপুর হবে, সন্ধ্যা হবে,
রাজি হবে।

এই হওয়ার অনিবার্য ভাঙনায় আমার নির্জন কোণে আমিও নিরন্তর হবো,
ভূমি হবে অবিরাম তোমার নিকরেশ, যেমন ঐ অশ্ব-চারটাও প্রতি মুহূর্তে
হবে, দিনে-দিনে বুড়ো হয়ে অকৃতার্থ পাশাপাশি যাবে সে একদিন—
অবশেষে যতদিন না হয় পৃথিবীর প্রথম সকাল হ'তে যা হওয়ার আছে।

জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতিষ্য দত্ত

একজনের মৃত্যুর আঘাত সামলে ওঠার আগেই অল্প জন মারা গেলেন। শুধুমাত্র মৃত্যুর তারিখে তাঁরা গুরুত্ব; নিতান্ত অর্থহীন অর্থাত্তিক এই সংযোগ। আর মৃত্যুতেও কি তাঁরা ভিন্ন নন? অকালমৃত্যু দুঃসংবাদই, এবং কেউই সম্ভ্রান্ত, তৃপ্ত গৃহস্থের মতো সম্পত্তির নিপুণ ব্যবস্থা করে, শুভকাজী স্বজনবর্গকে পরামর্শ ও সন্তুষ্ট আত্মীয়গণকে শোকপ্রশমনের উপদেশ দিতে-দিতে পরলোকের উদ্দেশে যাত্রান্ত করেন নি। এঁদের মৃত্যু কোনো শীতল প্রলেপ, শান্ত সমাধি, পরম সমাধান নয়; এ হ'লো মৃত্যুর আগাত, উৎপাতন, বিচ্ছেদ, ব্যতি। কিন্তু এই নিষ্ঠুর মৃত্যু যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থপরিকল্পিত। জৈন তীর্থঙ্কর যেমন যাত্র বর্জন করে নিজেদের ধীরে-ধীরে শুকিয়ে মারেন, তেমনি যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অল্পে ধীরে-ধীরে বিধ্বংস করে নিজেদের হত্যা করলেন। আর জীবনানন্দের মৃত্যু হ'লো অকস্মাৎ; এতটুকু অন্তত বলা থাক যে এ-মৃত্যু এমনকি তিনিও আকাজ্ঞা করেন নি। দলিত উজ্জ্বলের মতো তিনি শুধু আঘাত গ্রহণ করলেন; লাগলজটিল রোদের মোড়ে মৃত্যু বধন তাঁকে আঘাত করলো, এই নিতান্ত নিরুত্তম বোধসম্বন্ধ কোমল মাধুর্য় সৈ-আঘাত সহ্য করলেন শুধু। জীবনানন্দ শাশী জীবন পালন করে গেলেন যেন কোনো-এক নিরুত্তম বিধবার ব্রত। ভবিষ্যৎপ্রাপ্ত সমাজের অত্যাচার, দারিদ্র্য, পাঠকসমাজের উপেক্ষা, সব-কিছু শুধু সহ্য করে গেলেন; অথচ কোথাও একবিদ্বী ভিত্ততা রেখে গেলেন না। কোনোদিন কোনো তর্কে প্রবৃত্ত হন নি, বিবেচ্য করেন নি কাউকে, শুনেছি যাক্জিত জীবনে তিনি মর্বোশী সন্ন্যাসীর চেয়ে নিগিল ছিলেন, বাঘজীবন বীপান্তরিতের চাইতে স্বদুর। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন যেন এক তুমুল অগ্নিকাণ্ড। লোকসংসার ধ্বংসের যখন আর-কিছুই অবশিষ্ট রইলো না তখন তিনি নিজেদের আহুতি দিলেন।

একজন এমন লাজুক, সর্বদাই বিনয়ে ও আত্মসংশয় এমন আনত,

সামাজিক আলাপে এমন অস্বস্তি যে পরম হিতৈষী ভক্তের কাছেও তাঁর সদ ছিল খাগেরোধকর। আর অজ্ঞান অজ্ঞান কথা বলতেন, অনার্যাসে নিষ্ঠুর হ'তে পারতেন, সকলকে অস্বস্তি করে দিতেন তাঁর সরল নির্দলিতায়। আগন্তুককে আক্রমণে পশু কিংবা দ্রুত শিশুর মতো নিজেদের আত্মপোষনের চেষ্টা করতেন জীবনানন্দ দাশ, আর বালকের মতো নির্ভয় ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আত্মত্বিতেও ভিন্ন ছিলেন তাঁরা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ের রং কালো, বাঙালির পক্ষে তাঁর দেহাৎ লক্ষণীয়, বড়ো, বড়ো পা জীর্ণ জুতোয় আবৃত। ঘরে ঢুকতেন তাকাত-খাঁওয়া জঙ্ঘর মতো হুড়মুড় করে। কেউ যে এমন অরিতপতিতে এতো কিছু এমন অনার্যাসে (এবং নিজের অজ্ঞাতসারে) সংঘটিত করতে পারেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ ও নির্গমন না দেখে থাকলে তাকে নাকি কল্পনা করা যায় না। আর জীবনানন্দের ভবি ছিল ভিত্ত, বড়ো-বড়ো চোখ সর্বদা বিষয়ে বিক্ষোভিত; প্রশস্ত কিন্তু অলস তাঁর গর্বকার শরীর।

ভিন্নতার তালিকা দীর্ঘতর করা সহজ কিন্তু নিশ্চয়োজন। একজন শেষ জীবনে সাহিত্যকে রাজনীতির প্রয়োজনে ব্যবহার করলেন, অজ্ঞান রাজনীতিকে সাহিত্যের। জীবনানন্দের অন্তিম কবিতাগুলিতে সমকালীন ঘটনার যতো উল্লেখ আছে, প্রথম দিকের কবিতায় তার শতাংশও নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র শেষ জীবনে একজন সাহিত্যিককে তাঁর উপজ্ঞাসের নায়ক করলেন। কিন্তু এ-সাহিত্যিক যে-কোনো গণপ্রচারসভার সম্পাদককেও টেকা-দিতে পারেন, তাঁর রাজনৈতিক স্বাধীনতা এমন টনটনে, তাঁর চিন্তা এমন বুলিসম্বন্ধ। আর জীবনানন্দের রাজনীতি এক বাস্তবী লোকে সংঘটিত হয়; “স্বাধীন-নেতৃত্ব-রক” মাছুষ নন, প্রতীকও নন, শুধুমাত্র স্বাধীনতাবোধ; একালের রাস্তায় হাঁটলে এই সব সাইনবোর্ড চোখে পড়ে কিন্তু অল্পময় জীবনী অথবা জীবনানন্দের দ্বারা এরা অর্ধগতের অধিক বীজিত পায় না।

কিন্তু এই নামগুলি ছাড়াও আরো আছে। হরতো স্মারিন-নেত্রে শুধু

কবিতা

অধি ১৩৬৬

নাম, "রিরংসা, অজ্ঞা, রক্ত, উৎকোচ, কানাথুযো, ভয়" তাঁর ক্ষুদ্রে সাড়া তোলে। শুধু সাড়া নয়; শেষ বয়সে এইগুলিই জীবনানন্দের প্রধান ভাবনা হ'য়ে উঠলো; যে-কবি অলস গ্রাম্য ভাঁওের মতো সব-কিছু ভুলে মনের পায়ে, ঘুমে, মৃত্যুতে শান্তি খুঁজেছিলেন, তিনি "বাংলায় তেরশ চুহান সালে" এসে থমকে দাঁড়ালেন, প্রত্যাক করলেন রক্তাক্ত পৃথিবীকে, উপায় খুঁজলেন পরিভ্রাণে।

অল্প জীবনানন্দ যৌবনেও অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁর কবিতা প্রথম থেকেই এমন এক তাঁর বেদনায় ভরাবার নাম আমরা জানি না, শুধু যখন মাঝে-মাঝে "উত্তর প্রাণের মতো" আমাদের মনের জ্বালানায় হানা দেয় তখন তার প্রভাব অস্বভব করি। সেই পরম বিয়র্গ উট আবিষ্কৃত হ'লে দেহধারণ অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। সে-বিবাহে কাতর হ'য়ে গ্রাম্য কবি মনের পাজ্রে আরাম চেয়েছিলেন, ব্যাঘ্র অবশ হ'য়ে লাশকাটা ঘরে শান্তি খুঁজেছিলো আর-একজন, আর যখন ক্রৈব প্রেরণা এবং প্রবৃত্তির চাইতে চেতনের ভার বেশি হ'য়ে গেলে, যখন "জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক" বেসামাল হ'য়ে উঠলো, তখন এমনকি চতুর অল্পম জিবেবীরও মৃত্যু ছাড়া গতি রইলো না। আর যে কবি অনেক "রাজ-নীতি স্বপ্ন নীতি মারী" প্রত্যাক ক'রেও বিখাস হারাননি কারণ তিনি বুদ্ধকেও স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তিনি ১৩৫৯ সালে থেকে যেতে চান এই কবিদেবতার কাতর হ'য়ে। কবিমাজেই দূরত্ব ও কোমলচিত্ত; তাই, কোনো বিবৃত অতীতে কিবা দূর ভবিষ্যতে, দূরদেশের কোনো অন্বেষা ব্যক্তিও যদি আগাত পান বা পেয়ে থাকেন তবে তিনিও আহত হবেন। বেঁচে থাকে তারা "দ্বারা কিছুই সৃষ্টি করেনি" প্রতিদিন "তাদের অধিকার মন শুল্কায় বেগে ওঠে কাজে"। বেঁচে থাকে নীচ প্রাণী, বেগে থাকে পেঁচা। অথচ আশ্রয় এই যে অল্পম জিবেবীরেই শুধু মৃত্যু ঘটে; বিবৃতপ্রাণী কবির চেতনার জালাও জুড়োর না, ক্ষয়হীন প্রাণীগ্রন্থের স্পন্দে তিনি বেঁচেও থাকেন।

চল্লিশ বছর বয়সে জীবনানন্দ উপলব্ধি করলেন বেঁচে থাকার প্রেরণার সঙ্গে চেতনের বিরোধ আছে। এ-বিরোধ প্রাচীন, এবং আলৌকিক মধ্যস্থতা বিনা

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

এ-বিরোধের সমন্বয় প্রায় অসম্ভব। অল্পমের অবশ হাত থেকে গাভীরা থ'লে পড়েছিলো; দেবতা তাকে সাহায্য না-করলে আবার সে-ধনুক হাতে তুলে নেবার সাধ্য এমনকি তাঁরও ছিলো না। আর সেই প্রেমিক কিশোর, বিবেক-হীন হৃদয় গ্রীক দেবীপন বার ইন্ড্রিয়গুলিতে ভর করলেও বার ক্ষয় মৃত্যুকে ভুলতে পারেনি, সেই কীটস বেঁচে থাকার জন্ত কতো কৌশলই না অবলম্বন করেছিলেন! আলস্ত, বিবৃতি, সৌন্দর্য-নিশ্চেষ্টতায় অন্তত নিশ্চিন্ত কল্পক, তুলিয়ে দিক তাঁর জাতার মৃত্যু, তাঁর নিজের অচিকিৎস ব্যাধি, তাঁর অতৃপ্ত প্রেমের তীব্রতা। কীটস মাত্র কয়েক মূহুর্তের জন্ত প্রেমকে পরিপূর্ণ, জীবনকে অনন্ত ও মৃত্যুকে উৎসর্গে দেবতে পেরেছিলেন। কিন্তু সে-মূহুর্ত কীণ। মহাকাব্যের প্রচেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হ'লো, র'য়ে গেলো শুধু শান্তির আহুতি, সমাধানেসে অভ্যাস। জীবনানন্দ যখন সমন্বয়সাধনে উত্তোগ্রী হলেন তখন তাঁর হাতে ছিলো দীর্ঘ পনেরো বছর, আর পাথয়ে ছিলো পয়ার ছন্দ এবং প্রায় জন্তদের মতো জাগ্রত ইন্ড্রিয়। জীবনানন্দ অস্থির থেকে অস্থিরতর হ'য়ে উঠলেন। শেষ যৌবনে দেখেছিলেন অভিকৃত চাষা ডিনামাইটার তুপের উপর ব'লে পৃথিবীর অনাদি তামাসা দেখছে; দেখেছিলেন গাঢ় থেকে গাঢ়তর অন্ধকারে পৃথিবী প্রবেশ করছেন। কিন্তু তখনো অত্যন্ত বেশি বিচলিত হননি; "আবহমান" কবিতাটির অন্তত প্রথম অংশে মিলগুলি গাভীর শেষে বসানো, আর ত্রিলোকধ্বংসের ছবিও ("বাঙ্গার আত্মকল মারীওটকার মতো পেকে"...) কেমন ঘরায়। কিন্তু ক্রমে তিনি অর্ধেই হ'য়ে উঠলেন, অল্পম জিবেবীর মৃত্যুর পর আত্মস্ববরণ পীড়াদায়ক মনে হ'লো। এর পরের কবিতা কবিতার যোগায় মোড়া ইতিহাস, দূরদর্শন, জীবনবিজ্ঞা, চেতনগ্রহণী শিকড়, নির্বিবেক-করণী বাটকা, আশাসঙ্গীতবী হুয়া, সাধনা, সেবা। একযোগে সব-কিছু হ'য়ে উঠলো, কবিতা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু উদ্দেশ্যে হয়তো কবিতার চাইতেও মহৎ। দীর্ঘ এবং আত্মবিশ্বাসী কোনো সাদাগ্রন্থ চিকিৎসক তাঁর প্রাণপ্রিয় কাউকে অচিকিৎসক এবং অসহ্য মর্যাদায়ক কোনো ব্যাধির দ্বারা কবলিত ছেনে হঠাৎ শোকে অধীর এবং যুক্তিহীন আশায় উন্নত হ'য়ে উঠতে পারেন, যেমন হঠাৎ

তিনি তার এতকালের আশ্রয়, তার প্রিয় চিকিৎসাশাস্ত্রে সশরী হ'য়ে বিখ্যাস করতে পারেন স্বপ্নাত ভেবজ বা গুরুপ্রদত্ত মাহুলাই ভালো, বৃত্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে সহজ মনোভাৱে যেন তিনি আত্মসমর্পণ করতে পারেন, তেমনি, জীবনানন্দও এক সময় শোকে ব্যাকুল হ'য়ে কবিতাকে পরিহার করতে উত্তত হয়েছিলেন।

“পতুলনাচের ইতিকথা”তেও মাহুদেরা শুধু অভ্যাসে সচল। যে-মাহুস জীবনকে মাথা ব'লে মনে করেন এমনকি তিনিও মৃত্যুকে ভয় পান; শুধু তিনি নন, আমরা সবাই অন্ধকার পথে লাঠি ঝুঁকে-ঝুঁকে চলি। এবং এমনকি অজ্ঞহতাও মাহুদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। অসহায় মাহুদের সেই একটিমাত্র যেচ্চাচার, স্বভাবকে পরাজিত করার তার সেই একমাত্র উপায়কে নিষ্টির লেখক কেড়ে নিলেন। “পতুলনাচের ইতিকথা”য় এক অন্ধ শক্তি যাদুদের নিজেও তাঁর ভক্তদের মন অধিকার করলো। সে-শক্তির বাহন গুহব, খাত্ত মাহুদের মন, স্থা অশ্রিয়ের। সারা গ্রাম, এমনকি সরকারি কর্মচারী ও শ্রী ভাঙ্গার, এক দুর্বার প্রাণে ভেসে গেলেন। এই যুগ-আত্মহতা, এই ধ্বংসহীন, মান্তিক মৃত্যু ও পরম সত্যিগত বোধ করে সাধা কার? সারা পৃথিবীর সাহিত্যে যাদুদের আত্মহত্যার মতো নিষ্টির, রোমাঞ্চকর ও বিখ্যাসনাশক ঘটনা বিরল। “The Possessed” উপন্যাসে ডক্টরেভাশ্চ শাউভকে হত্যা করেছিলেন, তার প্রেমকে করেন নি; কিরিলভকে হত্যা করেছিলেন, তার দেবদুর্গত ইচ্ছাশক্তিকে নয়। শাউভ ও কিরিলভ ঋষি, দেবদুর্গ বা দেবতার চেয়েও গৌরবময়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাহুসকে তার চৈতন্তের অধিকারটুকুও দিলেন না। এবং শুধু মৃত্যু নয়, জন্ম ও জীবনকেও তিনি সেই অন্ধ পশুশক্তির প্রকারান্তর ব'লে চিত্রিত করলেন। হামিনী কবিরাজের বউ যে-শিশুকে গর্তে ধারণ করলো তাও তো তার কুড়িয়ে-পাওয়া—যেমন সে কুড়িয়ে পেয়েছিলো স্রীনাথের মেয়ের হারানো পুতুল। খেঁচেই বা ছিলো কেন? সৌন্দর্য তার হরণ ক'রে নিয়ে গেলো রোগে, তবু দেখা গেলো গোলাপ তার কাছে কিরে এসেছে জৈব প্রয়োজনে। এমনকি গ্রেম এ-সঙ্গেও বিকশিত ও বিনষ্ট হয়

কোনো সচেতন শক্তির ইচ্ছায় নয়; উদ্ভিদের মতো মাহুদেরও স্বতুলমাগমে অজুরোপম হয়, গ্রেম নামক সেই স্বতুলপ্রাণ মুহুর বসন্তে যেমন বিকশিত হয়, কাল অতীত হ'লে স্ব'রেও যায়। শুধু কি গ্রেম? মাহুদের চৈতন্য যেন এক ছাঁকুনি মাত্র, কোনো-এক অসমর্থ কটাহ থেকে উথিত কালো বোঁয়া তাতে শোষিত হ'য়ে বাইরে নির্গত হয়। এক নিশ্চেতন শক্তির আলোড়নে যে-সব তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা আমাদের মনের তট্টে আচ্ছাদে পড়ে, আমাদের হৃদয়েও কম্পন ওঠে। সে-কম্পনকেই কখনো সাধ ক'রে বলি গ্রেম, কখনো সভয়ে চিনি ইন্দ্রানিক ব'লে। হিংসা অথবা লুপ্তির আকাঙ্ক্ষা, প্রেম কিংবা বেঁচে থাকার সাধ—সবই আমাদের নাগালের বাইরে। আর, এই নিশ্চেতন নিষ্টিরতা দেখে আমরা যতটা বিচলিত হই, তার চেয়ে অধিক হ'য়ে যাই লেখককে নিবিকার দেবে। কেমন যেন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছেন তিনি, আত্ম-গোপন করেছেন এমন এক হৃদয় লোকে যে মনে হয় তাঁর কল্পনার শিক্তদের চাঁৎকার সেখানে তাঁকে স্পর্শ করছে না; তাঁর উপভাস যেন স্বতই গড়িয়ে চলে তাঁর সাহায্য বিনা। কেমন বাস্তব, নিম্পৃহ, নৈর্ঘাতিক তাঁর লেখার ভঙ্গি। “পতুলনাচের ইতিকথা”র চংটি যেন লেখকের আত্মরক্ষার বর্ম। তিনি যে-জগৎ সৃষ্টি করেছেন তার দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে, তার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হ'লে তিনি উদ্ভাব হ'য়ে যাবেন। আর বেঁচে থাকতে হ'লে ভুলে থাকার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে, শ্রী ভাঙ্গারের মতো ধীরে-ধীরে ক'য়ে যাবে গ্রেম, পৃথিবীকে বনলাবার ইচ্ছা, কল্পনা, মহত্ব। উপভাসের গোড়ায় বজ্রাহত মাহুসটির মৃত্যুতে শ্রী যতটা বিচলিত হয়, বাহুদের ইচ্ছামৃত্যুতেও ততটা হয় না। ক্রেম-ক্রেমে কুহুদের গ্রেম যেমন শুকিয়ে যায়, লেখকও উপভাস থেকে সম্ভল, সরস ও প্রাপবন্ত সব-কিছু শুবে দেন। তা না-হ'লে কি আমরা শ্রী ভাঙ্গারের পরায়ণ শীকার ক'রে নিতে পারতাম? না পারতেন লেখক স্বয়ং? অথচ পাঠকও মাহুস মাত্র; যখন জীবন শুধুমাত্র বেঁচে থাকার অভাস ব'লে মনে হ'তে থাকে তখন ইচ্ছা করে লেখক অস্তত একবারের জন্ত নিবিকার স্রীর পদ ভাগ ক'রে বাসিত মাহুস হ'য়ে উঠুন।

এবং ঈশ্বরের মতো, মিষ্টর লেখকও কি এক সময় তাঁর নিজের জগৎ অবলোকন করে স্তম্ভিত হয়ে যান নি? তাঁর কৃষক, পশুদের মতো সরল, চেতনহীন দেহ ও তার প্রেক্ষে মৃত, বতাবসরব্য নিশাপি কৃষক যখন নিজেকে শরীর কাছে দান করলো তখন কে যেন বলে ওঠে: কৃষক, কৃষক, তোমার কি শুধু শরীর আছে, মন নেই? কৃষককে, ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিষ্টর, নিশ্চেতন জগৎকে, এ-প্রশ্ন কে করে? শশী? উপত্যাকে স্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত নেই, তবু হোবা বায় বজা শব্দ নয়। আমাদের রুদ্ধ মনের আঁধারে এই একবারের জ্ঞান যোগ দেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জীবনানন্দ দুজনেই যৌবনে এমন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন যা বাস্তব হতে পারে, কিন্তু সহনীয় নয়। মাহুকে প্রকৃতি এমন দুর্বল করে গড়েছেন, এমন ক্ষীণ তার ইন্দ্রিয়, এমন কাতর তার শরীর যে এমনকি জড়প্রতির কতটুকু সে অস্বস্তি করতে পারে? আমাদের শরীর মতো। প্রশ্ন করে বর্জন করে তার চেয়ে বেশি, আমাদের হৃদয় তুলে থাকে হতট অস্বস্তি করে তার ক্ষীণাংশ; আনন্ড ভুলিয়ে বেঁচে থাকি আমাদের অস্বস্তির সুরোগে। আমাদের প্রত্যেকের মুহূর্ত আলস, অর্ধ শতক আগে নির্বাণিত নক্ষত্রের প্রেত প্রতি রাতে আকাশে হানা দিলে, কাল, প্রাণীগণকে ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহে জ্বালা-জ্বড়ানো প্রলেপের সাহায্যে। জীবনানন্দ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ করলেন; এমনকি কন্যালেবুর মধ্যে ব্যা পশুর প্রাণ ভরে দিলেন; হরিণকেদিলেন আর্ত প্রাণিগীর হয়ে। এর পর আমরা কী কৌশলে তাদের আর্জান দা-শোনার ভান করতে পারি? আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেড়ে নিলেন প্রত্যেকের প্রাণ। জীবনানন্দের কল্পনায় সমস্ত প্রাণী ব্যাঘ্র বিহীন, মোহমান; যেমন গুবরেপোকার ডানা দেখা যায় না—এতো দ্রুত তার পাখার কপন—জীবনানন্দের প্রাণীরা তেমনি এমন তাঁর ব্রহ্মায় কাতর যে তাদের জড় বলে ভুল হয়। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুলগুলিকে জীবন্ত বলে মনে হলেও তাদের নাচার কোনো-এক নিশ্চেতন শক্তি। বিপরীত এই দুই

অভিজ্ঞান? আসলে বিপরীত নয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাকৃতিক মাহুসেরা জীবনানন্দের কবিতায় অজ ছদ্মবেশে প্রবেশ করে। যে-মাছি "পল্ল স্নেহ বন্দা থেকে উড়ে যায়", ভিন্নতর ভিত্তির, সেই প্যাচা, এরা সবাই তো প্রকৃতির বিবেকহীন সন্তান। এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপত্যাসের তুল্য এক জগৎ ধর্মন করেই তো জীবনানন্দের নারকেরা ব্যাঘ্র অবশ হয়ে জড় রূপ গ্রহণ হন। দুজনের মধ্যে তবুও শুধু এইটুকু যে শরীর মস্তির আত্মিকের দ্বন্দ্বহীন সমাজ বিনষ্ট করলো: জীবনানন্দের কবিতায় হলে সে হয়তো দ্বন্দ্ব হারাতো না, তার বদলে লাসকটি ঘরে শীপে দিতে তার প্রাণ।

এমন মিষ্টর জগৎ ধারা সৃষ্টি করলেন তাঁদের চেয়ে সঙ্গর আর-কোনো লেখক আমাদের ভাষায় লেখেন নি। শরৎচন্দ্রের সমবেদনা প্রদানত বালক ও স্ত্রীজাতির জ্ঞাত; তাঁর ব্যাঘ্র কারব সামাজিক বা পারিবারিক দুর্গে, সে-দুর্গে দূর হ'লেই তাঁর উপত্যাসের চরিত্ররা স্থবী পুহুহু পরিণত হয়। আর রবীন্দ্রনাথ বড়ো বেশি ঈশ্বরের সপক্ষে; তিনি চরম আত্মতর্কেও পরম রক্ষণা বলে মনে নেন। তাঁর কল্পনার ঈশ্বর মাহুসের এমন ঘনিষ্ঠ যে যদি তাঁর স্ত্রীপুঙ্খন সবই যায়, তবু তার ঈশ্বর থাকেন। জীবনানন্দের বিধাতা উট, নৈরাতের, নিদ্রাধরের যে বার্তাবহ, সে কখনো রবীন্দ্রনাথের জগতে হানা দেয় না।

সত্য, স্বপ্নজনাথ দত্তের কবিতায় সে প্রবেশের চেষ্টা করে, কিন্তু সেখানে তার জ্ঞানবতা নৃপ হয়, বুদ্ধির আগিতে হয়ে যায় তার বিকট গ্রীবা, অশোভন ঝুঁজ—সে পরিণত হয় এক বিরক্ত প্রাণিতে। জীবনানন্দও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় —এরা স্বপ্নজনাথের তুলনায় সরল নিশাপি শিশুমাত্র। স্বপ্নজনাথ আবেগের চেয়ে শৃঙ্খলাকে, আত্মবিশুদ্ধির চেয়ে নিজের উপর প্রকৃতক বেশি কাম্য বলে মনে করেন। তাঁর কবিতার বৈলক্ষণ্য আমাদের সংঘর্ষে আগে চোখে পড়ে তা তাঁর অসামান্য নৈপুণ্য, মিলগুলির বিশ্বয়কর অনিবার্যতা, মিলের সংখ্যা, অপ্রত্যাশিত শব্দের যথোচিত ব্যবহার। আর জীবনানন্দ করে-পরে ঝড়ে-ঝড়ে ধরনের বিশেষ লম্বল থাকেন; তাঁর শব্দসংখ্যা কী পরিমিত এবং অধিকাংশই দেশজ;—এবং সেই এক পদ্যর ছাড়া আর কোন ছন্দ তিনি স্বস্তিতে ব্যবহার

করেছিলেন? তাঁর কবিতা আমাদের মুখ যত না করে, দীর্ঘ করে তার চের বেশি; তারিফ যত না করি, তার চেয়ে বেশি যক্ষণা পাই।

বক্তাবকবি বলতে যে-অধীর্ষান, উদ্ভাদ, বক্ত প্রভিভার ছবি ভেসে ওঠে তা যতই অসীল হোক, এদের দুহনের সঙ্গে তার কিছু মিল আছে। পুরোপুরি মিল নয়,—কে কবে মাতৃগর্ভ থেকে মহান শিশু সৃষ্টি করতে শুরু করেছে? শিশু বিনা এমনকি সহজ অথবা যাবীন হওয়াও যায় না; স্বতঃস্ফূর্তির অভিনয়ও আসলে কৌশল; কৃষক-কবি সবচেয়ে বেশি প্রাচীনপন্থী—অর্থাৎ অস্বাভাবিক; —লোকসাহিত্য কী অপরিবর্তনীয়—এরূপ সব দেশের লোকসাহিত্যই কেমন একই রকম,—সুতরাং গ্রামীন-শিল্পীর গতানুগতিকতা ছাড়া গতি নেই। অজ্ঞ কবিদের মতো জীবনানন্দও শুধু ক্রমে-ক্রমে সহজ হ'তে শিখেছিলেন; “রৌদ্র ঝিলমিল মধ্য এশিয়ার নীল”—এর রূপিততা বর্জন করতে তাঁকেও শিবতে হয়েছিলো। “জননী”ও শিকানবিশের লেখা গুপ্তাঙ্গ এবং যদিও জীবনানন্দের কবিতা পড়ে মনে হয় তিনি গুপ্তমন্ত্র বিনাই তাঁর কাব্যমার্গ বেছে নিয়েছিলেন, মনে হ'তে পারে তাঁকে অহঙ্করণ না-ক'রেও তিনি সফলতা লাভ করেছিলেন, আসলে এমনকি তিনিও অহঙ্কে অহঙ্করণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বীকৃতি অহঙ্করণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে; তরুণ জীবনানন্দের উপর প্রভাব পড়েছিলো সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের। সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্রলতা ও অলিলালিতা, বা নজরুলের বাঘা ও উজ্জ্বলের সঙ্গে জীবনানন্দের কী মিল থাকতে পারে? কিন্তু অসম্ভব উৎস থেকে অভাবনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করার ক্ষমতার নামই বোধ হয় প্রভিত। এদের দুহনের মধ্যে বা স্থলভাবে উপস্থিত তা জীবনানন্দ পরিবেশান করলেন—রূপান্তরিত করলেন মধ্যপ্রাচ্যকে, তার আগে, আভ্র, নাসপাতি, তার নরম গলিচা আর সরস তরমুজ নিয়ে। স্বীকৃতি অহঙ্করণে, সভ্যতাকে, রবীন্দ্রনাথকে, আর জীবনানন্দ বরণ করলেন দূরপ্রাচ্য সাধকের পথ। দুহনে যে দুই ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তার ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে কবিতা সম্পর্কে তাঁদের দুই বিখ্যাত উক্তি: “সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি এবং “মালার্বে-প্রবর্তিত কাব্যার্ণবই আমার

অধিষ্ট: আমিও মানি যে কবিতার মূল্য উপাদান শব্দ।” জীবনানন্দের উক্তিটি আক্ষরিক অর্থে এতই সত্য যে শুধু তা-ই বলা যদি জীবনানন্দের উদ্দেশ্য হ'তো তবে না-বলাই হয়তো ভালো ছিলো; আর স্বীকৃতি অহঙ্করণে খোঁষাটিকে আমরা আক্ষরিক অর্থে নিতে পারি না; কেননা তাঁর কাব্যকলা পণ্ডিতই মালার্বে-পন্থী নয়। আসলে, জীবনানন্দ রোমাঞ্চিক ধর্মের মূল বিশ্বাসটিকে প্রকাশ করেছিলেন —শিক্ষা নয়, প্রেরণা কবিতার জনক; কবিত্রত কেউ ইচ্ছে ক'রে গ্রহণ করে না, এক নিঃসর ভাকিনী কারো-কারো উপর ভর করে; কবিত্বায়, কবির নয়, সেই আশ্রয়ী প্রেতের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি, কারণ কবিত্ব এক অস্বাভিহিত, অপ্রত্যাশিত, অপরিভাষ্য সৌভাগ্য; শিক্ষিত সবাই হ'তে পারে কিন্তু কবি শুধু তিনি, যার উপর দেবী ভর করেন। আর স্বীকৃতি অহঙ্করণ মালার্বে মতো প্রতীকীবাণের বুদ্ধিবিরোধী, এমনকি প্রতীকীবিরোধী রূপটিকে উপেক্ষা করেছেন, তিনি ইচ্ছে ক'রে লক্ষ করেননি যে মালার্বে শব্দব্যবহার যথার্থ বো নয়ই, যথোচিত শব্দ বাণ্ডে ব্যবহার করতে না হয় তাঁরই অজ্ঞ মালার্বে সব পরিস্রম। স্বীকৃতি অহঙ্করণ মালার্বে মধ্যে সেই দীক্ষিত আবিষ্কার করেছিলেন যা তিনিও কামনা করেন। প্রেরণাশক্তি, অস্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কাব্যস্রোতের বাহক হ'তে তিনি চান না। নিপুণতা চেয়েছেন তিনি, কাব্যস্রোতের বাহক হ'তে তিনি চান না। নিপুণতা চেয়েছেন তিনি, চেয়েছেন “স্বাভাবিকতা”, কবিতার উপর প্রচুর কণ্ঠ্য চেয়েছেন।

এই দুইজন সমবয়স্ক কবি (জীবনানন্দ বিশ শতকের এক বছর আগে জন্মে-ছিলেন—এক বছর পরে স্বীকৃতি অহঙ্করণ) দুই বিশদীত আদর্শকে মূর্ত করলেন। জীবনানন্দ রেক, হেড্ডারলীন, কীটস এবং ইয়েটস এর মতো দিব্যদর্শী; স্বীকৃতি অহঙ্করণ কাহিন্যাদ্য ও হারেস, এবং ভালেসি-কল্পিত লা ফিউনে-এর মতো সচেতন। যে-জীবনানন্দকে মনে হয় এত দিশি, তাঁর কাব্যের মূল কোনো ভারতীয় কবির কবিতায় পাওয়া যাবে না; সত্যেন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলামের কবিতাকে তিনি শুধু ব্যবহার করেছিলেন, তাঁদের অহঙ্করণ করেন নি। তাঁর আদর্শ সেই সব বিদেশী সাধক-কবি যারা পরম নিপুণ, যারা এক দীর্ঘ যদিও বেশবর্ষকারী ঐতিহ্যের বাহক, কিন্তু বাণের রচনার কৌশলই এমন যে মনে হয়

তা রচিত নয়, তা শুভকণে প্রাপ্ত। আর স্ববীজনাথ, বীর করাশি-জর্দনে পারমর্শিতা বহুবিদিত, বীর প্রতীতি প্রীতি শুধুমাত্র সাহিত্যে আবদ্ধ নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও বীর প্রভাব লক্ষ করা যায়, বীর কাব্যের নায়িকা বিদেশিনী এবং কাব্যগুরু মালার্ণে, তার কবিতা একোপারেই ভারতীয় এবং তিনি স্বাক্ষর করেছেন তার কাব্য সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের খারা প্রভাবিত।

তবুও, জীবনানন্দ বিদেশ থেকে যেতো কিছুই আহরণ করে থাকুন, যেতোই তিনি অহুতরণ করুন অপরকে, তাঁকে মনে হয় কোনো-কোনো বিষয়ে শিশুর মতো সরল, শিশুদের মতো অশিক্ষিত। এমন হ'তে পারে যে তাঁকে এতো নতুন, এরকম স্ব-গ্রহত মনে হবার কারণ এই যে তাঁর আদর্শ অপর কোনো ভারতীয় কবি নয়—মহাভারত এবং কাশিানদের চিহ্নমাত্র নেই তাঁর কাব্যে—অথচ তাঁর সারল্য অভিনয় নয়। তিনি নিজেকে যোগ্যতা করতে চাননি বলেই দেবী তাঁর মধ্য দিয়ে নিজেকে অতো সহজে প্রকাশ করতে পেরেছেন। এত স্বচ্ছ, এমন ভিমিরভলী তাঁর দৃষ্টি, তার কারণ তিনি অমিকাহীন। কত নিচু প্রাণী তাঁর কবিতায় প্রবেশ করেছে, কতো হৃদয় বন্ধ, কতো বোর রহত হয়েছে উন্মোচিত। তার কারণ তিনি প্রাচীরের এমন কি মাছির চরণের প্রতি তাঁর দৃষ্টি অবনত করেছিলেন। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তো চেতনাকে অত কোনো কিছুই বর্ণনায় রাখার ক্ষমতা হুঁ পাঞ্জবিশেষ। তাঁর মধ্যে অমিকা তো নেইই, মাঝে-মাঝে মনে হয় তাঁর বিনয় প্রাণ আত্মবিশ্বাসপরা।। এদের দুজনেরই শিল্পের মধ্যে মাঝে-মাঝে এমন এক মধুর বালক-মন প্রকাশ পায়, যা দেখে আমরা—বিমল, স্বকটিকাতর, আত্মনচেতন পাঠকেরা—আত্মপ্রসাদ অহতব করি। ধন জীবনানন্দ, কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জমেও ভাইবাইনের উল্লেখ করেন তখন স্পষ্টই বোঝা যায় নতুন পুতুল পেয়ে বালিকার মতো তাঁরা চমকগ্রস্ত হচ্ছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ধনী শ্রেণীর পারিবারিক জীবনের যে বর্ণনা দেন তা থেকে অনুমান করা যায় যে এ-জীবন তিনি জানেন না, কিন্তু খেলায় ঘরে বসে শিশুর মতো তিনি দেয়ালের ওপারের জগৎকে ইচ্ছেমতো ভরিয়ে তুলছেন। জীবনানন্দের “সকলের আগে নিজে অথবা নিজের-নিজের নেশন”

মনে করিয়ে দেয় কোনো গ্রাম্য সাধকের বাচনভঙ্গি; মানিনী রায় যেমন মায়ব্রাহ্মিক বোঝাতো “হিউমেন” ছাড়া অত কোনো শব্দ ব্যবহার করেন না, জীবনানন্দও “নেশন” শব্দটিকে যেন একই আলাদা মূল্য দিয়েছিলেন, একই বেশি ভারি বলে মনে করেছিলেন।

এদের এই সরলতাকে গ্রাম্যতা বলেও তুল করা সম্ভব। এটুকু নিশ্চিত যে গ্রাম্য না হোক, এদের রচনার পরিবেশ বাংলা দেশের গ্রাম। জীবনানন্দের ধানসিড়ি নদী হয়তো বরিশালে নয়, হয়তো তা আনামে,—ভূগোলে পড়েছিলেন বা মানচিত্রে দেখেছিলেন শুধু—হয়তো তাঁর খেজুর-ছায়া স্বমে-মামি বাইবেল কিংবা ইতিহাসের বই থেকে আহত, কিন্তু স্পষ্টতই তিনি গ্রামকে (গ্রাম টিক নয়, গ্রামের গতির বাইরের নির্জনতাকে) এমন কি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও ভালো চিনতেন। এ-যুগের “ভ্রমহিলা” অথবা চিরকালের নারীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সেই শান্ত বাংলা দেশে—রাঙে কৃষক-পরিভ্রাতা নির্জন মাঠে। ত্রিলোকধ্বংসকও তিনি প্রাদেশিক রূপ দিয়েছেন; যে-কবিতার নাম “পৃথিবীলোক” এবং বিখ্যে ইতিহাস ও পরিণতি যার বিষয়, সেখানেও প্রলয় আসে পদ্মার ছদ্মবেশে।

দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে;

গ্রামপতনের শব্দ হয়।

আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মার্কক উপজাঙ্গ দুটির ঘটনাখল বাংলাদেশের গ্রাম; এমন কি “জাননী” নামক উপন্যাসেরও পরিবেশ গ্রাম্য—ঘনিষ্ঠ বিহেয়ার ও বোড়ার গাড়ির উল্লেখ আছে।

এমন নয় যে ইংরেজের গড়া এই কলকাতাকে তাঁরা বাই দিয়েছেন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তো বাট্টই, জীবনানন্দের কলকাতাও এমন এক শহর যেখানে বড়ো রাস্তা নেই, শুধু গুলি আছে। প্রধানত ভিথির, ইহাদিও কাক্রিদের অধ্যুতি এই অবতব, রোমাঞ্চকর নগর শুধু রাজিকালে জেগে ওঠে। সংখ্যায় যে-সব সম্প্রদায় নগর্য, নগরীর প্রাণের সঙ্গে যাদের সংযোগ নেই, নগরীর বিপুল শরীরের স্বকের উপর বলে যারা অন্ধকারে মশার মতো

একটু উদ্ভূত রক্ত পান ক'রে বেঁচে থাকে, তাদের দিয়ে জীবনানন্দ কলকাতা ভরিয়েছেন। হুড়াব মুখোপাধ্যায়ের কলকাতা বেকার, কেরানি ও সামান্য বারীদের নগর, সেখানে যেন সারাক্ষণ সবাই রাতার হাঁটছে। সময় সেনের কলকাতার বাসিন্দা নিরাশ বৃদ্ধিজীবী। আর বুদ্ধদেব বহুর কলকাতার কুকুরের রাস্তাঘরের বাতাসে ঘর্ষের স্বপ্ন দেখে; রহস্যময় সেই নগর, কিন্তু আমাদের অচেনা নয়। তাঁর কলকাতার বঙ্গার ঘরও আছে, মসীজীবী বেতনভোগী নাগরিকেরা ড্রামের হাতলে তুলে দশটার আগিশেও যায়। চেনা শহর মায়াময় হ'য়ে যায় সংগোপনে, নিভুতে, বঙ্গনার প্রভাবে। বুদ্ধদেব বহুর জঙ্ঘাল-কুড়ুনীরাও পরম নিঃসঙ্গ; বঙ্গার ঘর পরিত্যক্ত হ'লে তবেই পৃথী স্বরূপ ধারণ করেন; ড্রামের হাতলে—শরীর যখন শত শরীরের সান্নিধ্য ঘাঁথ—তখনো মন হ্রুব, নিঃসঙ্গ ও প্রবাসী। আর জীবনানন্দের নির্ধন, ভাবনাসীন সম্ভারের পঙ্কজের মতো বৃষ্ণেরী; তাদের প্রতি জীবনানন্দের আশঙ্কিত প্রধান কারণ হ'লো তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি। বুদ্ধদেবের জঙ্ঘাল-কুড়ুনী নিঃসঙ্গ, ঈশ্বরকে তাই তার এতো প্রয়োজন। 'কম্বোল'-মৃগের সেই চরিত্রহীন বাইডুল আজ প্রকৃতিকে পরিচয় করিয়েছেন; সেই উচ্ছ্বল শব্দবিলাসী যুবক প্রৌঢ় বয়সে এমন এক নির্ধন সম্মান গ্রহণ করেছেন যে এমন কি গৈরিকও তাঁর পক্ষে অতিরিক্ত রঙিন, প্রকৃতি যুব বেশি উত্তপ্ত, ক্যাকটাসও বড়ো বেশি লীলাসিত। রোমাঞ্চিক ও রাসিকালের সমান্তর বৈপরীত্য যে কত স্বর্ণবীণ তার প্রথম এই যে সেই অতি-রোমাঞ্চিক আজ অতি-রাসিকাল। অথবা, এই উন্নত সম্মান, এই নিম্নরূপ নিঃসৃত্য, এই তুচ্ছ ভৈরাগ্যও আপলে তাঁর রোমাঞ্চিকতারই চূড়ান্ত। তিনি চান "মলের ভাও" থেকে "সদস্য ঈশ্বর"কে ছেঁকে তুলতে, মাংসের পচনক্রিয়াকেও এক আধ্যাত্মিক রসায়নে তিনি পরিণত করেছেন। তাঁর পতিভঞ্জন পাগবোধধর্ম ধার্মিক; জীবনানন্দের লোল নিঃশ্রো প্রাকৃত। "বুড়ো এক গরিলার মতন বিখাসে" সে হাসতে পারে, তার কারণ তার মনে পাগ-পুণ্যের স্থান নেই, আছে শুধু হৃৎ-হৃৎয়ের। তার ক্ষয় বেদনার ঘরা দীর্ঘ হ'তে পারে, পাগের স্পর্শে টির হ'তে

পারে না; সে বড়ো ঘোর শুষ্ক সং, পুণ্যবান নয়। জীবনানন্দ উদার, সংবেদনশীল, এবং মানবপ্রেমিক; তাঁর চরিত্রময় ঈশ্বরের স্থান নেই, তিনি জ্বলোকধর্মী। বুদ্ধদেব বহু কঠিন, অমাহীন, এমন কি নিশ্চেষ্ট; তিনি তাঁর ঘেঁষার জট জগতের লোকে যাকে অজায় ব'লে মনে করে বোধ হয় তাও করতে পারেন; ঐহিক অর্থে তিনি সাধু নয়। জগতের লোকের হৃৎকর্ক করতে তিনি চান না। বুদ্ধদেব বহু ছুৎকে, অস্থৎকে শুধু প্রয়োজনীয় নয়, কাম্য ব'লে মনে করেন। জীবনানন্দের অন্তিম কবিতাগুলিতে মাছের দৃশ্যমোচনের জট এক তীর আকৃতি লক্ষ করা যায়; বুদ্ধদেব বহুর সাম্প্রতিক কবিতা পড়ে কোনো মানবহিতৈষী, পরোপকারী, সমাজসংস্কারক সমালোচকের মনে হ'তে পারে তিনি ছুৎকে কোনো এক তীর মাদকদ্রব্যের মতো ব্যবহার করেন, মনে হ'তে পারে তাঁর ভোগী ইন্দ্রিয় এমন এমন এক তীর অহুত্ব, চরম উত্তপ্ততা কামনা করে যা ছুৎ ছাড়া আর-কিছু দিতে পারে না, মনে হ'তে পারে বুদ্ধদেব বহু এমন দৃশ্যবিলাসী।

জীবনানন্দের বহু বখন চম্পিশের কাঁচাকাছি তখনও মাঝে-মাঝে তিনি ঐ লোল নিঃশ্রোটির মতো প্রাকৃতিক হবার প্রার্থনা করেছেন। তখনো "জড় ও অজড় ভাষালোকটক" যেসামাল হ'য়ে পড়েন। তখনো তিনি যাদেরে নিশ্চল জীবন কাম্য ব'লে মনে করতেন। ঘাস-মাতার নিবিড় গর্তে তিনি এমন এক উচ্চ জীবন আবিষ্কার করেন যেখানে আত্মীয়তা আছে, ঘনিষ্ঠতা আছে, কিন্তু সংগ্রাম নেই, বিচ্ছেদ নেই, প্রাণ আছে, আর্তি নেই, বৃত্তি আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা নেই, নেই পরকাল। তখনো কেমন অন্যায়ালো সব-কিছু যোগ-বিযোগ করেও পেরের শেষে বলতে পারতেন কলকাতা একদিন কম্বোলিনী তিলোত্তমা হবে। আর কোনো-কোনো গভীর হাঁড়বার রাত্রে, যখন তাঁর হৃৎশব্দা তরলীতে পরিণত হ'তো, স্বীত যশারির পাল তুলে তাঁর নিদ্রানু দেহ নভোমণ্ডলে অভিবানে যেতো, তখন তিনি সর্বকালকে এক মুহূর্তে প্রত্যাক করতে পারতেন। সে-মুহূর্তে ধ্বল ও মৃত্যু ধারণ করতো এক মহান কলবর, যা দেখে ভয় করে, কিন্তু পৃথকও জাগে।

‘আর মানিক বন্দোপাধ্যায় কোনো-এক স্থানের মূর্তিতে “হলুদপোড়া” গ্রাফট রচনা করেছিলেন। নাম-গরুটিতে মানুষ কোনো-এক নৃশাল শক্তির জীজনক-মাত্র। কিন্তু তৃতীয় গল্পটিতে চৈতন্য জন্মী হলো। রমেন চৈতন্যে বিন্দু আত্মসচেতন নয়; অপরূপে দুঃখকে সে অহত্বব করতে পারে, নিজের দুঃখে সে তাই কাঁদে হয় না; “কিশোর সম্মানীর মতো সে একেবারে নির্বিকার থাকে তা নয়, ভালবাসা দেখালে শিশুর মতো বৃশি হয়ে ওঠে কিন্তু গলে পড়ে না”; অপরেরা তাই তার “সহজ ও অকৃত্রিম আবেগের ধাক্কা” প্রথমে যেমন বেগমাল হয়ে পড়েন, পরে পরিবর্তিত হন। জীবনানন্দের মতো মানিক বন্দোপাধ্যায়েরও জীবনে অহত্ব এক সময় ধরকের ছিলা টান ছিলো। কিন্তু কী অল্প সময়ের জ্ঞাত! পরমাণুর মত ক্ষয়ও এক ক্ষীণ মুহূর্তের জ্ঞাত স্থিতি আসে, পরমুহূর্তেই ভাঙন শুরু হয়, হয় তাকে পরিবর্তিত হ’তে হয় অজ্ঞ কিঙ্কতে, অজ্ঞ এক স্থিতিস্থায়ী, অথবা সে বিনষ্ট হয়, পরিণত হয় অপর পরমাণুর দাসে। এদের দুজনের জীবনেও সংকটের এমন মুহূর্ত এসেছিলো, ধরকের ছিলা পিয়েছিলো ছিঁড়ে; আস্থা রাখা দুর্বল হয়ে উঠেছিলো; রচনার কৌশল পরিণত হয়েছিলো শুধুমাত্র অভ্যাসে।

কিন্তু তার আগে তাঁরা রচনা ক’রে গেলেন বাংলা ভাষার প্রথম আধুনিক কবিতা ও উপগ্রহ। জীবনানন্দ উপমার পরিচিত সামাজ্যতার ধারণাকে ধ্বংস ক’রে দিলেন। বস্তুর মধ্যে অজ্ঞাত জীবন আবিষ্কার করলেন; জ্ঞান পরিণত হ’লো পুস্তে; ছবি পরিণত হ’লো স্পর্শে, স্পর্শ হ’য়ে গেলো ধ্যান। চিত্রকল্পের মধ্যে আচ্যুত মিলিত হ’লো বিপরীত অভিজ্ঞতা; বিপরীত চিত্রের মধ্যে জ্ঞান মিলে নতুন বোধ। যেন তাঁর পাচট নয়, সহস্র ইন্দ্রিয়। তাঁর শরীরের সবটুকু যেন কল্পনায় স্নায়ু; তাঁর প্রত্যেক স্নায়ু শুধু যে উত্তাপ-কীটলতা, দুঃখ-হর্ষ বোধ করতে পারে তাই নয়, তারা যেন বিবেকবান। এবং সেই সহস্র ইন্দ্রিয় আমাদের স্রষ্টা আবিষ্কার করলো এমন এক চৈতন্যের স্রষ্টা বা নিত্যস্রষ্টা আমাদের কলের। আগেকার কবিতায় জগৎ ছিলো মানুষের স্বপ্নাঙ্কুরের প্রতিবিম্ব, এখন মানুষ জগতের বিবেকে পরিণত হ’লো। আধুনিক কবিতা

আবেগ এবং বুদ্ধির অতীত; জীবনানন্দ অতি-চৈতন্যের কবিতা রচনা করলেন। প্রকৃতির মধ্যে যিনি শুধুমাত্র সৌন্দর্য নয়, দুঃখও আবিষ্কার করলেন, তিনি কী ক’রে আর নিছক নির্গণ-কবিতা রচনা করবেন? জীবনানন্দের পর থেকে বাংলা ভাষার নিছক নির্গণ-কবিতা নৃপ্ত হ’লো। আর নিছক প্রেমের কবিতাও। বীর দৃষ্টিতে প্রেম মৃত্যুর মতো সব-কিছুতেই নিহিত আছে, বীর অহত্ববে স্নান, নদী, বিধাস—যা-কিছু সঞ্চিত করে, জন্ম দেয়, ভাগিয়ে নেয়—তা-ই নারী; যিনি স্বীকার করেন “যাস, রোদ, শিশিরের কথা/ভাড়াও জাগিয়ে গেছে আমাদের শরীরের ভিতরে কামনা” তিনি কী ক’রে “এমন দিনে তাকে বলা যায়” ধরনের প্রেমের কবিতা লিখবেন? আর নারী পরিণত হ’লো প্রকৃতির তীব্রতম, মদিরতম, উচ্চতম, স্নিগ্ধতম জন্তুতে। সে “রক্তকরবী”র নন্দিনী নয়, কোনো মহান চিন্তার কাঁকাসে প্রতিমূর্তি নয়, সে-নারী প্রকৃতির রূপক নয়, সে দ্বিতীয় প্রকৃতি। আর, তাঁর কবিতায় আলো আর অন্ধকার মিশে গেলো পশুরদের মধ্যে, যুগ আর জাগরণের ব্যবধান লুপ্ত হ’লো। বঁচে থাকার সঙ্গে জড়িয়ে গেলো মৃত্যু। ভাবতে অস্বাক লাগে যে জীবনানন্দের আগে বাংলা কবিতার আত্মহত্যা প্রবশ করনি। স্থির বিশ্বাসে আত্মদানের নিদর্শন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আছে, কিন্তু আত্মহত্যার উদাহরণ নেই। এবং যোয়োগীয় সাহিত্যেও অকারণ আত্মহত্যা নতুন। জীবনানন্দের আগে সেই উট কি কোনো ভারতীয়কে আত্মনা করনি? জটিলযন্ত্রের আগে কোনো যোগাযোগিক?

মহাভারতেও আত্মহত্যার উল্লেখ আছে: ভীষ্মের। কিন্তু সেই মহান মৃত্যু আত্মহত্যা নয়, আত্মবিসর্জন। বিবদাহিতো আর কার মৃত্যু এমন পরিপূর্ণ, এমন সার্থক? আর আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও ইচ্ছামৃত্যুর দৃষ্টান্ত আছে—বান্দব ও তাঁর স্বীরা। এই যুগ-আত্মহত্যার চিন্তা পাঠকদের অবশ ক’রে দেবে; অকারণ, নিত্যজ্ঞ অকারণ এদের আত্মহত্যা। এমনকি “আট বছর আগের একদিন”—এর নাটকের-মৃত্যুও এত অকারণ নয়। তবু তেঁা সে নিজে, সজ্ঞানে, তার মৃত্যু চেয়েছিলো। বান্দব বা তাঁর স্ত্রী এ-মৃত্যু চাননি; অথচ পরিজ্ঞানের

কবিতা

আখনি ১৩৬৬

স্বয়ংগ থাকা সত্ত্বেও ধরা দিলেন। যেন তাঁদের মনের অন্তরালে যে-সব স্বপ্ন তারে বা আবৃত্তে জীবনশক্তি সঞ্চারিত হয় তা ছিঁড়ে গেছে। এক অন্ধ শক্তির করলে এই ইচ্ছারাহিত দম্পতি নিজেদের ছেড়ে দিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে, এবং গল্পে, এই প্রথম আমরা এমন এক শক্তির পরিচয় পাই যা বাস্তব বস্তু মেনে প্রয়োজন এর কোনোটাই নয়, বার অবিচল সম্পর্কে আমরা সচেতন নই, অথচ বা আমাদের সারাক্ষণ পরিত্যক্ত করছে। অর্থাৎ, বুদ্ধির অগম্য যে-লোক তা তিনি আমাদের সামনে উন্মোচিত করলেন।

উপন্যাসে এতৎকাল ব্যাখ্যা ছিলো, ছিলো বর্ণনা, ছিলো ইতিহাস, বক্তৃতা, বিতর্ক। “পুতুলনাচের ইতিকথা”র আছে চরিত্রের ও ঘটনার স্পষ্টতা, এমন স্পষ্টতা যা গাঢ় হ’তে-হ’তে পরিণত হয় অর্থের আভাসে ও সংকেতে। ভূতোর মৃত্যুর দিন যাদবের সঙ্গে শশীর দেখা—লাঠি ঝুঁক-ঝুঁক যাদব উপন্যাসে প্রবেশ করলেন। “লাঠি ঝুঁকিয়া যাদব গথ চলেন। শশী জানে এত ছোরে লাঠির শব্দ করা সাপের জ্ঞাত। মরিতে যাদব কি ভয় পান—জীবন-মৃত্যু ঝাঁক কাছে সমান হইয়া গিয়াছে? অথবা শুধু সাপের কামড়ে মরিতে তাঁহার ভয়?” এতকুৎসেপে। মূহুর্তে আমরা বাকিটা দেখতে পাই। যে-অন্তরিক্ষির দিয়ে সেই প্রথম পরিচ্ছদের শোয়ালাটি দেখেছিলো, সেই রকম এক জাক্জব বোধ পাঠকের মধ্যেও জাগ্রত হ’য়ে ওঠে। “...শারীরাগিকের বাজাটিকে মুখে করিয়া সামনের-মাঠ দিরা ছুঁপাখ করিয়া পার হইয়া যাওয়ার সময় একটা শিয়াল বার বার মূখ কিরাইয়া হাককে দেখিয়া গেল। ওরা টের পায়। কেমন করিয়া টের পায় কে জানে!” পাঠক কী করে টের পান তা তিনি স্পষ্ট বোঝেন না—লোক তাঁর সংকেতগুলি এমন গোপনে শশীর ভাবনায় লুকিয়ে রেখেছেন। মরতে যাদব কি ভয় পান? পান, আবার পানও না। জীবন-মৃত্যু তাঁর কাছে সমান, আবার সমানও নয়। সমান না-হ’লে তিনি কি নিজেই এভাবে হত্যা করতেন—পলারনের উপায় থাকা সত্ত্বেও? আবার সমানও নয়; মৃত্যুর মূহুর্তেও অনময়ক ভয় ক’রে গেলেন, পলারীর চেয়েও তিনি মোহগ্রস্ত। সাপের কামড়ে ভয়? হয়তো। কিন্তু আনিম-নামক বিষয়ে তো তাঁর মৃত্যু,

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

এবং যেচ্ছায় সে-বিষ তিনি পান করলেন। টমাস মান্ন হ’লে ইদ্রিতিকে আরো জটিল করতেন, বিস্তারিত করতেন, “পাগল দিদি” নামের অর্থনয়তা আরো স্পষ্ট হ’তো। কিন্তু হয়তো এই ভালো, এমন সংগোপনে বিকসিত অর্থের সৌরভ তীব্রতর হ’লে আমরা তাঁর মূল্যের সন্ধান করতাম, অজ্ঞাতকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করতাম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাও টমাস মান্ন কিংবা ‘অজ যে-কোনো আধুনিক ঔপন্যাসিকের রচনায় মতো অতিপ্রাকৃত বাস্তবনায় টুটুইত। শুধু তিনি তাঁদের মতো আত্মসচেতন নন। ধ্যানলব্ধ ছবির মধ্যে আরো কিছু ভ’রে দেবার তাঁর প্রয়াস নেই। টমাস মান্নের উপন্যাসে দিবাদুরি তো আছেই, আরো আছে বুদ্ধি; আছে আবহমান সাহিত্যের স্মৃতি। তাঁর উপন্যাস শুধু সাহিত্য নয়, খুব বেশি সাহিত্য। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার মধ্যে কোনো সচেতন প্রয়াসই যেন নেই। যেন হয় যেন প্রকৃতির মতোই নিজের অজ্ঞাতে তিনি ক্ষুরে-তুরে এমন রস্তু রেখে গেছেন, এই আমাদের মতো বিচক্ষণ ভূতবৃহৎ না-থাকলে বৃষি সে-অর্থই অন্ধকারেই পড়ে থাকতো। যে-সব চিহ্ন দেখে কোনো আধুনিক লেখকের গুণ্ড ঐক্যেই আমরা সন্ধান পাই, সে-সব ইদ্রিত কোথায়? কোথায় সেই ব্যাকরণগত, সেই ভাষাভি “পরীক্ষা-নিরীক্ষা”, বা সেবাভাষ এমনকি “পজ-পজিকা”র সমালোচকেরা যে কোনো উপন্যাসকে অভিনব বলে চিনতে পারেন?

প্রথম পাঠে “পুতুল নাচের ইতিকথা”কে মনেই হয় না আধুনিক। অথচ এই উপন্যাস অজ কোনো যুগে রচিত হ’তে পারতো না। আঠারো শতকের ইংরেজি উপন্যাসে কোনো-না-কোনো দার্শনিক বা নৈতিক প্রতিপাত ছিল; উনিশ শতকের উপন্যাসে ধরা পড়েছে ব্যক্তি এবং সমাজের চরিত্র, বাস্তবিকতা ছিলো সে-যুগের শিল্পীর চরম লক্ষ্য। আর বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ ঔপন্যাসিক (এবং এমন কি যুক্তরাষ্ট্র-এর টমাস মান্ন) রচনা করেছেন পুরুষাঙ্কজমিক ইতিহাস, জন্মানবতির পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিকা, বিভিন্ন যুগের দৃশ্য। বিশ শতকের গোড়ার দিকের উপন্যাস আসলে উনিশ শতকে রচিত হওয়া উচিত ছিলো। বিশ শতকে এসে উপন্যাস যেমন ছড়িয়ে পড়লো তেমনি

কবিতা

আখিনি ১৩৬৬

আবার গুটিয়ে নিলো নিজেকে; তার বিশ্বয় হ'লো একটিকে যেমন সারা ব্রহ্মাণ্ড, অজ দিকে দিবা দৃষ্টিতে দেখা, অন্তরিক্ষিতে পাওয়া অনির্কণীয়, বস্তু এক অভিজ্ঞান। চরিত্র নয়, ব্যক্তির অস্তিত্বলো দেহ-হস্তটি আছে; সমাজ নয়, সমাজের আঁটিতে যে-সংস্কার, প্রাণ, ধর্ম লুক্কিয়ে আছে; প্রকৃতি নয়, চেনা জগতের মর্মে যে-শক্তি আবদ্ধ আছে তা আত্মপ্রকাশ করলো আধুনিক উপজাতি। মাছুষ ও পশু, মনুষ্য ও প্রকৃতির সংঘর্ষে মাছুষ হারালো তার বিবেক, পরিণত হ'লো পশুতে; জন্তুরা হারালো তাদের পশুত্ব, হ'লো বিশুদ্ধ প্রাণী; আর প্রকৃতি তাঁর ভীকতা থেকে মুক্ত হলেন, দুলাব হারালেন, তাঁর জড়ত্ব উবে গেলো। কোথায় গেলো আঠারো শতকের শিথিল, অগোছালো, নির্জীব প্রকৃতি? আর রোমান্টিকদের প্রিয় সেই সরল, সেরংগিল প্রকৃতি? বিশ শতকে তিনি তাঁর মানবিক রূপ হারালেন; প্রকৃতি এখন নির্যিবেক, নিশ্চেষ্টতন, নির্বাক। আরো পরিবর্তন হ'লো। এখনকার উপজাতি চরিত্রের বা ঘটনার, সমাজের বা প্রকৃতির ভিন্ন কোনো সত্তা নেই। লেখক আর চরিত্র উল্কাবৃষ্টির নিমিত্ত ঘটনার বর্ণনা করেন না, বিশাল সমাজের ছোটো আখ্যান হিসেবে ব্যবহার করেন না ব্যক্তিচরিত্রকে, নায়কের মেজাজের প্রতিক্রিয়া শোনে না প্রকৃতির মধ্যে। যেমন ছবি শুধু রেখা নয়, রং নয়, ঘন-হালকা ছায়া-আলো নয়, তা যেমন এই সব-কিছু দিয়ে গড়া নতুন এক সত্তা, তেমনি এ-কালের উপজাতি চরিত্র, ঘটনা ও সমাজ পরস্পরে মিশে যায়, সব মিলে তৈরি হয় এক পরিস্পর্ষ ছবি। "পুথুল-নাচের ইতিকথা"য় গল্প নেই, অন্তত এমন গল্প নেই যা সংক্ষেপে মনোহরণ করতে পারে। আর চরিত্র? অসংখ্য চরিত্র,—জীবন্ত, বাতাবিক,—কিন্তু কোনো চরিত্রকেই আমাদের চোখের সামনে বেশিগুণ রাখা হয় না, তারা পরিপূর্ণরূপে বিকাশলাভ করার আগেই অপর্যাপ্ত হয়, যেন লেখক তাঁর জগৎপ্রবেশ রথের তলায় সবাইকেই বলি দিতে পারেন, যেমন উপজাতির সম্মিলিত গতিবেগে যে-কোনো চরিত্রের চাইতে বেশি সূচনাগত মনে করেন তিনি। এবং, উপজাতিতে বর্ণিত প্রাচীরের ভূগোল যদিও আমাদের কাছে স্পষ্ট—বাংলাদেশের সজলভাষা, ভ্রাম্যমান তায় যেন উপজাতিটো স্যাংস্খ্যাত করে, পড়তে-পড়তে পাঠক

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

চোখের সামনে সবুজ ছাড়া অজ কোনো রং দেখতে পান না—তবুও বিশেষ ক'রে নিঃসংশয়তার বর্ণনা আছে সারা উপজাতিতে কয়েক লাইনমাত্র। বিকৃতিকৃৎন থেকে কত ভিন্ন তিনি! এবং ভার্যশব্দও তিনি নন। প্রকৃতি যেমন তাঁর উপজাতিসের বিশ্বয় নয়, তেমনি গভ্র যুগ এবং এ-যুগ, যামিনী কবিরাজ ও শরীর ভাঙারি, যাবতের পঞ্জর-নির্মিত হাসপাতাল ও চরক-হুশ্রতের বিরোধ তাঁকে আকৃষ্ট করে না। তাঁর উপজাতি পড়লে অন্তত মৃত্যুভীর জ্ঞান মনে হয় যে গলগলি বা তারারদর বর্ণিত বিরোধিতা মাছুষে-মাছুষে বিরোধ, আত্মীয়দের মধ্যে মনোমালিন্য ও জায়ে জায়ে কলহের মতো তা স্থানীয়, দলকালীন ও নগণ্য। কী বিপুল, নিষ্টর, মীমাংসাহীন যুদ্ধের সন্ধ্যা তিনি; সে-যুদ্ধ চিরকাল ধ'রে চ'লে এসেছে; হিম, জড়, স্থির নন্দ্য থেকে পরমাধুর্ন হয়ে দুঃখ বিদ্রুৎপূর্ণ পর্বত সব-কিছু সে-যুদ্ধে লিপ্ত; জড়ত্বের সঙ্গে চৈতন্যের সে-অনাদি সংঘর্ষে কোনো পক্ষই পরাজিত হয় না—শরী যদিও হেরে যায়, লেখক তাকে কল্পনা ক'রেই প্রমাণ করেন চৈতন্য এখানে লুপ্ত হয় নি।

জীবনানন্দ এক সময়ে সেই সব মমতাবান মাছুষকে দখলবা জানিয়েছিলেন যারা "মরণের আগে মৃতদের জন্ম" একটু আরামের ব্যাবস্থা ক'রে দেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন মৃতপ্রায় রোগীও বেঁচে থাকতে চায় "উজ্জল সমাজের" আশায়। কিন্তু শরীরের সব অভাব দূর হ'য়ে গেলেও মাছুষের মনে সেই নিরাপত্তার দূত হানা দিতে পারে। আর, পন্ডার তীরে প্রাচীন যেমন আসে, সে-বতী নেমেও যায়; প্রচণ্ড বড়ের আত্মও মাজ এক রাত। প্রাকৃতিক জড়োণ, প্রকৃতির রূপমতা, সামাজিক অবিচার,—সবই মাছুষের চোঁদ বদলাচ্ছে, সংশোধিত হচ্ছে। কিন্তু কোথায়, কবে, কী উপায়ে প্রশ্নমিত হয়ে শোক? "পদ্মানদীর মাঝি"র যে-একটিমাত্র ব্যাক্যে মনে হয় লেখকের আপন কথাতো মাছুষের ছুরের এই দুর্বলতার উদ্দেশ্য আছে। ব্যাচার জল বদন ক'রে এলো তখন কে যেন সংগোপনে, নিশেঘে সংশয় প্রকাশ করে। এই কিছুকণ আগেও তো প্রাচীন ছিল দুর্বল! আশ্রয় বহন বিকল্পতা করে মাছুষ তখন আত্মগোপন

কবিতা

আখিন ১৩৬৬

করবে কোথায়? প্রলয় নেমে এসেছিলো পদ্মার তীরে। সে-প্রলয় কি এত শীঘ্র দমিত হয়েছে?

কমে মাঠ ঘাটের জল।

ও তো মানুষের চোখের জল নয়, কান্নাধে বই কি। একদিন মালার বড় ভাই অধর খবর লইতে আসে।

অকথিত সংশয়ের উত্তর দিতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাছুদের চৈতন্য সম্পর্কে এমন এক তথ্য প্রকাশ করেন যার পর বছর প্রশমনের সংবাদে আমরা হুগে অস্বীকার হয়ে যাই না। জীবনে হুগের কারণ নিশ্চয়ই আছে, যত্না যেমন সত্য, তেমনি সত্য জন্ম। তবুও মাছুদের চোখের জল শুকায় না, তার কারণ যে-মাছু মাঝা মাঝে সে আর কিংবদন্তি আসে না, যে-শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তারও একদিন যত্না হবে। এবং হুগ যেমন হুগের স্মৃতি এবং আশা মুছে ফেলাতে পারে না—তা না-হলে কে আর প্রিয়জনের যত্নার পরও বেঁচে থাকতে পারতো?—তেমনি হুগই হুগের উর্বরতম ভূমি। জীবনানন্দ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় “স্মৃতির নাড়িতে হাত রেখে” টের পেয়েছিলেন “অদৃষ্টব বৈদ্যনার সাথে বিশেষ র’য়ে গেছে অমায় আশাধার/তবু তাত্তা করে নাকো পরস্পরের ক্ষণ শোষণ।”

অথচ কয়েক বছরের মধ্যেই মনে হ’লো ঋণ শোধ হ’য়ে গেছে। জীবনানন্দ শেষ জীবনে এক নতুন শব্দের ব্যবহার শিখলেন: “তবু”। একটি কবিতার নাম “তবু”। কত কবিতা শেষ হয় “তবু” দিয়ে, কতো কবিতার গতি বদলে যায় এই শব্দটির আকস্মিক আবির্ভাব।

এ যুগে কোথায় কোনো আলো নেই—কোনো কান্তির আলো চোখের সমুদ্রে নেই মাছুদের; নেই তো নিসৃত অশ্রুধার রাগির মায়ের মতো.....
তবুও মানুষ অন্ধ দুর্ভাগ্য থেকে নিশ্চয় আশারের দিকে অশ্রুধার হতে তার নবীন নবরী গ্রাম উৎসবের পানে যে অনবদ্যে চলছে যাত্রা—তার হৃদয়ের ভুলার পাশের উৎস অভিমুখ করে ছেতনার কলারের নিরানন্দ র’য়ে গেছে বলে মনে হয়।

(১৯৬৬-৬৭)

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

মানুষের মত্না হলে তবুও মানুষ থেকে যায়; অভ্যন্তর থেকে উঠে আলোকের মানুষের কাছে আরো ভালো—আরো টপক বিকশিতের মতো চতুর্দার পরমাণু নিরন্তরিত করে কতোদূর অগ্রসর হয়ে গেল জীবনে দিতে আসে।

(মানুষের মত্না হলে)

চারিদিকে নীল নরক প্রবেশ করার চান অসীম স্বর্ণা শূন্য দিয়ে লাক কোটি নরককাঠের দানি জাপিয়ে তবু সে-কটি বদলে করার মতো হ’লে ইতিহাসের গভীরতম শক্তি ও প্রেম রয়েছে শিখর হারতো ফলে।

(অনন্দা)

উদ্ধৃতির আধিক্যের কারণ আছে। শেষ জীবনে জীবনানন্দ যে শুধু “তবু”র অযৌক্তিক মায়ায় ভুলেছিলেন তা-ই নয়, তাঁর শেষ কবিতাগুলি যেন মোহাবেশে লেখা—এমন হ্রোড়ের মতো শব্দগুলি ব’য়ে যায় যে মনে হয় লেখক বৃষ্টি আশ্রমসম্পূর্ণ করেছেন। তাঁর পুরোনো কবিতা ইন্দ্রিয়কে সিক্ত করে তবু পৌছিতে বিবেক, বুদ্ধিতে; তাঁর জাহ্নতে আমরা অবশ হতাম। এখন কেউ যেন তাঁকেই মোহিত করেছে, যেন এক বোয়ের মধ্যে লিখে চলেছিলেন তিনি। “অসীম স্বর্ণা,” “নীল নরক,” “কান্তিময় আলো,” “অন্ধ দুর্ভাগ্য,” “ইতিহাসের গভীরতম শক্তি”—এরকম সব শব্দের আঘাতে আমরা কাতর হই। সেই কবি, বীর জ্ঞানশক্তি ছিলো জন্মের মতো, বাহুড়ের মতো জাগ্রত কান, মাছি এবং ইন্দ্রের মতো বীর সহস্র নমন, বীর ত্বক ধরণীর হৃদয়তম স্পন্দন সাপের মতো গ্রহণ করতো, সেই উপমার স্রাট চিত্রকরের জাহ্নকর হইৎ কেমন যেন গরিব হ’য়ে গেলেন, জরা যেন আচ্ছন্ন করলো তাঁর ইন্দ্রিয়, লাগুনা এমন দুর্বল হ’য়ে পড়লো যে শুধু শব্দ, অগণিত শব্দ গ্রহণ করতে শুরু করলেন তিনি। অবশ্য এখনো কোনো-কোনো পাঞ্জির স্পষ্টতায় চামকে উঠতে হয়, পাঞ্জির মন ভরে যায় গন্ধে, রসে। “সেই রক্ত দেখে জাপটে ধরবে” (কী অতিপ্রাকৃত স্পষ্টতা ঐ অগ্রভাষিত বিশেষণে!) আমরা “জোড়ে উঠে দেখি” কে যেন (একে চিনি না, ইনি আমাদের সে-জীবনানন্দ নন) “ইতিহাসের অশ্রম স্থলতাকে ঘূর্তিয়ে দিতে জান প্রতিভা আকাশ নম্রতাকে ডাকে।” আমরা লক্ষ

কবিতা

আখিন ১৩৬৬

করি “গাভীরা তারার তিমিরে”ই যেন তিনি স্পষ্ট দেখতে পেনেন, “সময়সাগরের তীরে”, অতিরিক্ত আলোয় সব-কিছু ক্যান্ডিলা হয়ে গেছে। বর্তমান জগৎ বেদনারায়ক হ’লে পারে, কিন্তু তা ইন্ড্রিগোচর; আকাশকুসুম বহই স্বপ্নের হোক, তার রূপ মরচ্ছত্রে কেউ দেখেনি। তাঁর পরিচিত জগৎও তিনি অস্বীকার করলেন, কারণ তা এতো স্পষ্ট, এতো জীবন্ত ছিলো যে তাঁর ইন্ড্রিগোনিকে অহুত্বভিত্তিরূপে তা প্রাতিত করতো, বাধা দিতো বিবেকে, বুদ্ধিকে করতো কাতর। এর পরিবর্তে, তিনি শুধুমাত্র ইচ্ছার দ্বারা আরেক জগৎ গড়ে তুলতে চাইলেন, কিন্তু সেই স্পষ্টত জগৎ নিরুপায়, নির্জীব, অশরীরী। আমরা বুদ্ধি কেন তাঁর দ্বার অহুত্বের এমন তীর বর্ণণে গ’লে গেলো, ভেঙে গেলো—নামাত্র মাহুয় আর কতোটুকু সন্ধ্যা করতে পারে! কিন্তু আমাদের শরীরে আর সেই রোমাঞ্চ জাগে না, অভিজ্ঞত হয় না ইতিহাস।

আর আমাদের বুদ্ধিও নিরাশ হয়। কেন, আমরা প্রশ্ন করি, কেন তাঁকে অবিশ্বাস্য, অযৌক্তিক জ্যোতির্ভাষি দিয়ে এততো ‘কবিতা’ শেষ করতেই হবে? এমনকি শিল্পীমূল্যচুড়ামণি ঈশ্বর তাঁর মানবজীবন-নামক মহৎ নাটক শেষ করছেন নায়কের মৃত্যুতে; আমাদের কেন তবে প্রতি নাটককে কমেজিত পরিণত করতেই হবে? মাহুয়ের যে-শরীর আমরা চিনি তা রোগজীবাণুতে পূর্ণ, তার অঙ্গ কখনোই মলহীন হয় না। কোনো চিকিৎসকের যদি এমন বাগনা হয় যে তিনি তাঁর রোগীকে নির্মল করবেন, যদি তিনি মাহুয়ের শরীরের শরীরস্থ অস্বীকার করেন, তবে বিস্তৃত রোগে পরিণত হবে তাঁর রোগী। যিনি পৃথিবীর অসম্পূর্ণতাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে পারেন না, তিনি অন্ধ, তিনিই জীবনবিরোধী, তাঁরই জীবনবোধে শিথিল। মিথ্যাভাবন, অজ্ঞতা, ইচ্ছাকৃত অন্ধত্ব—এরাই মৃত্যুর সহায়। যে-কবি সময়সাগরের পরশায়ের অবস্থিত এক বিশুদ্ধ জগৎয়ের ধ্যান করেন, “আগুনে-আলোয় জ্যোতির্ধর” এক লোকে “উত্তরপ্রবেশ” করেছেন বলে প্রচার করেন, মাহুয়কে হিংস, লোভী, ভীত ভ্রমেন্ত বলেন তবু এ-সব সে নর, তিনি তাঁর শিল্পকে, তাঁর অভিজ্ঞতাকে, তাঁর “জীবনবোধ”কে বিসর্জন দিয়েছেন। কবিতা ততো দূরই অগ্রসর হ’তে

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

পারে যতো দূর মাহুয়ের অবচেতনতা, চেতনা এবং অচেতনতার অধিগম্য। তার পরে যা আছে তা প্রাকচেতন জ্ঞান বায় হয়তো, ব্রাহ্মেন্দ্রিয়িক বস্তুত্ব মাহুয় হয়তো হিংসা, লোভ, ভয় পরিত্যাগ করতে পারে, জাহ্নবিতায় হয়তো প্রকৃতির নিয়ম বদলে দেওয়া যায়। কিন্তু কবিতার, দর্শনের এবং বিজ্ঞানের যেনে নিতে হয় মানব বা জড়প্রকৃতিকে। কোনো আত্মাদি ভোটাটাতা যদি নিকটক সমাজের আশ্বাস করেন তবে ভোটাটোটা নির্বাচনপ্রার্থী সে-চিরসত্যের আশা-কুসুমের বর্ণের ছটা, গন্ধের মাদকতা বর্ণনা করতে বাধ্য হবেন। কিন্তু যে-ভুতবর্ষিদ মনে করেন পৃথিবীর যুগে আরেক তুয়ারমুগ আসন্ন, তিনি, সে-সন্তানবা ভয়াবহ ব’লে, স্বীকারে অভয় দেখেন তুয়ার-মুগ আসছে তবু আসছে না? কোন জ্যোতির্বিদ বলছেন সৌরলোক অবিনশ্বর? পাঠকের তুষ্টির ক্ষত কোন শেখরপীরর বলছেন যে মাহুয় স্বর্ণের শিশু? কবে কোন কোমল ভক্তয়েভারি আশ্বাস দিয়েছেন পৃথিবী নিশাপা ব’লে?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মান্তরের কাহিনী হৃদয়িত। তিনি যে-জগৎ শিশুর মতো উপলব্ধি করেছিলেন তা দ্বন্দ্ব-বিবারক, যেন-তুদন পূরণ-কথা তিনি সংশয়হীন চিত্তে যেনে নিলেন তাতে ই সব দ্বন্দ্ববিবারক ঘটনার মানে যুগে পাওয়া গেলো। দেখা গেলো যে নিষ্ঠুরতা মাহুয়েরই এক চিত্তবৃত্তি নয়, আসলে তা দেহাংই অস্বাধী এক নড়বড়ে সমাজের বিগ্রহবৃত্ত। বরং বর্তমানে যতোই নিষ্ঠুরতা বুদ্ধি পাবে ততোই উজ্জ্বল হবে ভবিষ্যতের আশা। স্বী সহজে হঠাৎ সব-কিছু শিশিতে-ভরা, লেবন-মারা হ’লে গেলো। এমন কোনো চরিত্র রচনা করতে তাঁকে একটুও বেগ পেতে হয় না। যে-মুহুর্তে তিনি ঠিক করেন একজন জ্যোতির্বিদ কিংবা একজন ঠিকেশ্বরের চরিত্র গড়তে হবে, তৎক্ষণাৎ তিনি “সাধারণ-বিষ”-মার্কী আলমারি থেকে নামিয়ে আনেন বোতলের পর বোতল। স্বাৰ্ধ-চিহ্নিত শিশি থেকে অনেকটা, হিংসার শিশি থেকে আরেকটু, লোভ, জোড়, কপটতা থেকে বাস্টিটা চলে নিয়ে তৈরি হয় পটান। সংজ্ঞা, অস্তিত্ব তরল হ’লে যেগুলো সব-কিছু। চরিত্রের কোনো জটিলতা, ক্রমবিকাশ, পরিবর্তন, পরিণতি—কিছুই রইলো না। রূপকথার যেমন সকল দুঃখের কারণ

কবিতা

আখিন ১০৬৩

একটিদায় ঈর্ষান্বিত সতিন কিংবা সিংহাসনলোভী বৈদ্যের জ্ঞাত্য, বর্তমান
দুঃখের হেতু এই অর্থোজিক সমাধা। এই সমাজ পরিবর্তিত হ'লে—এবং কোন
সমাজ অস্বাভাবিক?—মানবসত্ত্বের জীবন অবিমিশ্র হৃৎকর হ'য়ে উঠবে। রূপকথার
শেষে ভিন্নমাত্রা সংস্কারের স্থান নেই; পাঠকের এমন মনে হয় না যে বিপ্লব
রাজ্য যদি বিনয়ী ও দৈর্ঘ্যবতী দুঃখারানীকে ভালো না-বেসে অধিরুদ্ধ, লাশসমী,
স্বার্থপর হৃৎকরানীকে ভালোবাসতে পারেন, রাজপুত্রও তবে তাঁর আঙ্গুরের
প্রেমসীকে পরিচয়্যাপ ক'রে আর কাগো কাগো কেশের সন্ধান যেতে পারেন।
আমাদের এমন সন্দেহ হয় না, তার কারণ রূপকথার চরিত্রেরা মাছ
নয়, মাছদের ইচ্ছার ও আত্মের ছায়া মাত্র। মানিক-বন্দোপাধ্যায়
দে-স্বর্গলোকের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাও এমনি অপরিসীম; তাঁর জ্যোতিষেরা
জিরকালের জ্ঞান দাগি, তাদের লুপ্তি হ'তে পারে কিন্তু কখনো তাদের সংবি-
জ্ঞাপন না, যা-ই ঘটুক তাদের মধ্যে কেউ শ্রেণীস্বার্থ পরিচয়্যাপ ক'রে সন্ত হ'বে
না কোনোদিন।

মানিক-বন্দোপাধ্যায় আগে অত নিষ্ঠুর ছিলেন বলেই অত বেশি সহনশীল
হ'তে চেয়েছিলেন। দয়া করতে গিয়ে তিনি যা রচনা করলেন তা নিরানন্দ ও
নিজীব। কিন্তু ভবুও, মাঝে-মাঝে, লেখকের সফল কৌশল ব্যর্থ ক'রে, তাঁর
চরিত্রেরা বৃষ্টির গোলমাল বেটে আত্মপ্রকাশ করে; তাঁর সন্তানগণ তাঁর কাছে
দাবি করে শুধু নাম বা আয়ু নয়, ব্যক্তি। এবং তখন, অতিরিক্ত দয়ার বশে,
লেখক তাদের কাহিনীর উপর হঠাৎ বনিকাপাত করেন। যেমন চুক্তি-
পীড়িত মাতা তাঁর দুঃখিত সন্তানদের আত্মনাম লুপ্ত করে না-পেরে তাদের
হত্যা করেন, যে-গ্রাম তাঁরই দান, যাদের এ-পৃথিবীতে আনবার জন্ম নিজে
বারংবার মৃত্যুর দরজায় হানা দিয়েছেন, সেই গ্রাম, তাঁর নিজের শরীরের চেয়ে
আপন শরীর তিনি যেমন ধ্বংস ক'রে বিতে পারেন রেগের তীব্রতায়, তেমনি
দুঃখের আশিষ্যে মানিক-বন্দোপাধ্যায় তাঁর আত্ম, দুঃখিত শিশুদের কঠোর
করতে বাধ্য হন। গল্পের নিয়ম উপেক্ষিত হয়, শিল্পীর সত্যতা কোথায় হারায়
কে জানে। যে-কাহিনীর স্বরূপাতে তিনি সত্যক হন নি, সে-কাহিনী এখন

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

অমোঘভাবে এমন এক সংকল্পের দিকে দাবিত হয় যা তাঁর ঐ রাজনৈতিক
রূপকথার বিরোধী, তখন তিনি বলতে বাধ্য হন :

গল্পের উপন্যাসের লেখকের বাস্তবত মন্তব্য। (গল্প লেখার চরিত্রের আইন ভঙ্গ করে):
নব'র মা এবং পিনী এই বন্যাত্তই অজ্ঞা পেরেছে। জড়ের অজ্ঞান প্রাণ, হেলেনাদেব নয়
এবং বাক্য মেয়েটিও যে মরে মেছে তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এটা যে বানানো গল্প
নয় প্রমাণ করার জন্য জ্ঞানত সাক্ষী খাড়া করতে পারবে কিনা ভাবি।

গল্পের জন্ম "জ্যোতিষ সাক্ষী"র প্রয়োজন অজ্ঞ কোনো লেখকের হয় না, কিন্তু
মানিক-বন্দোপাধ্যায়ের হয়। নব'র মা অতাবে এমন কাতর হয়েছিলো যে
শুধু ব'রটেছিলো সে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু সে মরেনি, টাকাও জোগাড়
হয়েছিলো, ডাক্তারও ডাকা হয়েছিলো অনাথের জন্ম। সমাজ যদি হৃৎকর
একমাত্র প্রতিবন্ধক হ'তো তবে কোনো চুপ ছিলো না তাদের। কিন্তু আরো
শব্দ আছে, এক মুহূর্তে জীবী হ'য়ে পরমুহূর্তেই মাহুকের রূপস্ফা ধারণ করতে
হয়। সাক্ষী চাই, নিজের কাছে, ও সমবিশ্বাসীদের কাছে, প্রমাণ করা চাই
যে এ-কথা সত্য। তাঁর বানানো গল্প হ'লে সবটুকু দামিষ তাঁর, কৌশলে
এড়ানো চাই সে-দামিষ। কারণ, এ-গল্পের আসল দে-উপন্যাসের তা এখন
আর তিনি লিখতে পারেন না। সে-উপন্যাসের জোনার তান বতই কখন
তিনি, আমরা ভুলিনি :

কমে মাহুকের জল।

ও তো মানবের চোপের জল নয়, কনিষ্ঠই তো।

লোককল্পনার যৌবন নির্ভীক, এমনকি ছুসাহসী। বার্ষিকের শিল্পী নাকি
অগ্রপশ্চাত্ত বিবেচনা করেন, বিপরীতের সমন্বয় ঘটান, স্বর্ণ-নরকের যুগ ছবি
জানেন। গোটে এবং উমাস মানু অন্ধকার থেকে আলোয়, বোমাতিক থেকে
ক্লাসিকে, নরক থেকে স্বর্গে নাকি পৌঁছেছিলেন। শেখারপিরের যে-ছবি
ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করা হয় তা এক বিশ্বাসবিলী, নরকদর্শী যুবকের,
যিনি যৌবনকে সংস্কারের স্বপ্নরূপে অতিক্রম ক'রে মিলনে, সমাধানে, শান্তিতে
উপনীত হয়েছিলেন। লোককল্পনার সেই শিল্পী জীবনানন্দ এবং মানিক
বন্দোপাধ্যায়। যৌবনে তাঁরা ছিলেন বহির্লোক; পাঠকে তাঁরা শেখাতে

চান নি কী ছিলে বেঁচে থাকা যায়, শুধু জানাতে চেয়েছিলেন কী ব্যথার ছায়ায় আমরা বেঁচে থাকি। পরিণত বয়সে জীবনধারণের মন্ত্র ছিলেন তাঁরা, শোনাসেন আশার বাণী, শেখালেন বিশ্বস্তির কৌশল। মহৎ শিল্পী তো তিনিই যিনি তাঁর রচনা ছেড়ে জীবনকে বরণ করেন? মাছঘের চেয়েও মহৎ কি তিনি নন যিনি ছাঘের গরলকে কঠে ধারণ করে পৃথিবীকে নিরাপদ ও বাসোপযোগী করে তোলেন?

সায় দিতে খতই চাই, আমরা এ-প্রশ্নের উত্তরে “হ্যাঁ” বলতে বিধা করি। আমাদের মনে হয় এ-বিষয়গ জীবন নয়, নিষ্কা। মিথ্যা যদি স্বপ্নগ্রন্থ হয় তবে তাঁর ব্যথায় অবিকারের পক্ষে এ-বটিকা সেবন না-করে উপায় নেই, কিন্তু স্রষ্টা যিনি, তিনি কী উপায়ে মিথ্যা থেকে প্রাণ সঞ্চার করেন? সজ্জালোপের এতো উপায় থাকতেও চিকিৎসক আসন্নগ্রন্থকে জ্ঞাত থাকতে বলেন। শিল্পীকে নিষ্ঠুর হ’তেই হবে—না-হলে অপর নয়নে অশ্রু উপভোগ হবে কেন? শিল্পী সেই রক্তময় হোসেন মিয়া, যার আসল ইতিহাস কেউই সঠিক জানে না, যে যৌবন কাটিয়েছে বিদেশী বন্দরে-বন্দরে, দিক হারিয়ে যে রাজ্যে খুঁজেছে তারার নিশানা। বা শুধু বলনা ছিলো, অলস মনে একটি বিলিকের মতো বা এসেছিলো এবং সেইভাবেই যা বিলিয়ে যেতে পারতো তাকে স্বামী রূপ সে দেবে—এই ছিলো তার জীবনের ক্রম। সেই সংকল্পকে প্রতিষ্ঠা করবার জ্ঞান সে ঈশপে দিলো তার সব-কিছু। যাকিছু সে উপার্জন করেছিলেন—শুধু সঞ্চিত অর্থ নয়, তার সারা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাও—সে সমর্পণ করলো তার স্বপ্নকে। এবং তার উপনিবেশে আশ্রয় নিলো সেই সব মাহুয়, প্রকৃতি এবং সমাজ বান্দের পরিভাষণ করেছে। তারা হোসেন মিয়ার কল্পনাকে কষ্টকর কিন্তু মনুজ জীবন লাভ করলো। এই জীবনশিল্পীর দৃষ্টি স্বচ্ছ, ক্ষয় একাধর। তার ঐ অদ্ভুত উপভোগের চরিত্র সংগ্ৰহ করবার জ্ঞান সে যে-কোনো নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করতে রাজি ছিলো। তার বিষয়বস্তু—যার দ্বারা সে ইতিপূর্বে বাসনাকে বিশ্বদ্বকর সাফলা লাভ করেছিলো—তা সে নিরোগ করলো স্বপ্নের কাজে। এবং যখন তার রচনার পুরানো

পৃথিবীর নীতি প্রবেশ করে বিবাহ বাধ্যলো তখন এই নিষ্ঠুর শিল্পী বর্জন করলো সেই কোমল নীতি, তার উপভোগের পক্ষে দুর্বল চরিত্রটিকে হোসেন মিয়া উপাধি দিলে। হোসেন মিয়া নিষ্ঠুর মাহুয়, কিন্তু সফল শিল্পী। যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপভোগ শেষ হয়ে আসে, তখন কুবেরের নৌকো চলে হোসেন মিয়ার স্বীপের দিকে, উপভোগের পাজ-পাজী সংগ্রহ পর্ব শেষ হয়, কাহিনী এতকণে শেষে গুটে।

যে-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হোসেন মিয়ার স্রষ্টা তিনি কি জানতেন না তাঁর নিজের পরিণতির অর্থ? যে-জীবনানন্দ দাশ “তিমিরহননের গান” রচনা করেছিলেন, তিনি কি ঐ করিতার শেষ-কণ পংক্তির রমণীয় কাকি লক্ষ করেননি? তিনি কি জানতেন না যে ঐ কবিতাটিতে চাওয়া অকম্পিত পরিণত হয় পাওয়াতে?

আমরা কি তিমিরবিন্দু?
আমরা তো তিমিরবিন্দু
হ’তে চাই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দের মতো সত্যদর্শী কী করে ভুলে ছিলেন যে এদনি এক কাকি তাঁদের সমগ্র কাব্যেও লুকিয়ে আছে? আর যদি তাঁরা এ-কথা জানতেন, তবে কী বেদনাধারক না জানি তাঁদের জীবনের সাধাচ্ছকাল। ঐ ভয়াবহ মৃত্যু কি তাঁদের গোপন ইচ্ছার পরিণতি? বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে মৃত্যু বরণীয় মনে করেছিলেন তাঁরা? অথবা, তাঁরা শান্তি পেয়েছিলেন তাঁদের শিল্পকে নিঃস্রাব চরণে অর্থা দিয়ে—গোলাগল যেমন ঈশপে দিয়েছিলেন তাঁর উপভোগের পাতুলিপি, স্নেহের চিত্রকরণ যেমন সাতনারোলার প্রজলিত অগ্নিকুণ্ডে নিঃশেষের অমর ছবি নিঃস্পন্দ করেছিলেন?

অন্যথা প্রশ্ন, উত্তরহীন প্রশ্ন। কিন্তু যদিও এগুলি আমাদের এতো ব্যাকুল করে, কে জানে এ-সব প্রশ্ন আসলে তেমন জরুরি কিনা। গোড়ের চরম সৃষ্টি ফাউন্টের দ্বিতীয় খণ্ড নয়, তাঁর পরম সৃষ্টি তাঁর জীবন। ফাউন্ট সম্পর্কে সংশয় জাগলে, তাঁর কাব্যে তৃপ্তি না-পেলে, আমরা ধ্যান করতে পারি

গোটের অন্তর স্ফট সেই দ্বিতীয় পোটেকে। প্রশ্ন করতে পারি তাঁকে, তরুণ
ক'রে খুঁটিয়ে দেখতে পারি তাঁর জীবন, নিশ্চিত জানি যে কোথাও না-কোথাও
হিঁসি আমাদের সংশয়ভঞ্জনর সন্ম রেখে গেছেন। কিন্তু জীবনানন্দ এবং মানিক
বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের স্ফটর বাইরে কিছু লুকিয়ে রাখেন নি, “পুতুল-নাচের
ইতিকথা”র যা নেই তা লুখিনি পার্কের খাতাপাণ্ডে পাওয়া যাবে না,
জীবনানন্দের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়কে শত প্রশ্ন করলেও জানা যাবে না “আট
বছর আগের একদিন” রচনাকালে তাঁর আত্মার মধ্যে কী ঘটিছিলো। তাঁদের
এই বিনয় উপেক্ষা করলে আমরা অতিরিক্ত কিছু লাভ করবো না, শুধু হারাবো
প্রজ্ঞাবনত স্বর্গে যা পেয়েছিলাম। তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা এক স্বচ্ছ এবং শীতল
গভীর ব্রহ্ম যাতে অবগাহন করলে আমাদের নিজস্ব স্নায়ুতে আবার প্রাণের
স্রোত সঞ্চালিত হয়। জলের প্রাণের বর্ণ কী, তার শরীরের আসল আকৃতি
কী, এমন কোঁতুল যদি কারো থাকে, যদি সে আকাশের ছায়ায় সজ্জত না-হ'য়ে
দেখতে চায় জলের মুখের ছবি, তবে সে সেটনের ফলে উপরের ছবি হারাবে
কিন্তু তল পাবে না। তার চেয়ে শুধু সখিখয়ে চেয়ে থাকা ভালো। বসন্ত,
এমন নীল, এমন শীতল, এমন গভীর সরোবর এই দেশে কেন, সারা পৃথিবীতে
বিরল। এবং, যদি কোনো তরুণ হোসেন মিয়া তাঁর শিল্পকে এই প্রাণধারী
জলে সিক্ত করেন তবে তাঁর ফসল দেখেই কি জানা যাবে না এ-জলের বর্ণ
কী, শক্তি কী, কী তার অবয়ব ?

রোগশয্যায়

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

১
প্রাণে আসে মৃত্যু আর জীবনের ছাতি।
এ দরিত্র করে শুধু জতি
যেন দয়া পায়—
কেউ নেই যেহা মমতায়
দেয় স্কন্ধ নির্জনতা ভরে—
আজকের আলোময় ঘরে
শুধু কৈপে কৈপে বায় হাওয়া—
তার সঙ্গে মনে-মনে যৌবনের দিন ঘিরে পাওয়া
আছে যেন এ-রোগশয্যায়।
প্রৌঢ়তা লজ্জায়
মুণ ঢাকে তবু চোখে আজ
ভেসে আসে না-পাওয়া সে স্মৃতিমিত রমণীসমাজ।

২
দেখা দিলে চাঁদ
আমি বৃষ্টি এখনো উন্মাদ
তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারি আমি এখনো তেমন
এ-চাঁদের নীচে।
দুহাতে ঢেকেছ তুমি স্নান,
আমি আছি পিছে,
এ-ছবির উন্মাদনা পাই।
পেতে শুধু এক খণ্ড আকাশের সোনা-চাঁদ চাই।

কবিতা

আধিন ১৩৬৬

তধু ছবি দেখা!
বিছানার তয়ে একা-একা—
তধু মনে-মনে ভাবা ছবি।
কানে তনি সঙ্কার পুরবী,
মন মাত্র কামনার জলে,
জালায় হযতো চাঁদ তার মাথাজলে।

৩

শিশুর আনন্দ হ'তে কতো দিন হ'য়ে গেল হয়েছি বিকৃত।
তবু কেন কোনো শিশু ভীত
এ-দুয়ে উকি দিয়ে যায়।
তাকে আমি লুকু মমতায়
ভেবে যে-উল্লাস পাই এই প্রোচ দিনে—
জীবনের সে আনন্দ-গণে
রোগশয্যা মনে হয় ফুলের বাসর
জীবন-নৃত্যের সেবা বসেছে আসর।

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

তিনটি কবিতা

বাক্যিকর ত্রুতে

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

নিশ্চিত গহনে
ভূমি স্থির থাকে।
সখিল শিকড়ে
আগাছা পরগাছা
স্তরে স্তরে, তবু
ভূমি স্থির থাকে।
নিশ্চিত গহনে।

চুষনের আগে
চুষনের পরে
বে-শুজের জালা,
বে-শুজের জালা
জন্মের জীবনে
জন্মের মরণে;
স্বরবৃত্ত আর
ত্রিগদীর কাকে
বে-শুজের জালা,
সম্পূর্ণ কলসে
জলের দুর্পণে
বে-শুজ নিহালা,
সমস্ত ভোমার
দেশজ ভাণ্ডার,

কবিতা

আখিন ১৩৩৬

তুমি দয়া ক'রে
প্রকাশ্যে যেয়ো না।

বাইরে যেয়ো না
বুঝে নিতে শেখো
নিজের বন্ধলে
বুড়িঙ্গলকণা,
মুহূর্ত মুহূর্ত
বছর বছর
মুহূর্ত বছর
সমুদ্রের জলে
বুড়িঙ্গলকণা;
ফুরায় ঘটনা
বাকীকির ব্রত
শেষ তো হয় না
সমুদ্রের জল
বুড়িঙ্গলকণা ॥

মেঘের মাথুর

ছুটি মেঘ ছিলো সম্প্রতিচুপনে,
আর এই বিধাবিত্ত হ'য়ে গেলো :
জন্ম নিলেন ঈশ্বর নখর।

একবার তাঁকে রাখার সঙ্গে দেখলাম
বাঁশরি গুটে, বস্ত্র অসমভঙ্গে,
তারপর তাঁকে পাহাড় ভাঙতে দেখলাম :
কেউ নেই তাঁর অঙ্গে ।

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

সব মাছদের পাখের পাহাড় কাঁধের উপরে তোলা,
নীল আকাশের স্তম্ভ যমুনা সপ্ততরী খোলা
আর্জ আর্জ স্বর ।

এক মেঘ থেকে আরেক মেঘের সীকে
গাঁথতে গেলেন, কিন্তু নিখর শূণ্ণে
মিলিয়ে গেলেন নখর ঈশ্বর ॥

দৌহিত্রী

প্রাণীপ জালাবে ব'লে অন্ধকারে ব'লে আছে। এ কি
মৃত্যুর চেয়েও স্থির পরিকল্পনার একাগ্রতা
তোমার চিবুকে । তুমি স্মিত মাতামহের বহন
বিন্দু ক'রে পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মার ক্ষমতা
পরীক্ষা করছো । তুমি স্বচ্ছ ডেউ রয়েছো থমকি,
শিবলিঙ্গ-শিলাতলে, অন্ধকারের শাস্ত রস ।

গ্রেমিকের দল কাঁপে বারান্দায়, একটি গ্রেমিক
নির্বাচন ক'রে নিতে হবে, আর সে-গ্রেমিক পিতা
হ'তে পারে, কালের জঠরতলে তোমারও ছুঁহিতা
প্রচ্ছন্ন রয়েছে । আমি সব জানি, সবগুলি দিক
জানি আমি, তাই বলি, একদিকে এক অন্ধকারে
অপেক্ষাধিনিম চক্ষু জেলে রাখে, যেহেঁনা সংসারে ॥

কাব্যতা
আবিন ১৩৬৩

সমর্পণ অন্তুক্ত এখানে।

দীপক মজুমদার

অবশেষে বান্ধবীই মানতে হ'লো কী লজ্জা আমার
পাহাড় ভিজিয়ে হাওয়া সঞ্চারিত ধূল মূবক।
পরিষের উজ্জলতা চমৎকার। নৃপতির শখ
এবার বিদেশ যাবে।
স্বতি থেকে স্বপ্ন থেকে ছিঁড়ে ফেলি চিহ্নিত ডানার
অঙ্ককারে ন'ড়ে ওঠা; অন্থর চোখের আকাশ
আঙুলের স্বর্ণরাজ্যে মুখ, শিরা, ভ্রমরের বৃক্কের প্রবাস।

ধানেও বিরত নই কেমন প্রচণ্ড ভালোবাসা
নদীর পর্ভের ছড়ি চামড়ায় স্নোভের চোরা টানে
চমকে ওঠে, ছুটে যায় মৃত্যুর ও অধিক নির্জনে।
অর্থহীন আর্ডনার
আজ তার গাঢ়তার মারাত্মক স্বপ্নময় ভাব।
তোমার বোধের কাছে হেমন্তের পাতার সমান
আষাঢ়িত সারাংশার, হৃদয়, অলক্ষ্য এক কয়ের প্রমাণ।

অতএব বন্ধুতাই মানতে হ'লো কী দুঃ আমার
সমুদ্র লাক্ষিয়ে টান সূপ্রকাশ অলীক উজ্জল
ভারাদের আকর্ষণ রোমাঞ্চক অমোঘ প্রবল
এবার বিদেশ যাবে।
অগ্রমত্ত কাপুরুষ, হিমম্রব আকাজ্জর তার,

কবিতা
বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

রাজ্য থেকে প্রেম থেকে অপহৃত স্বর্ণবাহী স্নোভে।
ভাসমান ফুলগুলি কোনোদিন সম্বাদিত বীপে
হয়তো নিবিড় মুক্তি, রাত্রি হবে তোমার সর্বাঙ্গে
প্রভাতে তখন আমি ফুল, পাবি, বন্ধু এক তুষার পর্বতে।

কবিতা
আখিন ১৩৬৬

দুটি কবিতা

অসংকোচ

মাঝখানে পথ নেই, শুধু সম্ভবত কিছুক্ষণ
ঝর্নার নির্বল জল ধুয়ে যায় উপত্যকাত্যকে।
এ কোন বিকালবেলা, মায়াবী, এ কোন সম্মুখকাল,
ভূমিও পাথর থেকে ফটিকধারার মতো খুঁটৈ।

তুমি কে তুমি কে নীল অগ্নেশভরানো অহুপম
মুড়ির নিভাঙ্গ ডেউ মুছে কিবা লুকানো প্রান্তরে
ঝর্নার মতন ক্রুর; পূণ্য কতো নিঃস্বপ্নত জানে,
এ-তীর তরঙ্গশূন্য, কেন পার হবো বনাস্তরে।

আমার দুবশা খুঁজে ভিতরে বাহিরে এই পথ
মিলেছিলো শুধু আর ধূ ধূ উদ্বেলার সারস
নিভৃত কবিতা, মৃত, নিশ্চিত, উদ্বেগহীন স্নেহ...
মাঝখানে ছিলো পথ, প্রতিভার দুর্নিরীক্ষ্য ক্ষত।

নিমন্ত্রণ

কোথায় থেকে তোমার ডাক স্নানতে পেয়ে এলাম গতকাল।
আমায় কেন ডেকেছো তাই বললে হেসে-হেসে,
এমন সময় আবার এলো তেমন বৃষ্টি মাঠে;
ক্ষেতের পর ক্ষেত সুরাদৌ, থামার, জহান...
এবার তোমার পিছনপানে, আকাশ, আমি বৃষ্টি ফেলে বাবো।

কবিতা
বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১

তুমি যেমন তেমনটি আর কোথাও কিছু নেই,
তুমি যেমন অপার জোংগা সরিয়ে যেতে পারো,
চারিদিকের ক্ষেতখামার বর্দা ব'য়ে যায়...
তুমি যেমন তেমনই ঠিক, এই তো চলে যাই
আকাশ, তোমার আশির্বাদা পড়শি কুটুম রাখলো নিজে হাতে।
কখন আবার ডাকবে, পিড়ি পাতবে, আমি-বসবো উঠোন জুড়ে,
হয় যেমন তেমনটি আর কোথাও কিছু নেই।
নেবুফুলের নরম পাহাড় শুড়িয়ে ঢোকে ঘরে
জানলা ভেঙে বাগান, কোথায় দূরের আগন্তুক?

বোমি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তেজিশ নম্বর বাড়ি কাল রাজে আমাকে বলেছে
ওরে হঠকারী যুবা... শীতল, কঠিন, ঘন তার কর্ণধর
বুদ্ধ অশ্বখের বীধনিখালের মতো উড়ে গেলো অন্ধকারে
সুজিত নির্বাক আমি বহুক্ষণ একদৃষ্টে তাকে দেখলাম।

এতকাল আমি তাকে শুধু ইট-কাঠ ভেবে লক্ষিত করেছি ;
কত মধ্যরাত্রি আমি আলো দিয়ে দাঁহ করে, তীব্র, বিবসনা
বিস্তৃত রূপসী এক শুভ্রতাকে বৃকে নিয়ে, দুই হাতে, সমস্ত শরীরে
একেছি প্রণয়চিহ্ন—উন্মত্ত, উদ্ভাস, ধূই, লোভী।
কত নিদ্রাহীন চক্ষে আমার আত্মার মুখোমুখি
বসেছি নির্জন কক্ষে, হায় রে, অজড় এই তেজিশ নম্বর
খিতল শরীরে তার সাতধানি খণ্ডিত স্রমে
অবিরাম হাওয়া ভরে নিঃশব্দে হেসেছে, কিংবা তাম্র অন্ধকারে
ব্যাগ্ধ উর্গাঙ্গাল থেকে প্রাপিতামহের লুপ্ত গোপন কৈশোর খুঁজে এনে
সে হয়তো মিলিয়েছে শান্ত কৌতূহলে।

এতদিন পর, শুধু কালরাজে আমাকে বলেছে—
যে-রাজে আমার চোখ অজুত হরিৎবর্ণে সন্ধ্যা রশ্মিতে জ্বলে উঠে
পটিন বছর তারা এই ঘরে, হৃকি-খদা প্রাকৃতিক দেহাল-ছবিতে
নিষ্ঠুর শব্দের মূর্তি সাক্ষিয়েছে ; কে চায় স্বপ্নের ভাষা, নষ্ট মুখ ?
আমার চাঁৎকারে—

এতকাল পর শুধু কাল রাজে আমাকে বলেছে,
ওরে হঠকারী যুবা... প্রতিটি অক্ষর তার তীক্ষ্ণ মনোযোগে
জুনে আমি, বা-কিছু সজল পুঁটলি বেধে শেষবার
নশুখ ধারের ভূমি স্পর্শ করে, দৃশ্যমান আধারে মিলাই।

কবিতা
আধুনিক ১৩৬৬

অনন্ত

মৃণালকান্তি

আমি অন্ধকারের অপরূপ পায়ের ধ্বনি শুনেছি
দুপুরে শোনার ঝড়ে শুনেছি কার হৃদয় ডাক,
পউষের বরাপাতার গান শুনেছি
আর স্বরা ফুলের কান্না—
বেলাশেষের গান সজ্জার নদীর বৃকে
আর পায়ের নিচের নরম খাশের বৃকে আগের স্বর,
হঠাৎ কোনো বিরল মুহূর্তের আলোয়
আমি ফুলের গান শুনেছি—
বুটিকরা দিনে গাছের পাতাপাশে কিসের কণ্ঠের স্বরঝিপি,
তোমার প্রজ্বর মনের কচিং-কিরণে,
একটি ছুটি কথাই যে-গান শুনেছি—
এমন গান আর শুনিনি।

সংশোধন

‘কবিতা ঠেত, ১৩৬৬ সংখ্যার রসেন্দ্রকুমার আচার্য্যদেবীর লিখিত ‘যে-আখার আলোর অধিক’-এর সমালোচনার শেষ অনুচ্ছেদে ভ্রমরমে ‘তৈলেশবধ নাইট’ ছাপা হয়েছে; উল্লিখিত কাহিনী ‘Much Ado About Nothing’-এর নামক, বিরোধিতা। (‘No, sure, my lord, my mother cried; but then there was a star danced, and under that was I born.’)

কবিতাভান্ড, ২০২ রাসবিহারী এডিনউ, কলকাতা ২১ থেকে প্রকাশিত ও ১৪১
সুরেন্দ্রনাথ বানার্জি রোড, কলকাতা-১৩, মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং
হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।
সম্পাদক, প্রকাশক ও মন্তক: যশদেব বসু

কবিতা

বর্ষ ২৪ সংখ্যা ২
ক্রমিক সংখ্যা ১০০
পৌষ ১৩৬৬

KAVITA

Vol 24 No. 2
Serial No. 100
January 1960

Bengali
HARD TIMES

An adaptation from Rabindranath Tagore.

Music is silenced, the dark descending slowly
Has stripped unending skies of all companions.
Weariness grips your limbs and within the locked horizons
Dumbly ring the bells of hugely gathering fears.
Still, O bird, O sightless bird,
Not yet, not yet the time to furl your wings.

It's not melodious woodlands but the leaps and falls
Of an ocean's drowsy booming,
Not a grove bedecked with flowers but a tumult flecked with foam.
Where is the shore that stored your buds and leaves?
Where the nest and the branch's hold?
Still, O bird, my sightless bird,
Not yet, not yet the time to furl your wings.

Stretching in front of you the night's immensity
Hides the western hill where sleeps the distant sun;
Still with bated breath the world is counting time and swimming.
Across the shoreless dark a crescent moon
Has thinly just appeared upon the dim horizon.
—But O my bird, O sightless bird,
Not yet, not yet the time to furl your wings.

From upper skies the stars with pointing fingers
Intently watch your course and death's impatience

Lashes at you from the deeps in swirling waves ;
And sad entreaties line the farthest shore
With hands outstretched and crooning 'Come, O come !'
Still, O bird, O sightless bird,
Not yet, not yet the time to furl your wings.

All that is past: your fears and loves and hopes ;
All that is lost: your words and lamentation ;
No longer yours a home nor a bed composed of flowers.
For wings are all you have, and the sky's broadening courtyard,
And the dawn steeped in darkness, lacking all direction.
Dear bird, my sightless bird,
Not yet, not yet the time to furl your wings !

Buddhadeva Bose

Bengali
EIGHT POEMS

Jibanananda Das

WHEN I FOR MYSELF

When I for myself these lines did write
The moonlit dew dripped from the branches, and still in the mist
Lay the pale bank along the Dhansiri river.
The bat's dark wings across the cold moonlight
Drew a sharp line of desire. Came through the night
Manorama, guarding her flickering lamp. Swarmed with her
Forgotten bees and girls, the cool, creamy crab-apple came,
And blossomed the mango-spray in the winter night.
In the dim light I saw them all ; saw, and wrote these lines

Remembering their pale tresses, remembering
The loveliness of their shell-like hands, and to redeem their hearts.
How many centuries ago did they disappear,
Trailing their yellow saris, breasts like pathetic shells,
Creamily moulded flesh and pathetic hearts,
Into that room most cold and quietly filled
With solace. And yet they often do seem
To strike their sleep against my desolate dream.

Meenakshi Mukherjee

THIS FIELD NOW LITTERED

Some one, some time, had reaped this field now littered
With leaves, egg-shell, snake-skin—cold and desolate.
Across all these I tread, and there in that other field
Some I knew are sleeping—how deep and intimate.

One is there asleep—how often did I meet her,
How often wrong in my heart's malingerings !
And yet this peace ; the grasshopper and the grass
Now cover all her thoughts and dark questionings.

Jyotirmoy Datta and Buddhadeva Bose

ONE STAR ARRIVES

One star arrives. Thereafter, walking alone,
It seems she might come along the rows of fern
On this star-filled autumn night. In the dark
When did my door open
Under her confident hands !
She comes and shows how at evening
Her hand can make night of the entire
Sea, sun, swiftness, and put them to sleep.
Overhead the sky far away,
Prompted by stars and planets dim or bright,
Turns into an autumnal night. Beside such a golden night,
Has history ever remembered anything else ?

The last tram has faded, and the last noise. Now
The whole city is the ultimate night of life, of nature,
Of the universe.
Houses, roads, ruins, cemeteries gather around,
As if along an imperishable road, turned back from
The shores of many oceans, after much waste and weariness,
To return and re-enter the ancient heart,
The newly intimate body of woman.

Sujit Mukherjee

GRASS

The world this morning is filled with soft green grass, gentle like
green lemon-leaves,
Like an unripe orange it is—this green grass—as fragrant—with
the deer ripping it off with teeth.
How I wish I too could drink the fragrance of this grass, like
some greenish wine, beaker after beaker,
Could squeeze the flesh of this grass, rub my eyes against its eyes
and my feathers against its plumage,
Could descend from the savoury darkness of some warm grass-
mother's flesh and be born as grass within the grass.

Buddhadeva Bose

WILD DUCKS

Gray wings of owls beat, starward bound.
Forsaking the marsh, by the moon beckoned,
Wild ducks spread their wings. I hear them hissing through the
night.
One. Two. Three. Oh ! Countless. Infinite.

Down the edge of the night they whirl their tumultuous wings,
Hissing like an express. They are flying on, are flying, are flying ;
Flown away now. Above, the starful heaven gleams.
Floats their wild smell. One or two ducks of dream.

Haunts me the dim face of that vanished village-belle, Arunima
Sanyal.
O fly, fly my phantom ducks ! Under this winter moon let them
silently all

Gather and fly. And when these earthly colours, these sounds
are no more,
O fly, let them fly, under a silent moon, in my heart's secret core.

THE PRIMEVAL GODS

The elements. Wind, water and fire. In their snaky whim
These primeval gods did give you shape.
What a fearfully lonely form they gave you,
And bug-like lechery in men whom you must know.

Wind, water, fire. These primeval gods in their crooked mood
Gave me this urge to write with words:
As if I too were wind and water and fire,
And you too my creation.

Not blood nor flesh nor lust
Is the beauty of your face,
But an island of deodars at midnight;
A far-away island blue and bare of men.

Yet fondled by flabby hands,
You are disappearing into the dusty earth;
And I am getting lost in the dimness
Made by stars in a far-away island.

Wind, water, fire: these ironical gods broadcast
Seeds of beauty all over the earth,
And seeds of dreams.

Now I wonder: where are you tonight?
Why does beauty—that beauty of earthly women—
Never know the island of star-shadowed deodar?

Being fondled by flabby hands, being handled—handled—
handled—

Fondled—handled—

O, water, wind and fire! the crude gods burst into laughter:
'Being handled—fondled—handled—does it turn into the flesh
of swine?'

I too start laughing like mad.
And laughter all around
Puffs the darkness up like the waves of a sea
Bloated with the carcass of a huge and putrid whale.
All your loveliness, my earth, stinks like a whale's carcass;
And wherever, tossed on those meteor-waves, I go,
It's strange but I seem at home, so much at home!

THE KINGDOM OF THE EARTH

Far and near, topple cities, topple homes,
And villages fall with a crash.
Long ages man has spent on earth,
Yet his shadows on the wall
Death, destruction, fear
Or merely hesitation seems.

All along the coast of time
Nothing but emptiness.
Yet ringing this our bare desert
Of shame and error, thoughts and dreams,
Strange trees rustle, cool the land.
The heart points the way. And wisdom too. And love.

JOURNAL: 1346 BY THE BENGAL CALENDAR

I have you beside me here
This afternoon, after so many days are past.
Still on the field plays the parting sunlight ; it fades ;
Now an ineffable sleep is pouring into the tiger-beetle's heart,
And a wet clod on the river-bank
Silently dissolves into the breast of the restive waves.

Sleep and the green of the grass calms the dove and the sparrow,
And the field's furrowed lines are gently released
Within the folds of darkness.
Sheds its fruit, the casuarina. An understanding breeze
Blows off the hurtful sun from the banyan's bark ;—
Soon, too soon, the western cloud will claim it.

Whose is that cart with the tidings of hay ?
Facing the river it stands under the *jarul's* shade
On a road strewn with crushed red banyan fruit.
Look, its image in the river—how it cools itself
In the still water—like another cloud beside the silent clouds.

Wrapped in these quiet silences
I find you after so many days are gone.
Leaving this field's close embrace we drift towards that plain
opening up.
From your ruffled hair down to the toe-nails
All grows alive to this spread-out scene, urged on by the afternoon-
wind.

And when the *korali* shieks from the *mahanim* tree
You suddenly find lying close to your heart all you once had lost.
'When I heard not your 'footfalls,' she said,
'It seemed the labours of the universe
Were in debt to the specks of dust ; . . . not so ?
Bother. Let time decide . . .

Those days of warm desire ; those days when even the grass and
sun and dew
Churned up cravings within our flesh.
Those days !
Yearning, like an orphan's face,
Makes one weary and sad and yet yields something rare.'

And raising her clear eyes towards the dark: 'After how long
a waiting
At last the sky drips peace ; no longer boredom haunts the airy
space.'

Gentle this lady's heart, like a stillness strange,
And dark as a stream that has its source in night.

I walk beside her, silent both.
Closed to love and fever, her heart is filled
With another deep discourse. Far have we roved into the plain.
On her maroon sari specks of grassflowers ; leaves of *nim* and
amlaki

Come dancing on the light wind
To land on her hair, packing her face and eyes with her body's
wholeness—

As if this girl of social skill were nature's second self.

She fished my hand from out of the dark,
Laid it on her cheek and said: 'How thin you have grown,
Trampled and lost in the crowd.' Gently she let go
My sorrowful hand. In that Time's emblem, her marvellous body,
Flows no river now. Exhausted love and pain in her heart.
The stars have pilfered her, never to return again.

Jyotirmoy Datta

TWO POEMS

Sudhindranath Datta

THE VAGRANT

The tree, a shock of red and yellow, shakes its crown ;
The parrot hovers, kept from nest ;
The year is overblown ; the hangdog sun goes down ;
And bones, though old, are yet impressed.
The wind alone is loud with distant lamentations—
An infidel intoning runic evocations,
While Time, at wanton play amidst extinct oblations,
Reiterates his ageless jest ;
And rid of dust from homing kine, the sky transcends the
common noun—

The tree's ambition and the parrot's forfeit nest.

Then all at once, uprushing from the chthonic deep,
The Dark Begetter overwhelms,
The wind grows deathly still, and latitudes of sleep
Disintegrate the charted realms.
Oh, no, the night is not inert: its chronic fever
Breaks out in spangled sweat, as straining at some lever,
It alters far to near ; and subtle like the beaver,
The moment makes of fretted elms
An ark for perfect self-assurance. But, involved in whirlwinds'
sweep,
The parrot strays till Void, triumphant, overwhelms.

1945

I

Predicting victory, you said that, diabolic though
The Nazis were, they too must vanish once their day was done ;
And, true enough, defeated Germany is in the throes
Of total death, while West, it seems, awaits the morning sun.
At least the Russian legions, like a retributive flood,
Engulf exploited lands to aggravate their brittleness ;
And Paris, freed, when not redeeming shame with traitors' blood,
Parades before the tattered world dress after perfect dress.
Become at last an equal partner both in war and peace,
America is lavish now with money as with men ;
And even England, which monopolized the Golden Fleece,
Prepares to found the welfare state and start from scratch again.

II

Of course, the Chinese leaders, selfish as they mostly are,
Persist in letting democratic forces always down ;
And keeping faith with India would have been simpler far,
Had not the creed of Gandhii made the camp of Jinnah frown.
Besides, as Belgium begins to find, resisters all,
The rulers of today are prey to their opponents' ghosts ;
And counter-revolutionaries rally to the call
For Italy's deliverance by anti-Fascist hosts.
But Churchill's fulminations have induced the timely purge
Of Trotsky's heirs in Greece who deviated to the Left ;
And just as Argentina learns that progress is no scourge,
So Turkey draws her sword to prove that she is also deft.

III

Must prophets then equivocate because the moral law
Reflects antinomies inherent in the universe ;
And if, indeed, the good were altogether free from flaw,
How could the bad avoid becoming infinitely worse ?

It is from death, perhaps, that life derives significance ;
And vice is virtue's mirror-image, wrong inverted right.
No myth is born until the brave succumb to cravens' plans ;
And liberty requires the dungeon for its finest flight.
Secreted by the past, invisibly the future grows,
And justice can be rendered only when injustice asks.
To save the world for friends we have to liquidate our foes ;
And man's salvation lies in sweating at appointed tasks.

IV

And yet is earthly life, though brief, so very incomplete
That death alone can make our inspiration plenary ?
And if that be the case, was your existence meant to cheat
When, disciplined, it turned increasingly exemplary ?
And, now beyond the broken arc, have you no further need
For charity, non-violence and conscientious doubt ?
Is boycotting oppression vain ? Does intellect mislead
In positing the good as absolute ? And, left without
Delusions of humanity, have you withdrawn your writ
Forbidding saints from using fraud against the fraudulent ?
And since the Rhine has quenched the blaze that Barcelona lit,
Should not the ban on strikes in Spain cause any discontent ?

V

Then let the calculating Czechs exult while bombs descend
In overwhelming bursts upon defenceless Budapest.
A causal series, air raids reproduce themselves on end ;
And Dresden follows Warsaw, one the other's palimpsest.
The London caucus may conspire against the Lublin rump ;
Who wants may claim at San Francisco Poland as his own,
Dishonest promises may buy exemption from the slump ;
The fields we reap shall give us back whatever we have sown.

As Arjuna the ambidexter found, we are but tools
Denied the luxury of pity for the consequence ;
And, blind like flies entangled in the spider's net, we fools
Expect that individuals can hamper Providence.

VI

For all that, when you spoke of victory, you did not want
The present state of things which cancels profit out by loss,
Reducing them to utter nullity ; and what we flaunt
As peace is but exhaustion of the will, our special cross.
Was it for this that we endured two global wars, rejoiced
In countless insurrections, piled up millions of dead
To rot in shallow graves ? And has the time now come to hoist
Triumphal flags along the cheering streets dictators tread ?
The heavens are extinct ; and darkness has regained its sway.
You too are lost for ever in the emptiness of space.
Who then will answer if the desolation of today
Is cumulative punishment for Adam's fall from grace ?

Sudhindranath Datta

Bengali

THREE POEMS

Amiya Chakravarty

THE SOJOURNER

Continuous time of morning. Along the blued steel of the tracks:
Black fire gleams. The two-twentyfive in sight. The questioning-
eye

Of the signal is still—suddenly sees green—the express rushes-
headlong

Towards farther time; the wriggling hurry of the crowd

Stops at the trembling edge; in a nearby stretch of water
A stork meditates on one leg, thinking fish; wandering words-
Travel along telegraph-wires overhead, on which sits a bird
Swaying a fancy tail; across the field a red tractor waits.

At present I am by the Mississippi, somewhere in America.
The watch on my wrist ticks memories' scraps.
I seek some timeless flashes to capture in Bengali
For ever this stork, this train, this morning's face.

A CONFLAGRATION

Writing verse on smooth paper with a new Parker pen
Is just American: some sunlight outside the window,
Shaded blue curtains, books on a nearby shelf
(Huxley's latest prose, a sea-story by Hemingway
To be read at leisure), a friend has left behind
Some 'cello records; a tune of trembling peace haunts the mind.,
All distant thoughts have drowned in the lake while coming
home,
There is just a chance that the Korean war might end.

Row after row of mere words flowing from the pen!
I close my note-book. Flashes again the sunlight,
Blue emptiness of curtains, the muted print of books
(Shining prose, a deceptive commentary;
The stormy yarn of an old man fighting a whale)
Faintly sounds again the invisible, Spanish strings,
Then the fullness of words, drowned in poetry,
And the lake's glimmer. But Korea is on fire,
And the radio transmits the waves of conflagration.

Sujit Mukherjee

CARMELITA

Often, in your mind, you have crossed the bridge
To this fabulous stone-cemented land,
And arrived, intimate, in stark secrecy,
With miles of weeping waves stretching behind.
And now, at the zero hour, is it you,
Really you in the heart's metropolis?—
Unbelieving, you tread the pavement, sit in a restaurant,
Meditating over a cup of tea,
Scanning the crowd in a vision none can guess.

And yet this is no coming, you are not here:
Carmelita, why still seek the fruit of another birth?

Here they love and laugh in foreign tongues,
Have other prayerful words for giving and taking worship.

In the groceries, on Saturdays,
Are heaped the fruits and flowers of another soil.
Bells booming in the cathedral square
Summon the crowds of our stranger-ffriends
Under great wooden arches framed in brass.
They come, all numerous, shoppers, shop-keepers, tourists,
And kneel in tears before the figure of Christ,
Lost for a while in a celestial glimmer

Made more deep by rows of gleaming candles.
Carmelita, what radiance meets:
Light from east and west in the same, universal sky.

Carmelita, let us return to the land you call your own.
For in this city you come
Like one who walks in sleep
With vague, uncertain movements of a dream,
Tripping across the miles of weeping waves ;—
The bliss you seek is hidden, deep-dwelling,
Only where eyes have faith and you suffice yourself.
This is no coming ; for should you, in the midst
Of the crowds that pace your heart's metropolis
Suddenly chance to glimpse the face
Or hear the voice you once had known—
All that desperate ecstasy
Will yield too soon to the strength of separation.
Far apart they lie, that other birth and this,
There's only a little bridge to come across ;
But look, Carmelita, what wide seas of loving
Flow between the two in endless waves.

Buddhadeva Bose

Bengali
UNLESS TIME FLOWS

Premendra Mitra

A drop of dirty life
on the wall
—the insect pest
with a lust stronger than mere sex
dreams of a fiery mating with
the luring lamp.

The reptile, a cold ugly streak of hate,
waits with its coiled sarcastic tongue.
—Annihilation in ambush.

The heart atremble waits.
Will the breathless counting of moments
end in defeat ?

The insect and the lizard
fighting eternally.
Whom will you champion ?
How far will you argue
with defence and prosecution
both in doubt ?

Sweat if you please
to fit everything
into the chequer pattern
of black and white, and light and shade,
—dyes of your self-delusion.

Plumb the dark depths.
And scale the frozen heights.
—All in vain.

The fancy equation of Aye and Nay
can only be solved by guile.

Who knows !
the lizard and the flea are not foes perhaps
unless time flows.

Don't shake the screen
to peep behind so often.
—Rather watch the show go on.

Premendra Mitra

Bengali
THE EGOCENTRIC

Humayun Kabir

I live alone in my own world of dreams,
alone I spend the long days and nights through months and years.
It is my sun that shines in the sky,
it is my clouds which gather on its blue depths,
damp green darkness slowly deepens in my world,
when shy evening dons the bride's red flaming robes.

Numberless are the rivers and the countries in my world.
I wander there on many roads through many forests and
mountains.

Sometimes like frozen foam on the crest of the waves
snowpeaks rise up into the infinite sky,
sometimes the earth's affection flowers in golden harvest,
sometimes the fountains rush in gladness from whence to where.

Once I thought I would build my cottage under a shady tree,
life would flow gently in hope and fear and joy and sorrow,
south winds would come and play around my home,
flowers blossom in my garden throughout the spring,
the shy *shephali* flowers droop to earth on autumn nights,
and new dreams of love dawn upon my expectant eyes.

And yet with all this I stay in the prison of my self.
My heart is tired of my own company.
All around me I hear many words and songs,
I sense the smile of joy and the murmur of love,
I feel the swell of suffering in many sorrowing hearts,
I yearn for a path to join the concourse of my fellow-men.

On the lonely shores of my forsaken heart
the waves from the outer world come and beat in vain.
Why are the foam-flecked waters so wild and restless ?
I cannot fully understand what they want to say.
What message is it they bring from across the seas ?
How shall I transcend my own experience and comprehend ?

I look at my fellow-men with wondering eyes.
They are so near and yet so full of mystery.
The secret sorrows which stir in their heart,
I never can endure in my own life.
I can never see the dawn and the twilight which are theirs.
We each follow the path as it stretches before us.

I live alone in my own magic world.
The salt seas swell and roar around me through long years.
Day and night from my small island I watch
And see the evening lamps lit across the waters.
I yearn to sing to you the songs I have made for you,
I yearn to say, 'I love you, O my friends and comrades !'

Humayun Kabir

Bengali

FOUR POEMS

Buddhadeva Bose

TO MEMORY

I

Who but you the goddess ? All that is, is yours.
Hidden in your slumber, unfelt and full of hindrance,
Is what we call beginning, cause or source:
Yet should you flick an eyelid, flowers will race like children's

Feet, and blushing vineyards spread like miles of kissing,
That Earth grow ripe in sweetness. Discordant is the lute,
The canvas blank, the marble dull and mute,
Until the wind of your breath impels the breathless crossing

Beyond the waves' uproar, to the calm and timeless ocean,
Perhaps to former lives' primordial gloom,
Where shine, like constellations within a mother's womb,

The fate of Man and your jewels without a flaw.
O ! the dark that is you, is illumination,
And what your hands let fall, not worth a straw.

II

'Flower', 'tree', 'pond', 'a cloudy day': they remain aloof and
cold
Like algebraic signs: and then you raise the curtain ; we see,
you lend the sight:
The vine entwines our bodies ; horizons gleam with gold
In a sudden burst of blossom. And thus we possess the earth,
the stars and the starry night.

War tears across ; the dweller at home is tossed without a shelter ;
Vanished his frozen fortune—mementos, letters, engravings.
But still he has you, the unlosable ! your flag, above the welter,
Shines, an immortal star, the heart of all our savings.

'Forward !' we cry, and march. Ant-like, a toiling crew
Drags through long ages, at green life's expense,
A huge carcass of deeds, dates, documents,

That makes generations drop and fade away.
But the poet who must return has all he needs in you,
For you grow eternally younger, and you can show the way.

III

What can our changes bring
To the flesh, but the worms' old feast ?
The brilliant rise of the Beast
Exhausts all swollen spring

In thrusts of parricide.
Horrid old men conspire
In honeyed youth's attire ;
Progress takes for bride

Progressive diminution.
All that we can reap
Is what your bring to fruition

Within those caves of your sleep
Where the flickering world's withdrawn
Into the first, forevering dawn.

SWEETHEARTS

You'll hear no more the laughter, the spouting girls at play.

Those lightsome birds, the Lottes who did not linger !
Dears, whose rose-bud lips you had but felt with a finger
In that moonlit dawn, ere you crashed the gates of Day—

They too became their children's conscious prey,
Picked up what came handy, pulled the window-blinds,
And woke from sleep to hear outrageous winds.

Blowing where gutters breed the daily pay.
Alas, the hour of love ! When is it to be—
If that sweet dupe, the much-too-promising May

Itself should tear the uprising felicity ?
—Go, then, girl, be Nature's food. And when the changing
weather
Has drawn your able sons apart—O lover, virgin-mother,

Return the darkened world its golden ray !

STILL LIFE

What are you, O apple, golden fruit ? Red lips that part in
kissing,
Showing anointed teeth, striking the air with lustre ?
Or cool, firm Konarak's heaven, darkened with the rapture
Of an apsara's breast that yields to the hand where sight is
missing ?

So much, yet just begun! This autumn seems unending.
Enough! But there is more. Even the skin is grown
Rich in quiet delight. And when the whole is gone,
The lingering glow recounts the glad befriending.

And is that all? So think the sleepy-natured.
But sometimes, with heavy eyes, the lust-encumbered few
Tear across the veils of basket, bowl and orchard,

And, in a strange spell of light, themselves become in you
Shuddering stars and a sky where asphodels
Suddenly make us wish we too were something else.

To A Dog

Cast not your spell. Separation masters me.
My wreaths do only sunder Far and Near.
The long-awaited kiss of Now and Yet-to-be
Expires at last on a cold, remorseless mirror.

Rather choose one of those who never pressed
On paper-boats across an ocean's deep :
There, rice-and-meat, a home ; and at noontime, sleep,
Swamped with darkening smells, by women's hands caressed.

No? ... Do you then fancy I will make
Fantastic flute-like music for your sake,
And paint your gazelle-eyes with memory?

... Only half is true. I know a nymph you are,
Cast away from heaven. But not for me to tear
Your charmed, accustomed veil. Not yet enough a poet, I.

Buddhadeva Bose

Bengali
FOUR POEMS

Bishnu Dey

ASPIRATION

Wipe out the sky tonight,
Smear darkness on the stars,
Blot out the moon in the slough of sleeplessness.
Cover your eyes and come
Through the web of the wind,
Drown the noise
Of the strides of the night-veiled sea
To take my breath away
At each your soundless footfall.
In the quiet-quelled night
Let us meet mouth to mouth
Upon the summit of sleeplessness.
Shatter your world, scatter it in the sky,
And come to me in the dark.

Sujit Mukherjee

FEAR NO MORE THE DARKNESS

Fear no more the darkness,
Cover your face with my hands,
Pass on your grief and joy to my eyes,
Build your triumph within our arms,
Weave your melody on my rhythm.

Today the light hurts, it burns with hate,
None cares to have this polluted light,
Now only the darkness is clean,

Love's orchestra is now dumb in hatred.
Cover your face with my hands.

BEYOND THE ASCENT OF THE STARVING HILL

Beyond the ascent of the starving hill
We reach now this valley
At the end of the precipitous battle of the roads
Does this cool shade construct homes ?

Here in trees life is sap.
Here in hutments songs are simple,
Here man's honour is easy,
Have we come to our life's valley ?

We have crossed all our beggar days
Crossed with the wind of the azure sea,
We have ended the famine nights.
The cloudy nights, the sun
With which we have won the autumn dawn
There is no desert fear in that light,
There is no flooding erosion in that October,
We are at ease in this valley.

The hill stands an architect holding the sky
With hints of love of the cloud and the sun
Of the farflung air of springy freedom
On this valley by the bank of streaming songs
The light of laughter falls in rays on the land—
Oh this our country is a poem indeed
Beyond the steep and starving hill
Where the beggar days are at an end
In this valley of peace, green peace.

SONNET No. 1 (from *Fourteen Sonnets*)

No more speech off stage in this poetic play,
The herald comes back sad from his frontline tour.
On Kailas ends the wanderlust of May.
Desires crystallise and I come home once more,
Calm from the adolescent-lone tirade.
Elective mind tires of the luxuries of Truth,
The nomad finds in his *laissez-faire* trade
His ego's limits, my skylarking youth !

Great Mother ! prodigal I now reclaim
My corner in your many-mansioned house.
Strange generations crowd there, yet in the same
Eternal feature shining in your face
I recover my past, recast my future days—

The firebrand bursts into a hymn of praise.

Bishnu Dey

Gujarati
THE POEM

Umashankar Joshi

There was no time to talk to flowers:
Flowers, the proud heavenward longing of the earth,
Isles of light, colonies of human dream.
Flowers, the ever fresh words of my poem.

The still-unopened eyes of a child in the womb
shine in the mother's face.
Did you ever see a poem
shine so in my being?

Poetry, the mother-tongue of the soul,
silence embodied, the abiding image of a dream.
—Where is the poem?

Sometimes the words lap up the trickling flow of the poem.
Sometimes there's the annoying stink of smothered hearts,
Indeed the poem is something which is hardly achieved.

That plant opposite my house has grown into a tree.
Oftentimes I have stood staring at it.

Jambu fruits came to it; to me, tears.
It has grown and borne fruit, I have just grown in years.

A little child romping in the street stopped suddenly and facing
me,
burst into rippling laughter,
unfurling the ensign of man's aspiration through untold ages.

There was no time to be thrilled by the laughter of frolicing
children.

The laughter of children, the measured rhythm of my poem.

The word is there, and the rhythm too.—Where is the poem?

Great men shout with hands raised high from mountain-tops.
The clear voice travels from century to century.
Hardly does it get down into the heart.
Rarely does it get distilled into a thing of the mind.
The voices of the past, overflowing the valleys, resound.
Echoes reverberate incessantly.
An abode of echoes, this,
where not the word but the echo is worshipped.
Ears deafened by echoes cannot hear
what others say, if ever.

Sometimes the ego smarts.—Why at all should I sing
that person's gloating over happiness,
this man's love and the mad joy of another?
For me only singing? For me to gather
the crumbs from life's rich table?
What fulfilment this!
The poet's life, a life by proxy?

Is life only what the ego encompasses?
Life is all that which is assimilated and becomes part of one's
self.

Those trees scattered on the field, green with foliage,
—viewed from a certain spot during a casual walk,
they fell into a pattern.
They were not mere trees then.
Something peeped out from the treeness,
something leaped forth from the eye.
Beauty's very self.

For a split-second I was that tree-pattern myself.
Couldn't I feel the same with all the things in this wide world?
Indeed, I can, through Beauty,
through the unfaltering voice of the poem.

At the turn of the road, car-lights
illuminated a cluster of girls,
returning late from a festival on a monsoon evening.
An old man passing by gazed with wide-eyed wonder
and feasted his eyes on the mysterious hope spread out before
him.

There was no time to hail the ecstatic hope of innocent girls.
The hope of girls, the blood coursing in the veins of my poem.
—Where is the poem?

Umashankar Joshi

Hindi

NOW IS NOT THE TIME

Jaishankar Prasad

How can I whisper words that shine to my beloved on tender
moonlit nights?
How can I tell you of the girls who laughed so lightly?
Where is the dream of happiness I beheld before awaking?
It vanished as my arms closed around it.

A fervent and lovely shadow lay on her flushed cheeks
And the adoring dawn took from her its own morning sweetness.
Her memory sustains the weary traveller on his way.

Would you rip open the quilt of my life to see how it has been
stitched together?

How can I tell of the great things that have happened within its
small compass?

Is it not right that I should be silent in front of others?

What good will it do you to hear my story?

Now is not the time. The mute pain in my heart is at rest.

Lila Ray

Hindi

I TOO AM AN ENIGMA

Mahadevi Varma

Beloved ! I too am an enigma.
Of all the sweetness, of all the smiles,
Of all the enchantment of your eyes,
Of all the poison in the pulsing of the world
 I have partaken, an addict,
 Ever thirsty for sorrow.
And I also disport myself in the river of joy !

From every part of me simultaneously flows
Fire that burns and streams that cool.
Attraction and aversion, seeking each other,
Maintain the flow of my breath.

 Beloved ! My upbringing
 Has been circumscribed,
Yet I play with the unconfined !

Lila Ray

Hindi

YASHODHARA

Maithilisharan Gupta

 O heart, the time of your testing is come !
I entreat you not
 to let my resolution fail.
As long as He was not here
It was easy to deny myself.
Where there is no hope there is no temptation.
 Hear ; drums are beating His welcome !
 O heart, the time of your testing is come !

Great is the Treasure now two feet away,
The Treasure on whom life depends. But how
Can I find the way to Him ?
 I am, and darkness is.
 O heart, the time of your testing is come !

What can two steps more be to one
Who has travelled so very far ?
Can it be as hard for Him as it is for me ?
 He turned His back on me.
 O heart, the time of your testing is come !

Those who are with Him know their good fortune.
The sight of Him and His touch gives them salvation.
For my salvation He must come to me. As His servant
 I shall stay here.

Lila Ray

Malayalam
THE LOVER

G. Sankara Kurup

As the moments pass me by, like petals falling from a flower
I sit and gaze into the future ;
Joy and sorrow dance around me, the one flinging her light, the
other casting deep shadows ;
Time, as he goes, laughs lovingly at me, saying, "This is all a
fancy."
But who is he who steals unseen and shades my eyes with tender
hands, whispering sweetly in my ear: "Who am I, say,
who am I?"
New fancies weave themselves in colour shot through my
gleaming tears.
I try to catch them and put them on Time's canvas, or as buds
of joy and sorrow, to weave them into a garland.
But who is he who steals unseen and holds my shivering hand
in sport ?

I am free from shyness, I am free from fear ;

Yet, O my Lord, let her thou lovest, she who leans against thy
beloved breast and drains the coveted cup of peace—

I pray thee let her rest and sleep awhile.

To forget all, to revive all.

V. Raman Unni Menon

English,
THREE POEMS

Dorothy Norman

SONG OF THE NIGHT—ADOLESCENCE

There can be no end to this our love
no further goal
no other continuity

This is summation
this is that all-consuming height
toward which all lesser moments had ascended

This is that all-endless addition
for which all smaller forms had been but preparation

Fearlessly to speak out truth in every phase
all unadorned in single purpose
to reaffirm this final ecstasy
in ageless depth on depth

Oh my heart:
The dawn already tears us apart
even as the fear of uttering sufficiently
the total wonder of our love
(fear born in the deceptive shadow
of our dwarfing self-protection)
even as the knowledge
that your beauty can then be seen by all in day
(for who that beholds you will not love you)

even as the resultant creations of our love:
or any new moment of wonder—competing—or old
or the stab of laughter
or the love of all

Where is that space
that time
in which to avoid all otherness
(That cruelly recurring question:
Are you then surely he?)
To elude those certain thresholds of our foreordained departures
into the swallowing crypts of day upon day
when there may be no return

FOR WHOM WAS THE POEM FASHIONED?—ADOLESCENCE

For whom was the poem so passionately made
the dedication so exclusively reserved
the totality of love so sacredly promised

There are the unbroken phases and streams of love
each vowedly discrete
the edges crashing touching merging
worlds within worlds upon worlds
so that the growth
so that the citadels
abandoned yet intact
blur the lines of demarcation
into one great and interchangeable song
to be presented in innocence accurately to any new love
as though it were all others
the content strictly unalterable
and as shamelessly virgin

TRANSIENT ORDER

Damp sea sand
bringing rocks to rest
in folds
when tide is low
like an arranged bouquet
of scattered wild-flowers
in a vase
ordering a countryside
bringing quiet form and style
to turbulence

English

WINGS SPREADING FOR FLIGHT

Weston McDaniel

Weep not for birds tossed from the nest,
The nest too small for bones swelling with growth,
For wings spreading for flight...
Weep not for birds tossed from the nest
When one false twist of wind
Bears prey to hawk, to fox,
When one false turn of wing
Tempt's rodent, snake...

Weep not for birds tossed from the nest,
For only the outcasts are free.

English

AT THE READING OF A POET'S WILL

Galway Kinnell

Item. A desk
Smelling of ink and turpentine
To anyone whose task
Is to sweat rain for a line.

Item. A sheaf
Of poems, a few lucid,
One or two brief,
To anyone who will bid.

* * *
Item. Praise Jesus, who spent
His last cent
In the wild woods of himself in the try
For self-mastery.

His boast
Is that though he did insist
On principle, in terror and compromise
He taught us what love's 'limit' is.

Item. I built a desk,
I spent myself for a sheaf,
All else I committed I ask
That the Lord forgive.
I took Christ for my pattern,
Once he was kind to a slattern,
If I was led into mazes
Blame and praise Jesus. *Amen.*

TWO POEMS

D. J. Enright

CALCUTTA'S SUN

Like trying to sleep
With lights on all round you.
Infiltration through fingers,
Crooked elbow betrays you,
Sheets diffuse the whole failure,
Pillow will smother you.

Bright star, all too steadfast,
That lights worlds of wretchedness
In black holes and corners.
Trunk without limbs, bones without flesh,
Flesh without skin, limbs without trunk.

Like trying to sleep
With lights on all round you,
The switches all hidden.
Reach out, read a book, then—
Keats, Tennyson, Heber—
That the hours may not maul you,
That no one may call you
Politician : materialist : sentimentalist :
realist :
Pain holier-than-all-you.

With lights on all round you,
There's nothing like reading
To send you to sleep :

Assured that the soul is
The place the real pain is
And we (even the plumpest)
Must all bear our soul.

CHIENGMAI

At my age, not allowable at all
To feel that—God, say?—smiles on this land:
In the indigo clouds of renescent nightfall,
Saffron brush-strokes that bind and define them.

—A grandeur this race never could create:
Fumbling with slats of timber, dusty teak-leaves,
Scraps of borrowed myths.
Later with corrugated iron, cracking concrete,
Scraps of borrowed politics.

—Who left the greater works to—God?—
And suffered or enjoyed them decently.

In my age, easily allowed
That—God?—still smiles on this land.
In the indigo mushroom of evening cloud
The lightning circles, while the children smile.

French

A REQUIEM FOR ASHES

Paul Gilson

The dust being that of a wall
was in no doubt at all
that it had heard too much
of the time when walls as such
had ears and lost steps haunted every corridor

Still hot from the evening before
the ashes of memory
retained within the embers glow enough
to light up between door and door
phantoms—whether they be
the ruff
of supping people
who met with shipwreck under the table
the dandy's eyeglass
the profligate's little shell or alas
the three curls of the dead woman

The cure-all powder of a quack
did not talk for nothing
but none could hear the shaman
Man too being dust
has just returned to dust

The state of his encampment shows alack
such deprivation
that it would melt stones

but no stones are left either
in the graveyard quarry of nations

Abel and Cain
the whole world has
disappeared altogether

Rajeshwari Datta and Sudhindranath Datta

French

TWO POEMS

Pierre Reverdy

LATE IN THE NIGHT

The colour decomposed by night
The table where they sit a shade too tight
The chimney-glass
The lamp a heart that voids itself Alas
It is another year
An added wrinkle
Had you ever thought of that
The window projects a square of blue somewhat flat
At any rate
The door is much more intimate
A separation
Remorse and crime
Good-bye I fall or climb
Into the angle of soft arms which receive me
From the corner of my eye
I spy
All those who drink
I dare not move to the brink
They are sitting
The table is round
And so too my memory
I remember everyone
Even those who have gone

WHITE AND BLACK

How to live elsewhere except near
the big white tree of this lamp
The old man has cast away

one by one his ivory teeth
What good to keep gnawing
these children who never die
The old man
The teeth
For all that it was not the same dream
and when he imagined he had become as great
as God himself he changed his religion
and quitted his dark old chamber
Then he bought some new cravats and
an almirah
But now his head as white as the tree
is in fact no more than a miserable little ball
at the foot of the stairs
From afar the ball seems to move
There is a dog beside it and
in its form seen remotely
when it moves one knows no longer
if it is the ball

Rajeshwari Datta and Sudhindranath Datta

French
PALIMPSEST

Georges Gaborj

As from a cold and pensive tree
My life, a leaf, descends above
The path to which I lost one day
The dog and rose and also dove.

Some mistress open at the knees
Received my body, heart and soul,
And now the crown I made of youth
Is fading round my shrinking poll.

And every night I seem to hear
The wind of memory lament
Within a garden, grey like ash,
Where lies our love all passion spent.

Rajeshwari Datta and Sudhindranath Datta.

Italian
THREE POEMS

Francesco Arcangeli

THE ROSE OF MAY

May's light can only ravage:
The green finds no repose.
O dark and silent rose,
You make of me a savage.

Your secret petals smelling
Of blood, no more, no less,
You come to repossess
Your bitter, bitter dwelling.

Eternal, sweet and thorny,
O rose I love to tear,
I give you back your lair,
These ribs so true, though horny.

A ROSE

Sweet bee, O friend of mournfulness,
Refulgent in the blaze of sun
Above these well-beloved tombs,
The lizards shimmer near your hair.
This light that, unappeased, confounds
My memories, will shortly make
The scorched earth harvest thunder, blood
And corn; but you, forever true,
Uphold in dusky hands a rose.

VENUS

Upon the evening's verdant dust
Descends our planet, skimming hills
Which, set on fire, burn gently like
A lamp of distant hope. And when
She disappears, I follow through
The darkling woods her flicker till,
Consumed by sweetness, she departs,
Investing with her testament,
A trepid flame within my heart.

Rajeshwari Datta and Sudhindranath Datta

Oriya

FOLLOW SLEEP, FALL ASLEEP

Sochi Raut Roy

Follow sleep then, fall asleep.
Follow the shadows on the wall.
The remembered and the forgotten, shadow them all.
Climb up the stairs with mark of dead men's feet,
The dark tower—a murderer's retreat.

There ask the killer's bones

If in his closed eyes living face shines.
Half-remembered are scattered skulls,
They are mirrors on which your heavy shadow falls;
And thus you find your bearings in that darkness deep.

Follow sleep, fall asleep.

Shadow those images that flit across
Images of your face reflected in the glass

Of dead events and scattered time.

The dark city where slums lie seam on seam,

The fearful tunnel that endless is,

And on no map charted the untrodden lane,

Only there can you have a whole verandah to yourself alone

For none will mount the stairs to rend your peace.

Where through half-closed lattices

Storm upon storm has pressed through centuries

And the dust on the window-sill carries

Even till today the traces

Of how the howling winds were calmed

In that room where dead emperors embalmed

Stand in row upon row to answer all your queries,

Waiting with their wisdom of centuries

To tell you what even the clearest mirror dares not reveal.

Jyotirmoy Datta

কবিতা
সংখ্যা ১০০

Serbo-Croat
TRAINS

Ivan Ivanji

I

Not only at sweepstake times are lottery tickets for sale.
No fingers touch the wheel of fortune as it spins.
On the railway station of life the fates are trains ;
And we just pick at random from the rail.

It's not all like clockwork, as the timetables paint.
But what's the use of lodging a complaint ?
Thursday was the day we expected to arrive ;
But no, it was Friday morning or Wednesday afternoon.
The main thing is that, late or soon,
We got there alive.

It's comforting to know
That everywhere the struggle for existence is still the same,
That nowhere is there danger of the dark from above or below.
When people get lost on a trip,
It's not the trains that are to blame,
But the people who have given themselves the slip.

II

Who knows where anyone goes and why,
When, how, and with whom he will turn aside ?
In the last resort the planets all pass by
In their unending ride.
Through space
Never to arrive at any place.

KAVITA
No. 100

And everyone will find
On railway stations in towns or at halts in the country air
That the fortune which awaits him is quite blind,
(For some will get the larger and some the smaller share.)

Perhaps for half a minute or so
The train will stop and no one will know
Why it won't go.
Then going on, the traveller anticipates his destination;
But everything will be late on that railway station.

কবিতা
সংখ্যা ১০০

Serbo-Croat

FACE IN THE SHADOW

Vesna Parun

Though I have forgotten his name, I know it was dear
to the birds ;
And my eyes can remember the lovable smile on his lips.

Men's footsteps pace the landing-place, but I do not
turn my face,
For I am wrapped up in the whispers of long-lingering storms.

Even the sea-gull has forgotten her friend who is dead,
so why do you grieve ?

The sea-gull has forgotten her nest on the cliff and
confuses the North and the South.

I have not drawn the curtain, while the sea is still unquiet.
I seek reprieve from chastisement of the knotted tops
of trees, from terror in the depths of the sea.

১১০

KAVITA
No. 100

Bengali

THREE POEMS

Samar Sen

EVEN NOW

The bright spear of the sun strikes
the burning stillness of the snow:
all those hills ripple away like dreams.

Even now like a scimitar aflame
the moon rises in the sky:
even now, ahead,
life,
as slow as death, lingers.

A GIRL

Today to our dimmed sight
happens the vision of you.
Eyes from a dream, breasts white and lovely,
lips fired by the body's first flame,
and all your flesh hinting bold desire :

On our soiled bodies,
on our sullied souls,
falls the light of your brightness
like a whip's reprimand.

HISTORY

I begged you : Come,
leave your grey existence ;
come across the tired stillness of your night

117

where the red hope of morning quivers,
where the mountains of night turn blue,
and the deep sea's darkness falls,
and the stars light their sharp blue flames
in the unyielding loneliness of the sky.

You did not reply, you only smiled.
In that tired, burnt-out smile
lay the night's restless, unending sorrow.

Sujit Mukherjee

Bengali
AWAKING AT MIDNIGHT

Gopal Bhaumik

What made me wake I did not know
When the night was hushed in sleep
And blindly grope to my little window
To gaze upon the distant void
Where all was still, so still and strange
That my poor darling stirring in her bed
Was to me
The sole reality.

Dull was the sky
In the sickly light of a moon.
And suddenly I saw
An earth gone ghostly sad and cold
As though it were not the same I'd seen
Riddled by the sun,
As if it were transformed
By some dark sorcery.

A shrill hooting floated on the air
Telling of a ship and of men leaving the land.
Enclosed within four walls
I felt that I could hear
Wild hooves thundering through the night
And tearing right through me.
Meanwhile the sky was dull, a hooting rose again,
And no one answered the call.

Gopal Bhaumik

Bengali

TWO POEMS

Naresh Guha

CURVING SAND

Many are the curving rivers
Which have changed to sand
Since the vague heart of childhood
Through the black hair of story
Crossed a courtyard, patterned
By moonlit hours.
She stands with lowered eyes
At the window on the upper floor.
I turn on the blue light
After evening's shower of rain.
She shuts the window.
In the distance a train passes.
It is rumoured Tapati Sen
Is soon to be married.

The shimmering lake
In the shadow of the pines
Quivers in the breeze
Of the pale moonlit evening.
Finesse is still needed.
Who comes? Who is coming
With light feet over the grass?

No one. I realise my mistake.
The monotonous night
Comes and goes.
(What hand do I have
In the shaping of life?)

Cigarettes and women's bodies
Flare and burn out in the camp
In the city and in the village.
Towards the end of the night
Rain falls on roofs, on roads,
At the corners of lanes
In the metropolis.

Lila Ray

A LITTLE GIRL, RUMI'S FANCY

If I be a flower-petal, or a little beetle, duck,
Or a cloud of very busy, fussy and ever busy, bees,
Then like an erring truant, I'll fly away, be ruined
And leave the sums and tables, scientific fables' class.
Then drop, hop, I dive, in a blue lake I drive, rove
Who could keep my track
As daily I go and gather, from flower and the heather
honey?
My hair though is tousled, I am blossomed and all
purpled,
It is I who really dances on pomegranate branches.
And though noon strikes on the clock, father's gone to
work,
It's morning here near me.

Jyotirmoy Datta

Bengali

IN A RESTAURANT

Arunkumar Sarkar

A square sky and afternoon. Everything is fine.
All I recall of the half-caste woman now is the sweat shine
On her downy back in that posh restaurant's glare.
A while ago I noticed the homing clerks hungrily stare
At the movie siren fixed to the poster by the street.
And now from the woodland in my heart floating comes the sweet
Song of invisible bees: come my naughty wenches jauntily
Where my noonday dreams are stirring up
All my sorrows in a hot tea cup.

Jyotirmoy Datta

German

VARIATION ON TIME AND DEATH

Hans Egon Holthusen

And still today we have the world before our eyes. We have
Autumn, a ferment in the blood of time forsaken and to come,
And yellow chestnut leaves in the yard. With no exception now,
We all agree that lovely must it be to sally forth;
And children, four years old, for just a second taste
What they will search throughout their lives and not recapture:
Autumn and homeland, the dusty habitation, this existence
Close to earth's protective crust, the preternatal landscape,
Hilly country, marsh, or granulated ridges
Standing clear of spotted sand darkly gleaming,
Cobbled pavements, juniper and birch, a lonely road
Athwart the heath, a maid in socks of blackish wool,
Her apron full of goat-smell... In old age that is called
one's childhood.

After a whole night of rain the morning clears but slowly,
Sweetish rot, translucent in the air, October, Theseus and
Ariadne,
One of Mozart's golden rondos in a minor key, a figurine of gold.
And this is also when a girl in some ungodly town,
A girl, whose latest letter you have not replied to,
Throws herself across a stony rampart down to the street.
O, no one will ever discover how at that momentous instant
Pallor overspread the heavens, how in frigid concert
All the windows shut themselves behind a glassy stare.
And who will dare inquire how this became the Sunday
When, incredibly, the golden rondo echoed with
The resonance of death?

Rajeshwari Datta and Sudhindranath Datta

German
AUTUMN CROCUS

Georg Von Der Vring

The asters' blue is like the dusk itself,
And round like patience are the apples which
Confront the restless man; and so he turns
To contemplate the crocuses—those bolts
Of bright September fallen from the skies
To droop or stand erect upon the grass.
And then he starts to feel his proper shaft,
The icy thought within his stricken breast
Of making better love to loveliness.

His asters lose their blue to twilight now,
And big with nightmare grow his apples; while,
Ungodly from his wound, he gropes along
The walls of earthly innocence, with hands
That clutch the fruits of knowledge tight. And, ah!
The hut, become a silver quiver, whence
The candle signs to him, may once again
Remove the secret arrow, tenderly
Perhaps, but not too soon by any means.

Rajeshwari Datta and Sudhindranath Datta

German
FALL OFF, O HEART

Ingeborg Bachmann

Fall off, O heart, fall off the tree of time,
Fall, you leaves, from frozen boughs
Which once the sun embraced;
Fall as tears from widened eyes.

The landgod's locks, above his brow of bronze,
Fretted all day long, have not yet ceased
To flutter in the wind; and underneath his shirt
The fist already presses on the gaping wound.

Be, therefore, hard if once again the swarming clouds
Incline their pliant backs to pay you court;
Be hard if once again the honeycomb
Fills you with Hymettus.

For unavailing is an isolated sprout
When drought compels the husbandman.
And can a single summer make
A race of swallows, or perpetuate the swift?

What, moreover, does your heart affirm?
Oscillating in-between tomorrow and
Yesterday, its strange and silent beats
Already cancel out each fall from time.

Rajeshwari Datta and Sudhindranath Datta

German
My Room

Guenter Elch

When I threw my windows open
Fishes sailed in—herrings—
Like, it seemed, a swarm of small fry
Swimming past in close formation.
Gambolling, they also spread among the pear-trees,
Though by far the greater number hid within
The woods above the nurseries and gravel-pits.

They are annoying. But a damned sight worse
Are sailors (even those of higher ranks—
The captains and the tax-collectors)
Who so very often come to stand
Before my window, begging for a match
To light their foul tobacco with.

I wish to move right out of here.

Rajeshwari Datta and Sudhindranath Datta

German
A NIGHT-SONG FOR O

Hoist Lange

O slumber soundly now, be one with sleep,
Forget the day, fall out of date;
Let moonshine and the brew of stars your senses steep,
Turn weightless, cool and indeterminate.

A raft devoid of mast and keel,
Skim over dreams, all soaked with heavy blood;
And spread yourself above the trees to get the feel
Of skies at long last freed from hawk and flood.

Give way to fear, and know no name;
Be minor, small, a naked child of dearth;
Perceive how, caught by hands too hard and apt to maim,
You once were sundered from the womb of earth.

Within the pregnant darkness dangers stir,
Remain concealed, and lose your sight;
Transform yourself to those that never were—
You are a stranger still to death and life's slow blight.

Rajeshwari Datta and Sudhindranath Datta

German

THREE POEMS

Werner Rehfeld

THE WIND ON THE LIPS

The wind on the lips
Tastes
Of next door.
In the mirror it effaces
Reflected nights ;
Denudes
In the bolster the anonymity ;
Drops into the waves,
Into the couple's rhythm,
Into the curtain
In front of the granted time.

BETWEEN THE FINGERS

The bedless nights.
Between the fingers
The hours circle
Elastic islands,
Figureless behind the hands.

Advertisements in the eyes.
Behind the windows
Pictures loll.
On the stairs
The questions tumble.

WITHOUT TRAFFIC

Between yesterday and today
The bridges are
Without traffic.
Hourlessly
The ships sail
With stolen words.
Between the piers
The rivets break.
Over the anchors
Pictures move
In wavering circles.

Nikolaus Klein

Bengali

THE MIRROR-TOWN

Ramendrakumar Acharya Chaudhuri

In that mirror-town my neighbour dwells.
Floods recede, pestilence falls.

A gaudy blouse, eyebrows pencilled,
The sun delights in the palm's conceit;
To Alipur the ducks fly back
As conch-shells sound and the Pontiac
Speeds with her (6.29 !)
To the meeting in Monument Park.

How many placid homes have crumbled.
Panic strikes the cattle's eyes.
On that tall building crawl those people—
The need's for help.

Home's adrift—the need's for pity.
Aeroplanes are ministers.
I am wearied of the infinity
Of sunlight spread between the stars.

O beggars, lovers, palmists, all
Who make this town so warm and full,
Where's the mirror? Where my neighbour?
Floods recede, pestilence falls.

Buddhadeva Bose

The 'mirror-town', according to a Bengali mystic, is the spot between
the eyebrows and the seat of the 'neighbour'—the adored one.

Bengali

THE INHERITANCE

Arabinda Guha

How rashly did you squander
Your little capital
That night when you went under,
Your body's raft and all.
Too light the raft to tolerate
Your sorrow's dark, secretive weight—
So felt perhaps the watchman who
Refrained from staging a rescue
Although he saw you flounder.

As event, suicide is supreme.
Yet if Hereafter does exist
The future never will redeem
What here you desperately missed.

Your sorrow slips through remembrance;
The sentimentalists decry
Your foolishness;—but how can I
Renounce your love's inheritance!

Buddhadeva Bose

Bengali
HIS DEATH

Syed Shamsul Huq

Izdani died when his plane dipped down.
He had dared to hold your crowded world
Like a soft small lemon in the palm of his hand.

His head was stuffed with the titles of books, their jackets,
Memories of Night Light Cafe. And possibly
Nylon thread a yard or two. But swimming through
All those varying airdrifts he died too young.

You who gather at the nice lady's
Table for tea—

We had mourned his loss at a meeting collectively—
“Are they not come yet?”

“Sweet enough your tea?”

Prattlers follow the wind :

“What was Rimbaud if not drunk and young?”

“Oh, Cocteau! He is really the limit for me.”

And around their talk floats a mist, his soft ghost,
Seen because it's a trifle heavier than their idle breath.

Jyotirmoy Datta

Bengali
THE HAUNTED TERRACE

Alok Sarkar

Wide the terrace above but here I am.
“Climb up,” I tell myself. But I know
I won't ever because the miraculous calm
Of that water-tank's neighbour, the pebble-like shadow
Falls into silence if I am anywhere near.

A ghost dwells there. His naked bones have a cruel dry shine.
Terrible his unearthly eyes. White blood mounts his twisted
spine.

One look, and I fly from room to room. Yellow my face in fear.
I go where they are having tea but their cheer apalls
Because from everywhere the stairs are seen and always the
terrace calls.

I tell myself : “Why can't you be an unspoilt child of nature,
pray?”

And when the evening comes—the day's cool residue—

You find before you spread a dark childhood view.

Up. Leave your home, the prospect is wide as your wish ;

Return to that first dawn and the river-bank's bliss.

Jyotirmoy Datta

Bengali

BESIDE THE WELL

Alokeranjan Dasgupta

Will you not stand once more beside the well ?
Will you not promise not go to town
To watch the fireworks whizzing
Or catch the fancy of a foreign poet ?

Not that I know who urges me
Even now to go on talking.
Wrapped in the nights of Magh
Or scorched by the Jaishtha days
I assume the dutiful air of a cockato.

Everything is ordained and to shift a straw
Is not in my power.
Not even a single sparrow
Can I ever subjugate.

Granted the heart is mountain. But then
It is swayed by the supplicant kneeling.
At times reticence too may crush
Stone with stone.

Will you not stand once more beside the well ?

Alokeranjan Dasgupta and Buddhadeva Bose

Magh, the tenth month of the Indian calendar, corresponds to
December-January, and Jaishtha, the second month, to May-June.

Bengali

A CONFESSION

Sunil Gangopadhyay

Widowed at nineteen, she fought temptation till
At twenty-nine she slipped. And shame
Shook her slender stem like a candle-flame ;
It was merely rumour first. But the thing began to fill
Her veins. At last that flood of pain engulfed her.
(I can confess at last it was I the secret seducer.)

I leg the streets all day, a slave to the urge to live,
Tiring the nights are, tiredness is choking as a woman's
embrace,—

But when tired to the bones I was, her flaming flesh was grace.
As soon as she cast off her heavy veil of grief
Her flesh became a deep and cleansing well.
Frog-like I gloated, my boredom withered and fell.

Her struggle she gave up wearily, her sigh could fill the earth ;
She had followed all the rules ; the gods of the hearth
And that half-remembered stranger, her husband, got their due.
But in her conch-shell breasts a dark priest blew
A fierce song that filled the night's vast horizon-walls.
She gave herself up finally and never again she wails
Though the storm is over now and she is cast
With her secret poison-flower on a heartless coast.

No, the Remarriage Act can't save her. She has lived up to
a code

Which will make her choose death, although it let her not
choose her food.

Opium she may have. Or fire. Else, she can sing the praises
(Blame her 'not, she was forced) of their tender god, Jesus.

Jyotirmoy Datta

Bengali

TWO POEMS

Jyotirmoy Datta

THE BEGGAR WOMAN

Not a woman really but the ghost of a tree
Uprooted by a storm in some forgotten century.
Her bark is now rags, in a beggar's disguise
She sits there all day. And so still she is,
It's clear her secret roots go down beneath the pavement stone.

Often, if it is a deserted noon,
I find not her but something cool and dark on the stone.
She sat there so long! Has at last the pavement taken
Her deep imprint? Or, is it the deserted shadow of one
Who is gone on a distant journey absolutely alone?

Is that a living woman, or merely
The mirage of a distant decade haunting my eyes?
Or, in noons such as this, the clairvoyant sun betrays
The ghosts in the air, the secret messages,
Written in invisible ink beneath all these apparent lies?

Somebody had drawn these marks on the city wall
Hoping when it was burned down his fearful prophecies
Would be clear even to our unbelieving eyes.
But it is so hot this afternoon that bared are those dark scrawls;
See here it's marked: "Beggar woman, the lame and the old
refugee."

A few strokes there—takes shape a scrawny bitch—
And those dots—oh cruel economy!—stand for filthy puppies.
Why suck, my phantom dogs, at the breast of only the sketch
Of a mother? Could those stiff lines ever be a rich hive of milk!

O sun, angry god, hide in your dark silk
Locks of cloud your fiery face, or else these eyes go blind.

A raven and that woman sit in the rain.
If it rains for ever, if this earth dissolves
In this monsoon acid into a fine sand grain,
Even then neither will stir. Nor utter one groan.

MONOLOGUE OF A DYING MAN

Here is the old fly, more eager than the rest.
They know. Although this glutton is first for the feast,
They all know I am ripe for plunder now.

For them I was born to yield them food.
Now that I think of it, what to one is living blood
Is food to the rest. In God's strange garden grow

Plants that climb upward, politicians and bean,
And those that grow beneath their toes
Could be either poets or potatoes.

What difference then between them and me?
I hear them now. So the final stillness is
Filled by beetles gnawing and, louder than beggars, the flies?

But, supposing, after their banquet ends
A little is left no fly can eat,
Something invisible; secret,—

If, for your angels is left a magic residue
Which even the funeral fire fails to singe
Being lighter than air and cooler than dew!

Do as they will with my veins.
I leave them my nerve-entwined bones and those
Secret rills, if only that little remains.

Who knows but this is that alchemy
Which draws from dross a drop of purity;
This could be God's way of distilling me

From this heavy and bloated carcass of mine.
From this heap of me, who knows, he may yet extract a drop
Which, if poured into a flea, would be just enough.

To make it a fiery grain of life.
Spread like a banyan, bowed by leaf and tendril, bud and tender
shoot,
All I yearn to be is a vibrant point at the tip of my root.

So the bugs be gorged and merry be their feast
For they are being used in this brewery, my body, by a gentle
chemist
Squeezing from stale flesh, liquor for his lips.

Jyotirmoy Datta

A NOTE ON MODERN BENGALI POETRY

Jyotirmoy Datta

Bengali poetry is the creation of a people who succeeded in almost nothing else. Even the Dutch did more than paint and in South India there is much to engage one's attention besides Bharata Natyam. Neglected in the Sanskrit epics and by the Muslim emperors who ruled from Delhi, eyed with suspicion by the British and treated shabbily by those who negotiated India's independence, the Bengali chose poetry as his one revenge against the world. But because he chose that one art where success is never apparent to the outsider, his revenge hurt only himself.

There were occasional attempts to let strangers into our secret. Rabindranath translated his own poems and those of others into English, and so did some of the later poets. But all our attempts to attract the outsider ended in failure and our poetry remains our private possession.

It is not that the foreign reader was indifferent to our efforts. Instead, we were flooded with sympathy. Every review of, each private reaction to, our translations seemed to follow a set course: "Oh, yes I understand...the language barrier...ineffable ultimately...the sonal element being the heart of poetry...yours is a musical language...one misses the 'soft vowels'..." and then followed the inevitable and fatal adjective—"Of course it is extremely interesting."

On our part it was hardly the vowels and the labials that we missed as much as the poetic essence itself. We could easily forego the jingle if only we could keep the heart of the poem beating in the translation. We were not naïve enough to suppose one could put across the "music" of the original, but the element that is translatable was lost too in transit. It was lost because one can only translate into that language in which one could have written the original poem oneself. When we translated into English we used stock phrases and our style seemed to parody obsolete ways of writing; surprising perceptions, magically evocative images and shockingly true intuitions were amplified, smoothed over, and rationalised to help the foreign reader to understand. We went out of our way to make it sound like English. We had to do so because we lacked the authority to compel our new reader's attention. Our own readers had to strain to understand; they had to guess, be inventive, participate as readers of poetry must. Naturally, they were exhilarated

when they emerged triumphant from the challenge set before them by a Rabindranath or a Jibanananda Das.

In Buddhadeva Bose's translations from Baudelaire no difficulty is stirred over; Sudhindranath Datta's translations from Mallarmé retain all the elements that were the despair of the French readers. Their translations are good Bengali and yet not-Bengali; the grammar, though correct, gives us the feel of a different language; the metre is perfect but it sounds exotic. They could do this, because they use the Bengali language with authenticity, courage and conviction. It was a task delightful to them and profitable to us, for now Heine and Baudelaire, Mallarmé and Ezra Pound have been so well Bengalised that they have become a part of our literary inheritance. In Bishnu Dey's translations the foreign poets almost become Bengalis. A similar success can never be achieved in a foreign language; it might even be temerity to try to do for others what they should do themselves.

Those who are responsible for this number of "Kavita" did not for a moment believe that it was possible for them to turn out translations any better than passable. They undertook this task because of a unique fate which forced them to be their own translators. In many ways a precious acquisition, our knowledge of English has become a barrier in one respect: we know the language well enough for others to feel it unnecessary to learn our language to communicate with us. Our poetry is shut away from the foreigner by the very ease with which he can communicate with us on the social level. It is a strange language-curtain which hides the most valuable part of our consciousness because it reveals all that is trivial.

I have never met a foreigner who has not asked why we do not translate more of our poetry—a question which could have never been put to a Baudelaire or a Pasternak. Both chose to use their knowledge of English to translate into their own languages and left it to their English admirers to enrich the English language by translating their works into English. Nor could such a question be asked of a Japanese or a Chinese poet. If it was not for its other benefits, it seems it would be better for Indians to forget English. That would force all those who would like to have a glimpse of our secret thoughts to learn our languages. In our gloomiest moments it seems to us as if that is the only way left to avoid questions that are really impertinent but meant to be polite. That, or else to contrive things in such a way that an atom bomb is dropped: on us so that philanthropic foundations try to erase the sins of their nation by sending hosts of translators to India.

But who knows if we might not yet succeed in our aim of exciting the interest of a young English or American poet through these translations, so that he would try to do better what we had done lamely? That is the true purpose of our efforts; if these pale shadows of the original Bengali poems retain charm enough to excite the curiosity of better translators—that is, translators who are poets by their own right in English—if our translations are regarded by a new Ezra Pound as an invitation to him to succeed where we have failed—all that we desired to achieve through these translations would be done.

Doubtless the European poet-translator would find our poetry different enough to be a valuable addition to the literature in his own language and yet not so strange as to have no bearing at all on the problems that concern him as a creative writer. He would find themes that occur in his own tradition treated in an alternative fashion in our poetry; he would discover that problems he regarded as uniquely his own beset poets in another language who are separated from him by geography and memories of a different literary past but are one with him in their notion of poetry and its uses.

He would discover that our poetry is not oriental in the sense that Chinese or Persian poetry is. It is recognisably poetry to a Westerner. It has metre—and rhyme. It is not misty allegory nor the snapshot of a moment as is most of Far Eastern poetry; unlike Persian poems ours are not the product of an emperor's court, nor are they written for a readership composed solely of men. From the Western point of view its one shortcoming may be that it does not have the charm of the exotic. Our poetry began, as European poetry did, with an epic which described the full cycle of a civilisation. The "Mahabharata" has a sublimity which makes it hard to believe that it could have been created by man; the compass is so great that it looks as if an entire race had secreted all its memories in it; and yet its artistic and philosophic unity convinces one that it is the creation of one who, like Homer, transformed the wisdom and the memories of his race into an epic which was so great that it could take in later interpolations with a gain in bulk but with no loss in unity. The "Mahabharata" occupies a place in our tradition that the Greek, Latin and Italian epics do in the European. It describes, as does the "Iliad", the fall of a city and, like the "Aeneid", the rise of a new one. Arjuna, like Odysseus, goes on a journey that is symbolic of the marked man's restlessness. And, as in the "Divine Comedy", hell is harrowed and the grand cycle ends with a vision of heaven. The poet, Vedavyas, surveys this spectacle with the serenity of a god. He ascribes to himself the role of a minor

character in his tale who outlives four generations of heroes, who knows everything in advance and yet does not intercede, who steps in only to advise his creations on the vanity of sorrow. Valmiki, the legendary creator of the "Ramayana", developed a story briefly told in the "Mahabharata". The legendary Vedavyas is almost a god; Valmiki is sorrowful Man. Valmiki knows the ways of the gods but sympathises with the superhuman sufferings of his heroes. In the "Mahabharata", as in the Greek epics, there is no room for pity; in the "Ramayana", as in the "Aeneid", we can feel a humane glow surrounding everything.

The next great poet after Valmiki celebrated the golden age of Brahmanical civilisation. Like the Augustans, he put intellect over feeling and proved that one could be a great poet although one wrote according to rules. He was Kalidasa, the supreme craftsman and the darling of generations of commentators, in whose works a dazzlingly rich and sophisticated India breathes the life of its culture into the cold complexities of Sanskrit metres. There is a gap in our tradition too (filled by mystic and devotional poetry), between the decay of Kalidasean classical literature and the rise of the vernaculars. Near about the fifteenth century a new spirit was abroad in India as in Europe. Religion changed with Vaishnavism, and so did poetry. Mukundaram, like Chaucer, wrote vividly about his times. The first true love-lyrics were written by the Vaishnavas. Rhyme was discovered or stabilised. Jayadeva, the poet of "Gitagovinda", was like Ariosto in being a humanist. Some of the Vaishnavas were as earnest as Donne; all of them played with a charmingly ornate and conventional style. Bharatichandra was as clever as his English contemporary, Alexander Pope. Madhusudan Datta tried to create a hero in the true romantic image. He was the first Bengali poet who was acquainted with European literature. He admired Milton immensely — an admiration shared by his immediate English predecessors, Wordsworth and Keats. And after Rabindranath, the moderns.

Thus the story of Sanskrit and Bengali literatures roughly parallels the course of any of the European literatures — the dates of the changes and their direction are fairly identical. It would be interesting to speculate how two peoples who for at least two thousand years were almost unaware of each other, thought and felt in a similar fashion. Are the centuries mere quantities of time or are they vital forces which secretly change the souls of men as the seasons change plants? Are languages merely a group of dead symbols tied together by the laws of grammar? Or does a language possess a life of its own which forces its own modes of feeling and thought on those who use it? Sanskrit, Greek and Latin

rose from a common source; is it unlikely that they should evolve in like directions and force Europeans and Indians to create similar literatures?

This train of thought opens up thrilling possibilities of speculation — which I dare not pursue — and yields one certain deduction — which I must record. It demonstrates how baseless is the charge oftenest made and which galls us most — that modern Bengali poetry is rootless, "derivative", that it is not our spontaneous creation but the result of our English education. Even the brief glance-back at the history of our literature must have shown that long before we learnt of the existence of the northern island with its chalk cliffs and Shakespeare, we were inevitably evolving towards the poetry of today. Granted, we borrowed often and liberally from the English. But did not the English borrow as much or more from the French and the Italians? Did not Dostoevsky borrow from the "Gothic" novels and Hoffmann and Dickens? Is Chaucer any the less English for having imitated the Italians or is Dostoevsky un-Russian or "derivative"? Or is Rabindranath un-Bengali or "rootless" because he admired Shelley and Keats? The gap between the "Westerner", Madhusudan, and the Bengaliest of us all, Ishwar Gupta, is no sharper than that between Coleridge and Goldsmith. And just as English poetry is nearer German than French in spirit, despite all the borrowings from the latter, there seems to exist a deep and secret affinity between Bengali and German poetry, though all direct borrowing has been from English. "Goethe, Hoelderlin, Rilke; the direct borrowing has been from English. 'Goethe, Hoelderlin, Rilke; the novels of Thomas Mann' — so runs one of the most evocative lines in Sudhindranath. And in fact Jibanananda brings to our mind the poems of Hoelderlin. And Goethe is the only figure in world-literature in whom can glimpse 'another' Rabindranath.

But it would be rank ingratitude if we did not proclaim our debts to English literature. With Madhusudan began a period of borrowing which happily shows no sign of ending. At least one metrical form, the blank verse, was directly taken over from English. The sonnet, the novel, and the short story were modelled on examples in either English or some other European language which we received through English translation. We must note that it is not only English literature, in the sense of the productions of Britishers and Americans, that has influenced us, but the whole of European literature to which the English language has given us access. Although Madhusudan was a linguist, and so are a few of the moderns, the majority of the Bengali poets, including Rabindranath, did not have any European language except English. And yet the Bengali:

bonnet is firmly built on Italian and French patterns, and while the "English" blank verse has withered in Bengali, the continental prose-poem is flourishing. That these transplantations have thrived on our soil is significant, but contact with European literature has given us more—something undefinable but immediately felt by anyone who starts reading the poets after Madhusudan. After the English came, we ceased being provincials and became aware of the wide world around us. Kalidasa felt himself to be at the centre of the world of his time; after a gap of many centuries we too felt as if our thoughts mattered to the world.

It was not to initiate us into Shakespeare that Englishmen came out to India; it all happened because we were ready to receive. The empire of Britain spread all over the world, but not all of the subject nations could use the new contact established with the West in the fashion we did. Already, before the English came, Bengali was a living literature; it had a long past but it was hungry for the new, waiting for materials it could assimilate and transform. Through the influence of the newly opened-up West, age-old memories of the Sanskrit classics were themselves transformed—into something rich and strange.

One of the most exciting chases in literary history would be to follow the career of an image from Valmiki or Dante through our literature. In Kalidasa occur many images and lines from Valmiki which, though subtly disguised, can be recognised easily enough. The ages which separate these two poets wrought great changes: Valmiki's images vivify suffering held in heroic restraint; Kalidasa seems, almost, heartless. In Kalidasa's gilded paradise no fever torments man except that of 'lovesickness, no tear is shed except when the lover is separated from the mistress.' Those images surface again, fifteen centuries later, in the poems of Rabindranath. The sharp, cruelly clear pictures etched by the cultured courtier dissolve into visions portentous of disaster. Tagore, the romantic, has changed paradise into a sad place and physical appetite into love. A gap of fifty years—and the changing images crop up once more in the poems of Sudhindranath, one of the first of our moderns, who broadcasts darkness all over the world. The romantic's melancholy becomes the nihilist's despair.

Similarly, an image from Dante that Rimbaud used or one of Milton's that Keats borrowed, could be found in a modern Bengali poem richly overgrown with new meanings and associations. In Jibanananda one can trace metaphors and images that had their source in Keats and Yeats; poems by Buddhadeva reveal Baudelaire's influence; there were distinct echoes of Eliot in the early poems of Bishnu Dey; Premendra

Mitra's poems show traces of Whitman. It is exciting to observe how these poets endowed with memories of Sanskrit literature, transform elements gathered from poets of the Western world. The death-wish in Keats becomes an almost religious yearning in Jibanananda. Baudelaire's rag-picker thirsts for God instead of wine in a Buddhadeva poem.

The past seven decades have been the most fertile in the history of our literature. The Vaishnava period had been almost as rich in lyrics but 'not as complex, as agonised, and as intense as modern Bengali poetry. The modern poet has discovered more new subjects (and has treated them in a more varied fashion) than was done in the seven hundred years which preceded this period. All the metres now in use were standardised by Rabindranath. He also gave us the prose-poem. Jibanananda opened up the dark world of the unconscious, and the limits of the other half of our consciousness have been explored by Sudhindranath. Bishnu Dey has transformed political events into haunting surrealist verse.¹ Amiya Chakravarty's lyrics are delicate and strong like submarine vegetation; in them dream and reality interfuse. Buddhadeva's later poems are starkly ascetic in their rejection of "the world" and probing into the sources of creativity. Some time or other, each of these has been blamed for being obscure, but Premendra Mitra remains an example of happy simplicity.

The greatest gift of the modern poet to our poetry is his discovery of death and the necessity of sorrow. A Westerner would never be able to guess how shattering an experience these discoveries have been because he, being a Christian and a descendant of the Greeks, had discovered both long ago. But in our culture the death of men and civilisations had been regarded as a fact almost as inconsequential, or rather, inevitable, as the seasonal shedding of its leaves by a tree. For an Indian it has always been rather difficult to regard disasters in their isolation; seen from their Olympian view-tower all prospects, however unpleasant in themselves, merge into a harmonious cosmorama. It is surprising that neither in Sanskrit nor in Bengali poetry was a suicide mentioned before Jibanananda Das. There have been glorious deaths but no unaccountable ones. Before Jibanananda people sacrificed their lives for love or glory or because their deaths were necessary for the cosmic wheel to turn smoothly. Jibanananda found consciousness an adequate reason for yearning to die. He made us feel the raw and sickening impact of death, he endowed even the flesh of an orange with the agony of living tissues and hunted deer muttered of their pain in his poems. And because he did not believe this suffering to be the just

wages of sin (as a Christian would), nor held the traditional Hindu doctrine of Karma, his poems provide the most intense experience imaginable. They could have become stifling if it were not for a uniquely Indian quality in his poems: there is the vision of a sympathetic order behind the world's cruelty, which cannot intervene but keeps company with man in his tragic vigil.

Now it seems as if this period of frenzied creativity is at an end. The new generation of poets seems to have lost the enterprise of their predecessors. "Enough of ferment," they seem to say. "Now for settling down." They look tame and bourgeois beside their fire-eating elders, and perhaps they want to be tame and bourgeois. They are writing neo-classical verse in praise of propriety and balance. And this is so not only in Bengal but the world over, and not only in poetry but in history, politics and philosophy. Everywhere the new generation—my generation—seems to be overwhelmed by the achievements of the past, and the sterile attitude of sneering at the heroic pomposity of a Thomas Mann or a Mallarmé's saintly devotion to art seems to have grown into our bones.

And yet, though hidden to an observer from another generation, we can feel a new stirring in our veins. The first half of the twentieth century lived on the ideas bequeathed to it by the nineteenth. Its poetics and the psychology of the deep dark, its politics and the mystery of missing God, are all nineteenth century inventions. These have been used and used till all their possibilities have been exploited. It is no longer possible to write a really new 'modern' poem—modernism can now be only imitated. The present generation refuses to be mere imitators. What appears to be our docility is really humility. We are humbly waiting for the future to take shape; we are secretly preparing for the discoveries that this century can rightfully claim as its own. What else can we do? It is impossible to hustle the future.

EDITOR'S NOTE

In this number of *Kavita* we have drawn upon ten languages, seven nations and all the six decades of our troubled century. This we hope justifies the term 'international', but we do not claim to be 'representative' in any sense of the word. Let alone the big world, our gaps with regard to our homeland are many and obvious. We did want more poems from the sister-languages of India, but our attempts to contact poets and translators produced little result. Thus our choice was determined by the languages known to the editor and his collaborators and the material we already possessed or were able to hunt up. Our aim was to introduce our contemporary poetry to foreigners and that of other nations to Indians, but let us make it clear that the linguistic distribution in this issue follows no definite plan. It is the result of circumstances or accidents, and this, we suspect, would be true of any offering of this nature.

To this there is one exception, however. The greatest number of poets and poems are Bengali, and we intended it should be so. After all, or rather above all, *Kavita* is a magazine of Bengali verse and has been involved in its evolution for over two decades. It seemed to us both natural and right that we should try to make this issue a little anthology of modern Bengali poetry as well as a meeting-ground of nations. But here again we do not claim to be comprehensive or adequate. Some poems we would have loved to include refused to be translated, possibly because of our incompetence. We could choose only those which we found it possible to translate—and also worthwhile. The reader should be told that in our translations we have tried to maintain the forms of the originals, although rhyme had to be left out here and there.

The prose essay in this issue is meant as an introduction to Bengali poetry and is addressed especially to those who do not know our language or the history of our literature. We particularly hope to dispel certain false notions that have gained currency in the West: that modern Indians are victims of a 'hybrid' culture, that the oral tradition is still very much alive and the literature produced by English-knowing Indians is a brief interlude which has no relation to 'tradition'. Even the enlightened Poetry, we were sorry to note, printed a remark to the effect that the 'people of India automatically relegated those few poets who imitated T. S. Eliot and Ezra Pound to esoteric groups who are little known or appreciated.' In a similar strain a Bengali-born professor living in England permitted himself to say in print that Saratchandra Chatterji, the Bengali

novelist, merely imitated cheap English novels. The truth is, though, that Saratchandra, who received no college education, was a very small reader of English novels, whether cheap or elevated. In modern India it is not even necessary to know the English language to be infected by ideas which have their roots in the Italian Renaissance and the French Revolution; all those our nineteenth century made a part of our inheritance. We cannot vouch for the whole of India, but certainly in Bengal the modern poets are neither 'few' nor 'imitators' of Pound and Eliot (any more than Pound is of the Chinese or Eliot of Laforgue) nor 'relegated by the people' (who are 'the people'?) to obscurity. Modern poetry in Bengal is just as much (or as little) read and appreciated as anywhere else: relatively speaking, its influence may be rather more extensive than in Britain or the United States. It is this poetry (specimens of which we present here) which is vitally linked with our past and out of which the future is taking shape. And its writers are persons who have not stopped at their village homes but have experienced the world in one way or another and by doing so have become better Bengalis and Indians. As for the oral tradition, it is just dead and it continues in its deadness; nothing new has come out of it in the last two hundred years, and hosts of anthropologists and sociologists will not be able to squeeze a drop of real poetry out of its inert agglomeration.

We should like to express our gratitude to those who have given help and encouragement to this project, and among them are poets, translators, advertisers, cultural organisations and members of consulates and embassies. To those who have contributed to the making of this issue, our thanks; to those who will read it, our friendly greetings.

B. B.

ABOUT OUR CONTRIBUTORS

RABINDRANATH TAGORE, the centenary of whose birth we are celebrating next year, occupies much the same position in Bengali life as Goethe in German and Pushkin in Russian. 'Hard Times' marks the beginning of the 'dark' period of his middle years. The original, in richly rhymed eight-line stanzas, was published over 60 years ago. Tagore's own (abridged) translation of it is entitled 'The Bird'.

JIBANANANDA DAS was one of those rare spirits who could and did succeed in nothing except poetry. His life was lived in an obscurity similar to Blake's or Hoelderlin's: his home, a small riverside town now in East Pakistan; teaching, his means of living; his vocation, verse. Hailed by one fellow-poet as a genius, ridiculed by the official critics and neglected by the 'progressive' school, Jibananda quietly produced seven volumes of verse which by now have worked their way into the destiny of the younger generations. Today he is variously regarded as the first of our modern poets or the only true exponent of 'pure poetry' in Bengali. He was born in 1899 and a street-accident led to his death in 1954, in Calcutta.

SUDHINDRANATH DATTA has worked as secretary of an insurance company, an ARP officer, and as journalist and publicist. The chief 'theoretician' of modernism in Bengal, he has edited a literary review and been the centre of a distinguished coterie. His place in literature is assured by his critical writings as much as his verse and verse-translations. He has travelled extensively and is currently teaching a course on Comparative Literature at Jadavpur University, Calcutta.

AMIYA CHAKRAVARTY was an associate of Tagore and Gandhi and has lived and taught in the United States since the end of the Second World War. He resembles Tagore in his multiplicity of interests and passion for travel, but whereas Tagore's poems seldom use a locale outside Bengal, some of Chakravarty's vividly capture foreign places and ways of life. His distinctive use of free-verse has influenced later poets.

PREMENDRA MITRA'S poetry, fiction and children's books have won him several prizes and countless admirers. Like many writers of his generation he started as a contributor to 'Kallol', an 'avant-garde' magazine of the late nineteen-twenties. He has written for the films and worked as a film-director.

HUMAYUN KABIR is India's Minister for Scientific Research and Cultural Affairs. He formerly taught English and Philosophy at Calcutta

University and is author of several volumes in Bengali and English. He edited 'Green and Gold', an anthology of Bengali writing in English translation and is sponsoring a collection of Tagore's essays, to be published in the centenary year.

BUDDHADEVA ROSE'S four poems are from his recent book of verse, 'Je Andhar Alor Adhik' (This Dark is more than Light). His Bengali rendering of 104 poems from 'Les Fleurs du Mal' will shortly appear in book form. A volume of short stories in English translation is in process. He founded 'Kavita' in 1935.

BISHNU DEY was one of the first Bengali poets to become conscious of being modern, but his later verse shows a yearning for tradition and the grass roots. He has translated from Eliot, Pound, Eluard and many other Western poets and written about poets and poetry in Bengali and English. His verse is widely admired and imitated.

UMASHANKAR JOSHI lives in Ahmedabad where he edits 'Samskriti' (Culture) and is Director of the School of Gujarati Language & Literature, Gujarat University. He is a leading Gujarati poet and has published short stories and one-act plays.

JAISHANKAR PRASAD was one of the initiators of 'chhayabad', the mystic school in modern Hindi poetry. Among his best-known works is 'Kamayani', an epic poem of monumental dimensions. He published several volumes of drama and fiction and died in 1957 at the age 68.

MAHADEVI VARMA lives in Allahabad where she is Principal of Mahila Vidyaapeeth. The mystic school claims her as a chief exponent and her volume of lyrics, 'Deepshikha', was awarded the Akademi Prize. She has published two volumes of memoirs.

MAITHILISHARAN GUPTA is a traditionalist and follows the cult of 'bhakti' (devotion). He has published 37 books of verse and translated from Sanskrit and Bengali. He is a nominated M.P.

G. SANKARA KURUP was born in 1901 and retired from a professorship in 1956. He acknowledges influence of Tagore whose 'Gitanjali' he translated into Malayalam. His home-town is Ernakulam, in Kerala, where he is respected as the 'doyen' of letters.

DOROTHY NORMAN edited 'Twice a Year' and chose captions for the 'Family of Man' photographic exhibition. She has visited India and written about Indian art and philosophy. Her volume of poems is entitled 'Dualities'.

WESTON MCDANIEL has published three volumes of verse. He lives in New York City.

GALWAY KINNELL is a young American poet who is currently teaching at Teheran University. His first volume of verse is in preparation.

D. J. ENRIGHT has taught English literature in Egypt, Thailand, Japan and Germany and is now professor of English at the University of Malaya. He has published novels and essays and his third volume of verse is in the press.

PAUL GILSON is a young poet who works on the Paris Radio. He has published novels and an anthology of the cinema. His father, Etienne Gilson, is professor of medieval philosophy at College de France.

PIERRE REVERDY came into prominence immediately after the First World War and is now regarded as the greatest living French poet. He holds that a poem should be an end in itself and not a parasite on reality. His compositions tend to be circular, the interlinked images seldom reaching a conclusion but returning somehow to the title.

GEORGES GABORY was born in Paris in 1899. Though he has been involved in the modernist movement, he is far from being a 'fauve'. His verse is regular, but he prefers the octosyllabic line to the alexandrine.

FRANCESCO ARCANGELI'S three poems appeared in the Italian original in 'Botteghe Oscure'. Our best efforts have yielded no information about him.

SOCHI RAUT ROY joined the nationalist movement and served terms of imprisonment in the British regime. He has published some ten volumes of verse and participated in international seminars in America and Australia. He lives in Calcutta and has published poems in Bengali.

IVAN IVANJII was put in a concentration camp during the Second World War. He has published two collections of poems and one novel.

VESNA PARUN was born at Zlari, in 1922. She was educated at Split and Zagreb and has published two volumes of verse. Her poem, like that of Ivan Ivanji, was sent to 'Kavita' by a former official of the Yugo-Slav embassy in India. We have not been able to trace the names of the translators.

SAMAR SEN was born in 1916 and published his first book of poems in 1936. His handling of the prose-poem and his Marxist leanings influenced other poets, but he ceased writing poetry when still young. His present home is Moscow where he is employed as translator from Russian into Bengali.

GOPAL BHAUMIK has edited a magazine and published collections of poems. He works as Public Relations Officer to the Government of Bengal.

NARESH GUHA'S first volume of verse was widely appreciated; his second is awaiting publication. He is now in the United States on a Fulbright award.

ARUNKUMAR SARKAR, like Nareesh Guha, represents the middle generation of the modern Bengali poets, and is noted for his metrical skill. He has written appreciations of his immediate predecessors. His hobby is to organise literary festivals.

HANS EGON HOLTHUSEN continues the great tradition of German lyric poetry at a time when all foundations have been made questionable by the last war. Passages in his poems are often reminiscent of Rilke's 'Duino Elegies'. His first novel has appeared in an English translation under the title, 'The Crossing'.

GEORG VON DER VRING is the only living German poet who participated in the literary movements of the last 60 years. His work is many-sided and he has recorded in verse his experience as a soldier in the First World War and a prisoner in America. In 1942 he published 'October Rose', a collection of lyrics written in a simple and individual style.

INGEBORG BACHMANN belongs to the generation that began writing during and after the last war. The desolation and insecurity of the times are the keynote of the two volumes of verse she has published.

GUENTER EICH was born in 1907 and is the boldest poet of his generation. His two most startling volumes were published in the late nineteen-forties. In them a shattered world is put together through the invention of original ciphers. But in his latest collection the ciphers themselves are in jeopardy.

HORST LANGE'S most famous collections describe the landscape of Silesia where he was born in 1904. His poetry is 'elemental' and verges on mysticism.

WERNER REHFELD belongs to a group of young authors who are disposed to both poetry and academic research. His doctoral thesis on Kafka was followed by a critique of Thomas Mann. His present home is Calcutta where he teaches German at three different institutions.

RAMENDRAKUMAR ACHARYA CHAUDHURI will soon bring out his first collection of poems. He teaches English in a college near Calcutta.

RABINDA GUHA is an entertaining columnist and has published two books of poems. He is engaged on a book on the Bengali theatre of the nineteenth century.

SYED SHAMSUL HUQ lives in Dacca and belongs to a promising young group of East-Pakistani poets.

SUNIL GANGOPADHYAY edits 'Kritivas', a poetry-magazine.

ALOK SARKAR writes in a highly individual idiom and is connected with 'Shatabdisha', an organ of young poets.

ALOKEBANJAN DASGUPTA, like Alok Sarkar, has rebelled in content though not in form against the rebelliousness of the preceding generation. He teaches in the department of Comparative Literature, Jadavpur University.

JYOTIRMOY DATTA, like the three preceding him, belongs to the youngest generation of Bengali writers. His verse and critical prose have appeared in 'Kavita'.

MEENAKSHI MUKHERJEE studied English literature at Patna University and teaches in a women's college in Patna. This is her first appearance in print.

SUJIT MUKHERJEE says he has two passions: literature and cricket. His translations from Bengali poetry have appeared in American and Australian magazines. He lives in Patna, where he teaches English literature.

LILA RAY is American by birth, Indian by nationality, and Bengali in her way of life. She wrote a short history of Bengali literature in collaboration with her husband, Annadasankar Ray, a noted Bengali novelist. Her three translations from the Hindi were previously published in 'The Indo-Asian Journal'.

V. RAMAN UNNI is a sub-editor of 'Matribhumi', a leading Malayalam daily.

RAJESHWARI DATTA, wife of Sudhindranath Datta, was born in the Punjab and educated at Lahore and Santiniketan. She is a distinguished singer of Tagore songs and knows three Indian and four European languages.

NIKOLAUS KLEIN is an Indologist who teaches German at the German-Indian Association, Calcutta.

কবিতা

বর্ষ ২১

বর্ষ ২২

ও

বর্ষ ২৩-এর

সম্পূর্ণ সেট

পাওয়া যাচ্ছে।

বল মূল্যবান কবিতা

অনুবাদ-কবিতা

ও

প্রবন্ধের সংগ্রহ।

প্রতি সংখ্যা ১০

প্রতি সেট পাঁচ টাকা

মানুস্ক স্বত্ব

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আগ্নি, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আখিনে বর্ধারত, বংসরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা এক টাকা, বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড জাকে ছয় টাকা, ডি. পি. স্বত্ব।
* বাৎসরিক গ্রাহক করা হয় না।
* চিঠিপত্রে গ্রাহক-নথরের উত্তর অবশ্যিক। * টিকানা-পরিবর্তনের খবর দরূ ক'রে সঙ্গে সঙ্গে জানানো, নয়তো অগ্রাধ সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না।
অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়।
* অমনোনিষ্ঠ রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত টিকানা-লেখা থাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার প্রতিসিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি জাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার টিকানা:



কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এডিনিউ

কলকাতা ২২

গত ২৫ জুন ১৯৬০, শনিবার প্রত্যুষে (হিন্দু মতে ১০ আষাঢ় ১৩৬৭ শুক্লাবার রাত্রিকালে) স্বধীন্দ্রনাথ দত্তের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে। আমরা 'কবিতা'র একটি স্বধীন্দ্রনাথ-স্মৃতিসংখ্যা প্রকাশের আয়োজন করছি।
'কবিতা'র এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'মৃত্যুর সময়' বাংলা ভাষায় তাঁর শেষ সমাপ্ত রচনা।

বরিস প্যাঁটে র্না ক

(১৮৯০-১৯৬০)

নোবেল প্রাইজ

আমি যেন এক খাঁচায় বদ্ধ জন্ত।
বৃহৎ, স্বাধীন আলোকে আনন্দিত
আজো কোনোখানে রয়েছে মানুষ—কিন্তু
আমি পরিত্রুত শিকারির পদশব্দে।

যন অরণ্যে, আঁধার হ্রদের তীরে
আমি পড়ে আছি লুপ্তিত এক বৃক।
কোন পথ নেই।—নেই ? তবে তা-ই হোক।
চলুক সুপয়া, শরনিক্ষেপ তীক্ষ্ণ।

কিন্তু বলো তো কী আমার ছুড়তি ?
আমি কি দহ্য ? অথবা পিশুন ধৃত ?
মাতৃহুমির রূপের পুণ্যবৃতি
জাণিয়ে, যে-আমি জগতে করেছি আর্ত ?

তবে তা-ই হোক !... কবর অধুবর্তী,
এবং স্বপ্নে ছর্ব্বর বিবাস
যত না ভীষণ ঘনাক সর্বনাশ
একদিন জগী হবে মলমলবৃষ্টি।

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বহু

রাজশেখর বহু

[জন্ম : ১৮ মার্চ, ১৮৮৮ ; মৃত্যু : ২৭ এপ্রিল, ১৯৩৫]

কোনো-এক দেশবিশ্রুত অধ্যাপক কর্তৃক থেকে অবসর নিচ্ছেন। তাঁর বিদায়-সভায় বক্তৃতা হ'লো : 'ভট্টর ক. হলেন সত্যিকার খাঁটি পণ্ডিত, আজকালকার শৌখিন ডিক্শনারীদের মতো নয় ;—সেই খাঁচা চায়ের পেয়ালার আঙা জ্বিয়ে তাঁদের বিচ্ছিন্নতা'কে একটা ড্রিং-ক্রমের বিনোদন করে তোলেন, তাঁদের মতো একবারেই নয় ইনি ; এঁর পাণ্ডিত্য এতই খাঁটি যে এঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে গেলে তাকে বসতে বলাবও এঁর সময় হয় না, চায়ের পেয়ালার এগিয়ে দেয়া তো দু'বে খাঁকি—'চূর্তা'য় আমাদের, এই ধরনের পণ্ডিত ব্যক্তি ও তাঁদের ভক্তদের সংশ্রব সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা হয়তো সম্ভব হয় না, কিন্তু সৌভাগ্য এই যে দৈবাৎ দু-একজন প্রমথ চৌধুরী বা রাজশেখর বহুর দেখা পাওয়া যায়, এবং বাংলাদেশে এঁদের বাস লুপ্ত হবে বলেও আশঙ্কা করি না। আমাদের সঙ্গে, ঈশ্বর বোধবার সঙ্গেও, একটা ঘটনা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি : একবার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্য ভোগ করে এতই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে কিরে এসে, কিছুটা সোচ্ছাদে, তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা না-জানিয়ে পারিনি ; আমার চিরিত 'সৌজত' বা 'কৌলী' শব্দের ব্যবহার ছিলো। রবীন্দ্রনাথ যে-উত্তর লিখলেন তার শেষ বাক্যটি এই : 'এক আমরা সৌজত বলিনে, বলি মহত্ব'ই' মনে আছে ঈশ্বর ব্যক্তি হয়েছিলাম বাক্যটি পড়ে—না-হ'য়ে পারিনি ; আমার আনন্দনিবারণ বেনে প্রতিষ্ঠ হ'য়ে কিরে এলো। তারপর অনেক বছর কেটে গেলে, কিন্তু ঐ বাক্যটি শ্রাব্যি ভুলতে পারিনি, এবং এতদিনে এও বুঝছি যে রবীন্দ্রনাথ সভ্য বলেছিলেন। বাক্যে আমরা সৌজত বলি, বলি আভিধেরতা, তা কোনো আলাদা, বাক্য-ভুল-রাখা, ছুটির দিনে বের করার মতো পদার্থ নয়—তা যদি হয় তাহ'লে তার ব্যাধি নেই—সেটা মানুষের মৌলিক মহত্বেরই একটা বিজ্ঞরণ।

অথচ এই মহত্বব বস্তুটি এত বিরল যে কোথাও তার স্পষ্ট কোনো প্রকাশ

দেখলেই আমরা ভুল করে তার নাম দিয়ে ফেলি 'সৌজত' বা—এমনকি—'আভিজাত্য'। কিন্তু সত্যি কি ভুল এটা ? মহত্ব যদি সেই গুণ হয় বা অবিকাংশ মানুষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, তাহ'লে—অন্তত বাক্যগুণের সংগতিরক্ষার খাতিরে—তার জ্ঞত অত কোনো নাম উচ্চারণিত হওয়া কি উচিত নয় ? আর সেই চেষ্টাই কি আমরা করি না—যখন কোনো মানুষের মধ্যে মহত্বের বীজি দেখতে গেলে তাকে আমরা হৃদয় বিশেষণে সূচিত করি ?

অনেক মানুষ আছেন, খাঁচা তাঁদের গতির জোরে প্রতাপশালী। যে-আসনে তাঁরা বসেছেন তা চলে গেলে, যে-খন তাঁরা ব্যবহার করেন তা কোনোক্রমে লুপ্ত হ'লে—তখন আর তাঁরা কেউ নয়। তাঁরা নিজেরাও তা জানেন ; আর সেইজন্য সেই ধনের বা আসনের উপর তাঁদের মর্যাদিক আসক্তি দেখা যায়, আর আশে-পাশে যাঁরা থাকে বা তাঁদের সান্নিধ্য বাদের আসতে হয়, তাদের সকলকেই তাঁরা টের পাইয়ে দিতে ভালোবাসেন তাঁরা কত বড়ো ক্ষমতাপালী পুরুষ। এঁরাই তাঁরা, খাঁচা পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে হ'লেও সান্নাৎপ্রার্থীকে এক-আধ ঘণ্টা বসিয়ে বা ঠাঁড় করিয়ে রাখতে কিছুই মনে করেন না ; খাঁচা এত ব্যস্ত যে কিছুই জ্ঞত কোনো সময় নেই ; যা তাদের অব্যবহিত বার্ষপস্পৃক্ত, তার বাইরে জগৎটার বেনা অস্তিত্বই নেই তাঁদের কাছে।—কিন্তু অত কোনো-কোনো বিরল মানুষ আছেন যাদের মূল্য তাঁদের ধনে বা আসনে নয়—তাঁদের নিজেদেরই মধ্যে ; যদি সাংসারিক অর্থে তাঁরা কিছুও না হন তবু যে তাঁরা বিশেষ-কিছু তা, আশ্চর্যের বিষয়, সাংসারিক ব্যক্তিকেও শেষ পর্যন্ত মেনে নিতেই হয়। এই ধানের অন্তরে কিছু সম্পদ আছে, তাঁদের ব্যক্তিবৃত্তাব বিভিন্ন ও বিচিত্র হ'লেও তাঁদের সকলের মধ্যেই মহত্বের একটি সহজ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

বহুকাল আগে, কোনো কালে, বেদন কেমিকালের অ্যালবার্ট রিডিং-এর দপ্তরে আমাদের একবার যেতে হয়েছিলো। প্রয়োজন হ'লো কর্ণ-মিচিগের সঙ্গে দেখা করার। নাম পাঠিয়ে দেবার আধ মিনিটের মধ্যে তাঁর কামরায় ডাক পড়লো আমরা, ডেড মিনিটের মধ্যে কাজটির সমাধা হ'য়ে

গেলো। কিন্তু ঐকুই সময়ের মধ্যেই সেই সাহিত্যিক-কর্মপট্টিবের চারদ্বার আমি অন্বেষণ করেছিলাম : শালা খন্ডের গলাবন্ধ কোট-পরা-প্রৌঢ় তিনি, মুখের ভাবটি প্রথমে একটু কঠোর মনে হয়, যাকে বলে 'কাজের-লোক'। লেইরকম তাঁর ধরনাবান, কিন্তু ওরই মধ্যে প্রচ্ছন্ন অল্প কিছু 'মিলিক' মিচ্ছে—তাঁর স্বভাবের গভীরতর কোনো উদ্ভাস যেন। দেখে চমৎকৃত হলাম যে অশাশ্বতের খাতায় পরিষ্কার বাংলা হরফে তিনি স্বাক্ষর করলেন। সেই প্রথম রাজশেখর বহুকে চোখে দেখলাম।

পরে, মাঝে-মাঝে তাঁর বহুলবাগানের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যা সময় কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, ভালো লাগতো বলেই। তিনি প্রেরণা থেকে নেমে আসতে দেবির কয়তান না, প্রায় সন্ধ্যা-সন্ধ্যাই চা পৌঁছতে। কখনো জিগেস করতেন না অভিযোগ ইচ্ছুক কিনা, কেউ না খান তো 'না-ই' যাবেন, কিন্তু পরিবেশই হওয়াই চাই। এই ব্যাপারটা আমার মতে তুচ্ছ নয়, এতে মনের একটা বিশেষ ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়; 'চার অধ্যায়ের' অন্তর মূখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন জেষ্ঠ্য বা ব্যঙ্গনা, এটিক তাই। ভক্তির জন্মনাম বলেছিলেন : 'বে-ভাবে প্রবেশ করলাম ত্রিক সে-ভাবেই বেরিয়ে এলাম—মাঝে একপাখি চা বা লেমনজও অস্তর হ'লো না—এমন বাড়িতে কখনোই কারো যাওয়া উচিত নয়।' আর এই কথাটিকেই ভাবের স্তরে উন্নীত করে রবীন্দ্রনাথ কি বলেননি?—'যাকে আমরা হৃদয় দিতে পারি না তাকেও আমাদের কিছু দেবার আছে।'।

আকারে-প্রকারে কিছুই মিল নেই, মনের দিক থেকে বরং দূস্তর ব্যবধান দু-জনের মধ্যে, তবু রাজশেখর বহুর সঙ্গে ব্যবহারকালে রবীন্দ্রনাথকেই আমার বার-বার মনে পড়েছে। অসংখ্য বার পত্রাঘাত করেছি তাঁকে—করতে হয়েছে—বাংলা ব্যাকরণ, বানান, উচ্চারণ বিষয়ে খুঁটিনাটি-প্রশ্ন বা ভুল : বিভ্রান্তির উত্তর এসেছে, যেমন এককালে গাভিনিকেতন থেকে অসংখ্য সত্যো, কখনো কোনো ভুল বিষয়েও; নিরাশ করেননি। এই জেলা স্কেনিং, বর্ধন 'মেঘদূত'-অনুবাদের টাকা রচনা করছিলেন, হাংগে-হাংগে এগোতে হচ্ছিলো।

আমাকে; পূর্বে-পূর্বে আমার শাশয় তিনি ভগ্নন করেছেন, কত তথ্য, কত উপকারী নির্দেশ, এবং আমার অজ্ঞতা বিষয়ে তাঁর সহিষ্ণুতা—এই সবই আজ আর-একবার কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তাঁর চিঠি ছিলো পড়তে ভালো, চোখে দেখতেও কম ভালো নয়—তাও রবীন্দ্রনাথের মতো—এক-একটি পোস্টকার্ডও তাঁর হস্তাক্ষরের গুণে নয়নাভিরাম : নির্মল ও নিষ্কটক; পংক্তিগুলো সমান; কয়েক মিনিটের সাহসে মনোনিবেশের প্রতিচ্ছবি। রাজশেখরের হাতের লেখা ছিলো সাবেকি বিশিষ্ট হাঁদের, অক্ষরগুলোর ধরন একটু স্বল্প, তাঁদের স্পষ্টতা অসামান্য—তা একবারেই রাবীন্দ্রিক নয় বলেই রাবীন্দ্রিকের সঙ্গে তুলনীয়। আর, রবীন্দ্রনাথের চিঠি যেমন উজ্জল ও বর্ণিত, তাতে যেমন বোঝা পেছে কোনো সাধারণ কথাকেও কত মনোমুগ্ধকর করে বলা যায়, অলংকরণের কী অসীম সজ্ঞাবনা ভাষার মধ্যে নিহিত হ'য়ে আছে, তেমনি রাজশেখরের চিঠিতে দেখছি ভাষা কত পরিমিত ও পরিচ্ছন্ন হ'তে পারে, কত অল্প কথায় সব কথা বলা যায়, অথচ সৌহার্দজনিত উদ্ভূত কিছু থাকে না তাও নয়। রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে সব সময়ই কিছু উপরি-পাওয়া জটতো আমাদের, আর রাজশেখরের চিঠি যেন আক্ষরিক অর্থে যথেষ্ট—একটু বেশি নেই তাতে কিন্তু একফোটা কমতিও নেই; আর এই নিরাভরণ সৌষ্ঠবেও ভাবি একটি তৃপ্তি আছে আমাদের।

বলতে হচ্ছে করে বাংলাদেশের বিশ শতকে রাজশেখর বহু যেন রাসিক মানসের প্রতিভা, ইলাওর আঠারো-শতকি লক্ষণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ—শুষ্কতা, ভাবসাম্য, মাত্রাজ্ঞান, মনঃস্বরসিদ্ধি; তাঁর পথ 'আবেগের নয়, বুদ্ধির; তাঁর লক্ষ্য স্বর্ণময় নয়, 'স্বর্ণময়'। এই সব গুণের সমিগ্ধতা কিছু পূর্বে প্রমথ চৌধুরীতেও রাখেছিলো, কিন্তু কিছুতেই বলা যাবে না যে এই দু-জনের এক দেবতা গড়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিবাদের সঙ্গে মিশেছিলো তাঁর কৃষ্ণাগরিক ব্যঙ্গপ্রিয়তা ও ভারতচন্দ্রীয় শব্দবান্দন; পাঠককে ছুড়ে-ছুড়ে চমকে দিতে চেয়েছেন তিনি; তাঁর বৌদ্ধ ছিলো—স্বরাশ্রিতের মতো—নিটোল নির্মল বাক্যগঠনের দিকে, প্রত্যেকটিতে চেঁছে-ছুলে কবির মতো

ছিপছিপে আর ধারালো ক'রে না-তোলা পর্বত খামতেন না—সেজ্ঞে রচনার প্রবাহকে স্বভাব্যত করতে রাজি হতেন—একবারে পুরোদস্তুর শিল্পী তিনি, প্রায় শিল্পবিলাসী। আর রাজশেখর বহু—যিনি নিজেকে 'আধা-মিশ্রি' আধা-করানি' বলে ভাবতেন, যিনি মধ্যবয়সে মুহূর্তে সাহিত্যে প্রবেশ ক'রে, তারপর দিনে-দিনে, ধীরে-ধীরে, আমাদের মাতৃভাষার প্রধান নির্ধারক ও অভিভাবক হ'য়ে উঠলেন, জীবনের শেষ দিন পর্বত সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সংসর্গ এড়াতে পারলেন না—তার রচনার প্রধান গুণ একটি সরস গাষ্ঠীর্ণ বা সংযত সজ্জলতা; তাঁর বাক্যবিজ্ঞান সরল, অর্থবোধ অনবরত অব্যাহ, কোনো শিল্পমত্ত কপটতা না-ক'রে তিনি যে তাঁর সংবাদটিকে সরাসরি পাঠকের কাছে পৌঁছিয়ে দেন এটাই তাঁর সবচেয়ে বড়ো চাভুরী। প্রথম চৌধুরী বলতেন : 'সাহিত্য আমার পেশা নয়, নেশা', আর রাজশেখর বলতে পারতেন : 'সাহিত্য আমার পেশা নয়, নেশাও নয়—কাজ।' বিলম্বে যাত্রা ক'রেও তিনি যে সাহিত্যের পথে বহুদূরে পৌঁছেছিলেন, তার কারণ তাঁর সাধু, যিনীত ও পরিশ্রমী স্বভাব; নিষ্ঠা, প্রবৃত্ত ও অধ্যবসায়ের দ্বারা যা লজ্জা তা নিভুলভাবে গ'ড়ে তুলেছিলেন : আমরা চোখের উপর জন্মাতো দেখুন তাঁর 'চন্ডিকার', তাঁর 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'—যে-তিনখানা বই হাতের কাছে না-থাকলে আমাদের এক দণ্ড চলে না আজকাল। আধুনিক চলিত বাংলার প্রতিষ্ঠা—যে-কাজ আরম্ভ করেছিলেন প্রথম চৌধুরী ও স্বরাজ্যনাথ—তা সম্পূর্ণ হ'লো এই আশ্চর্যকর আধুনিক মনের প্রবীণের হাতে; তাঁর 'চন্ডিকা'র পরে তর্কাতীত হ'লো এই কথা যে বাংলাভাষা স্বয়ংপ্রাপ্ত হয়েছে, সঙ্কত ব্যাকরণের অংশাংশে আর সে আবদ্ধ থাকতে পারে না। আর কেমন ক'রে বাংলা, তার স্বাভাবিক বাগ্‌ধারার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যে না-ক'রে, সংস্কৃতের চারুকৃতিকে আয়ত্তে আনতে পারে—হ'তে পারে একই সঙ্গে নির্ভার ও সংযত, পরিশীলিত ও গতিশীল, তসময় ও তত্ত্ব শব্দের সহযোগে শিলাসাগরের মতো প্রাঞ্জল, যথোচিত ও নির্বল, তার কোনো প্রকৃষ্ট উদাহরণ যদি হ'জতে হয় তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই তাঁর 'রামায়ণ' ও

মহাভারতের গুণকে সর্বোৎসাহে স্থাপন করতে চাইবে। এই পুঙ্খমোচিত অনাড়ম্বরতা, এই উজ্জ্বলনাহীন বিনয়ী বৈদম্ব্য—এটাই তাঁর রচনাকে দিয়েছে আশা, এবং তাঁর ব্যক্তিত্বকে স্বয়ং ও শ্রদ্ধা ক'রে তুলেছে।

আমি ভুলিনি যে রাজশেখর বহুর নামান্তর 'পরশুরাম', আর যা লিখে প্রথম তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন তা কৌতুক বা ব্যঙ্গরচনা। কিন্তু তাঁর 'গড়লিকা'র খ্যাতিতে সঙ্গে তাঁর আজকের প্রতিষ্ঠার কি কোনো দিক থেকেই তুলনা হয়? তাঁর বহুব্যাদে আমরা থাকে পেয়েছি তিনি একজন উৎকৃষ্ট লেখক, আর তাঁর 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষীয় অতীতে নতুন ক'রে প্রাণসঞ্চার করেছে। কৌতুকহৃষ্টির জ্ঞাত তাঁকে সমকালীনকে খতিতভাবে দেখতে হয়েছিলো—তা না-করলে কৌতুক সম্ভব হয় না—কিন্তু তাঁর পুরাণের পুনর্লিখনে অতীত সমগ্রভাবে সঞ্জীবিত হ'লো; আগামী পঁচিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত—যতদিন না আবার কোনো প্রতিভাশালী অল্পবয়স দেখা দেয়—রামায়ণ মহাভারত বলতে শিকিত বাঙালি হয়তো তাঁর গ্রন্থ দুটিকেই বুঝবে। সেই সমগ্রভাবোৎসাহ ব্যঙ্গরচনার সঞ্চার করতে হ'লে যে-সব গুণ বা দোষের প্রয়োজন হয়—যেমন বিবমিষা, অস্বতর্কীয়, আদর্শের প্রতি আশ্রয়, অসন্তোষের জ্ঞাত আকাজ্ঞা—সেগুলো ছিলো 'পরশুরামের' পক্ষে অস্বভাবী, আর সেইজন্মেই তাঁর কৌতুক এমন বিস্ময় ও সর্বজননের পক্ষে স্পষ্টিকর। তিনি, বাঙালি লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে কম যিনি পাগল, সবচেয়ে বেশি বীর মাতা ঠাণ্ডা—যেমন একদিকে তিনি রোমাটিকদের পরপারে, তেমনি ভাবোদার হুইকট অথবা আদর্শবিশ্ব ভলন্তেরারের যজ্ঞাণ্ড তাঁর জগতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। হয়তো—ঠিক বলতে পারবো না—ঐ রকম জালাময় বিজ্ঞপ আচারের মৌলিক স্বভাবেরই বহিষ্কৃত; অস্বতর্কপক্ষে এতকালের মধ্যে বাংলা ভাষায় একটিও 'ইউটোপিয়া' উপন্যাস রচিত হয়নি; এবং বহুসংখ্যক রাজশেখর পর্বত বাবা ব্যঙ্গরচনা হাতে দিয়েছেন তাঁর সকলেই, শেষ পর্যন্ত, এই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন বা সমন্বয়। মাহুষের ছোটো-ছোটো দুর্বলতা নিয়ে পরিহাস করেছেন তাঁর, সমাজের

কোনো-কোনো ক্রটির বিচ্ছিন্নভাবে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু সমগ্রভাবে সমাজজীবনে বা মানববৃত্তাবে রূপান্তর আকাঙ্ক্ষা করেননি। প্রথম চৌধুরী একবার লিখেছিলেন : 'মাছ খাওয়া ব'লে দুখ করি না, মাছ খে ছাংবী ব'লে মন-খাওয়া করি'; অথচ, মাছ খে খাওয়া এই অতি সাধারণ সত্যটা অসহ্য হয়ে না-ওঠা পর্বত বিজ্রপের জ্বনি উর্বর হ'তে পারে না।—কিন্তু যা হয়নি তা কেন হয়নি, এই দুর্বকল্লা আমার অভিপ্রায়ের বাইরে, আপাতত এ-কথা ভেবে দুখ না-করা অসম্ভব যে কৌতুকরচনায় পরন্তুসার উদ্ভারাকারী বাংলা সাহিত্যের দিগন্তে এখনো দেখা যাচ্ছে না।

'কবিতা'র এই সংখ্যা থেকে আসুরা বানানে একটি প্রয়োজনীয় নূতনত্বের প্রবর্তন করলাম : ইংরেজি '২' ব্যঞ্জনের স্থলে 'ক্ল' ও ফরাসি 'j' বা রুশীয় 'zh'-এর স্থলে 'জ' অক্ষর ব্যবহার করা হ'লে, ভবিষ্যতেও তাই করা হবে। ধারা 'কবিতা'র লজ্জা রচনা পাঠ্যেই তাঁরা পাণ্ডুলিপিতে এই বানান ব্যবহার করলে আমরা বাহিত হবে।—সম্পাদক।

মৃত্যুর সময়

(হান্স এগন্ট হোলটহুজেন-এর জার্মান অবলম্বনে)

স্বদেশনাথ দত্ত

আজও তবু পৃথিবীই আমাদের চোখ জুড়ে আছে।
আরও আছে হেমন্ত—সন্ধান উৎসব ও অনাগত
কালের শোণিতে, এবং প্রচুর পড়ে পীতাম্বর
প্রাঙ্গণপাদপ। অতএব একবাক্যে সকলেই
বলি, কী হৃদয় উদ্বল বিহার! এবং যে-শিশু
উপনীত বর্ষচতুষ্টয়ে, বর্তমান মুহূর্তে সে
পায় যে-আশা, তা সদা লোভাবে, কিন্তু ধরা দিয়ে
খেল মেটাবে না : হেমন্ত ও অবস্থিতি, এ-নিবাস
যার অবলম্ব ধরিত্রীর ঘূলি, ভূপঙ্খরে ঠেকে
জীবনযাপন, তথা নিঃসর্গের সচিহ্ন জাতক—
পার্বত্য প্রদেশ, মালভূমি, উপত্যকা বাসুকায়
আমর, অথবা মসিবিবু উজ্জল সৈকতে, আলো
শিলা, ভূর্জ, জ্বনিপার, রিত্ত পথ প্রান্তরে তির্যক,
পশমের কালো মোজা দানীর ছ' পায়, বহির্বাসে
ছাপের উৎকট দ্রাব... বরষের এই তো শৈশব।

আশুবর্ষী ধারাপাত সমাপ্ত ক্রমশ নিঃগমন
সুপ্রভাতে, সর্বদলে ক্ষয়ের মাধুরী, দিহ্মণ্ডল
প্রভাসের কার্তিক-আনন্দ, আরিয়াদনি-ঐশিষ্ট,
মোৎসার্তের স্বরধর্মগীত—আবর্ত কোমল হয়ে,
সনে সনে সোনা ; এবং এ-হেম দিনে স্থানান্তরে
সে-যুবতী, যার চিঠি পেয়ে উত্তর দাওনি ছুটি,

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৬

নিজেকে নিক্ষেপ করে রাতার প্রান্তরে, আলিশার
নিষেধ না মেনে। কেউ কি সন্ধান রাখে আকাশের
রং সে-সময়ে চটে গিয়েছিল, কাচের আঁড়ালে
একে একে হাউহিম জ্বালনার শাবি ঢেকেছিল
হতভঙ্গ মুখ? কেউ জানে কেন বিশেষত আজ
রবিবারে প্রহত হিরণ্যগর্ভে মৃত্যুর মাদল?

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩

জিতাপোর কবিতা

বরিস পাস্টেরনাক

হ্যামলেট

কান্ত কলরোল। আমি বেরিয়ে আসি রদমকে।
দরজার খুঁটিতে হেলান দিয়ে
দূর প্রতিধ্বনি থেকে আশ্বাস ক'রে নিতে চাই
আমার আয়ুষ্কালের আসন্ন ঘটনাগুলিকে।

হাজার দূর্বীনের দৃষ্টির ধারে-ধারে
আমাকে তাক ক'রে আছে রাতের অন্ধকার।
আশা, পিতা, যদি সম্ভব হয়,
আমার এই পাত্র হোক হতভরিত।

তোমার কঠিন পণ ভালোবাসি আমি,
আমার ভূমিকার অভিনয়ে আমি সম্মত।
কিন্তু এবার এক ভিন্ন পাত্রা শুরু হ'লো;
এই একবারের মতো দাও আমাকে নিষ্কৃতি।

কিন্তু অরঙলির পারস্পর্য অনড়
আর পথের শেষ আমাকে মুক্তি দেবে না;
নিসঙ্গ আমি; সব ভূবে পেলো ধর্মাত্মের শর্ততায়।
মাঠ পেরোনোর মতো সহজ নয় বেঁচে থাকা।^১

১ রুশীয় প্রবাদ

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৬

মার্চ

বৌদ্ধে ঘর্ষাজ পৃথিবী,
বনের খাৰ উদ্ভাদ প্রাণে ফেটে পড়ে,
বশন্ত—ই দোহান্ত গয়লানি—
তার ছুই হাতে ফেনিয়ে ওঠে কাঁজ।

বোপা নীল শিরার মতো ছোটো-ছোটো ধারায়
ভুবার খাচ্ছে ফ'য়ে,
এদিকে গোয়াল-ঘরে বাড়ন্ত প্রাণ ধুইয়ে ওঠে,
শাবলের দাঁত খাচ্ছে আবে ধারালো।

এই সব রাত, এই সব রাত্ৰি আর দিন :
হুপুৰবেলা জানিলায় বৃষ্টির বাঁজনা,
ছাদে বয়স-গনার হালকা টপটাপ,
নিদ্রু ম'ঝাণ্ডলির বন্ধুনি।

সব-কিছু উদ্বুদ্ধ—আন্তাবল, গোয়াল।
পায়রাগুলো ছোলা খুঁটেছে বরকে।
এই যে টাটকা হাণ্ডার পদ্মবাণ পোবর—
সে-ই অপরোধী, সে-ই প্রাণদাতা।

শহরে গ্রীষ্ম

আধো গলার কথাবার্তা।
সম্পূর্ণ চুলের গুচ্ছটি

১৬৬

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩

ঘাড়ের উপর থেকে তুলে নেয়া হ'লো
কিপ্র ভঙ্গির চয়কে।

ভারি চিকনির ভলা থেকে
এক হেলমেট-পরা মারী সতর্ক চোখে তাকায়,
বিহুনি-করা চুলের বোঝা হস্ত
মাথাটি তার পিছনে-হেলানো।

বাইরে, তপ্ত রাত
ঝড়ের দেয় সংকেত,
রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে লোকেরা-
জন্ত পায়ে বাড়ির দিকে।

মেঘের গুফগুফ ভাক
ছোটো, প্রতিধ্বনিতে তীব্র ;
জানিয়ার পরীটাকে
ছলিয়ে দেয় হাণ্ডার।

শব্দ নেই,
গুমেটি-
আকাশটাকে তলসি ক'রে ফেরে
বিহ্বালের আঁড়ল।

আর যখন উষায় ভরপুর হ'য়ে
উত্তপ্ত সকাল।

১৬৭

কবিতা
১৮৩ ১৩৬৬

বাক্সির বর্ণনের পর
রাতার ধোমলের জল নিয়েছে শুকিয়ে,

তখন, আত্মিকানের, হৃগতি,
ফুলন্ত লেবুগাছগুলো
জুড়ুটি করে
রাখে তাদের ঘুম হয়নি ব'লে।

হাওয়া

এই আমার অবদান, কিন্তু তোমাকে আরো বাঁচতে হবে।
হাওয়া, কানায় আর নালিশে নিরন্তর
কাঁপায় বাড়ি, ছলিয়ে দেয় অরণ্য—
প্রত্যেকটা পাইনগাছকে আলো! ক'রে নয়,
মব গাছ একসঙ্গে
এ সম্পূর্ণ শীতাহীন হ্রদে বৃষ্টি ছলিয়ে দেয়
যেন মারি-মারি পালের জাহাজ
উপশাগরের তুবান পেরিয়ে নোঙর ফেললো বন্দরে।
কেন কাঁপায়? লক্ষ্যহীন অক্লেশে?
না কি কোনো ক্ষতি করার জন্ম?
না—ও যে নিজেই সন্তপ্ত, তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে
তোয়ার জন্ম এক ঘুম-পাড়ানি গান।

বিয়ে-বাড়ি

আত্মিকার প্রান্ত পেরিয়ে
এসেছে দলে-দলে অতিথি,

১৩৮

কবিতা
বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩

কনের বাড়িতে ভোর অবধি
হুঁত করবে ব'লে।

বাড়িওয়ার বনাতে ছাওয়া দরজার শিছনে
গালগল্পের টুকরো
একটা থেকে সাতটা পর্যন্ত
শান্ত।

কিন্তু ভোরবেলা
বখন মনে হয় অনন্তকাল ঘুমোনো যায়,
তখন, বিয়ের আসর থেকে বেরিয়ে,
হার্ভোনিয়ম বেজে ওঠে আবার।

গাইয়েটি আবার দেয় ছিটিয়ে
হাততালির কোঁচায়া,
পাখরের মালাব বনমালিনি;
পুনো দলটি মেতে ওঠে হুয়ায়।

যারা ঘুরিয়ে আছে তাদের বিছানায়
উৎসব থেকে ছিটকে
কেটে পড়ে নাচের হ্রদ, কথার বকবকি—
আবার, বার-বার।

তুবানের মতো শাল। একটি নেয়ে
ময়ূরের মতো নরম চ'লে আসে

১৩৯

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৬

সারি-সারি ভিড়ে, শিশু দেবার আওয়াজের মধ্যে,
আমি নিতম্ব ছলিয়ে।

মাথা ঝেঁকে,
ভদ্রি তুলে ডান হাতটিতে,
নাচতে শুরু করে দেয় শানের উপর
ময়ূরের মতো।

হল্লা, খেলা, হুজি, থেমে যায় হঠাৎ;
নাচের টিপ-টিপ তাল
যেন তলিয়ে যায় পাতালে,
যেন জলের মধ্যে ডুবে যায়।

উঠানে গোলমাল উঠছে জেগে;
কথাবার্তা,
হাসির দমকের মধ্যে,
মিশে যাচ্ছে কেজো শব্দের প্রতিধ্বনি।

ধূসর-নীল ঘূর্ণিহাওয়া উঠলো;
এক বাঁক পায়রা
খোঁপ থেকে উড়াল দিয়ে
উঠে গেলো নীমাস্ত্রহীন আকাশের উচুতে।

যেন কেউ, যম থেকে উঠে,
ওদের পাঠিয়ে দিলে

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩

বর-কনের পিছন-পিছন
অনেক, অনেক বছরের আয়ু কামনা করে।

আর জীবন মানে তো একটি মুহূর্ত শুধু;
শুধু অত্নদের মধ্যে
নিজের এই গঁলে বাওয়া,
যেন উপহারি দিচ্ছি ওদের কাছে—নিজেকে;

শুধু এই বিয়ের রাতি
সব ক-টা জানলার মধ্য দিয়ে রাস্তা থেকে বিফোরিত,
শুধু এক গান, এক স্বপ্ন,
এক ধূসর-নীল পায়রা।

পৃথিবী

মহৌর বাড়িগুলোর মধ্যে
কেটে পড়ে অবাস্তবভাবে বসন্ত।
কাপড়ের আলমারির পিছনে পাখা ঝাপটায় পোকায়,
চলে গুড়ি মেয়ে-গমিকালের টুপিগুলোর উপর।
লোমশ কোটিগুলোকে ট্রাকে তুলে রাখা হ'লো।

কাঠে তৈরি^১ দোতলা-ভেতলার জানলার
টবে ছুটলো লবদ-ফুল, দেহাল-ফুল,

^১ মহৌর অনেক বসন্তায়িত একতলাটা পাথর, আর উপরের তলাগুলো কাঠে তৈরি হ'তো।

কবিতা

চৈত্র ১৩৩৬

ঘরে যেন নিখাস ফেলছে সন্ত খোলা হাওয়ার মাঠ,
চিনেকোঠীয় ধুলোর মতো গন্ধ।

রাপসার্চোথ জানলাগুলোর সঙ্গে
মিতালি পাতায় বাস্তা,
শাদা মাজি আর হুঁপাতকে
নদী বেধে দেয় অবিচ্ছেদ বন্ধনে।

শোনা যাচ্ছে বাড়ির মধ্যে গলিতে
বাইরের কথাবার্তা, ব্যস্ততা,
আর গলমান বরকের কোঁটা-কোঁটা জলের সঙ্গে
এপ্রিলের গল্প আর মস্তুর।
মাল্লদের দুখের হাজার বার্তা জানে এপ্রিল,
বেড়ার গায়ে-গায়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে নেমে
সন্ধেবেলাটা রটিয়ে দেয় সেই কাহিনী।

খোলা হাওয়ার, ঘরোয়া আরামে
আঙুন আর অখতির মিশোল চলেছে একই রকম;
সবখানেই বাতাস যেন অস্থির।
চৌরাস্তার, জানলার তাকে,
ফুটপাথে, কবরখানার,
সেই একই উইলো-ডালের কবি,
একই ফুলে-ওঠা শাদা কুঁড়ির প্রাচুর্য।

ভা'লে দিগন্ত কেন ফুরানার কাহা?
পোঁববের গন্ধ কেন ধারালো?

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩

এ কাজে কি ডাক আসেনি আমার
হৃদয় যাতে হতাশ হ'য়ে না পড়ে,
যাতে, শহরের শীমার বাইরে, পৃথিবীর
না মনে হয় নিজেকে, নিঃসঙ্গ?

আর ভাই এই প্রথম বসন্তে
একত্র হই আমি—আমার বন্ধুরা,
আমাদের মিলন ঘন এক ইটিপত্র,
আর সন্ধ্যা মানেই বিবাহ—
যাতে, দুখের ধারা পোঁপনে
তাপ বিতে পারে জীবনের ঠাণ্ডায়।

ইন্ডিয়ান সামার^১

ক্যান্সনের মতো মোটা হ'য়ে উঠলো পল্লব।
বাড়ির মধ্যে হাসি, কাচের বিনিট্রিন আওরাজ।
কুটনো কুটছে ওরা, বেশাচ্ছে বাল, তৈরি করছে আচার,
লবঙ্গ ভোলা হচ্ছে বৈরমে।

অন্যথার খুনহুটি এই সব আঙুন দিচ্ছে ছড়িয়ে,
গড়িয়ে চলে খাড়াই বেয়ে আস্তে—
কাপ্তানে জলা আঙুনের মতো স্বর্ষ
হেজেলের ষোঁপগুলোকে ঝলসে দিয়েছে সেখানে।

১ রোরোপ ও আমেরিকার উত্তরাংশে হেমন্তকালে (পাঁজির মতে ১০ই অক্টোবর নাগার) কয়েক দিন বেশ রৌদ্রের আবহাওয়া চলে; এই দশকালীন অবসানপ্রাপ্তির নাম 'ইন্ডিয়ান সামার'।

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৬

পথ দেখানো থাকে দিকে নেমে গেছে ;
কষ্ট হয় বিপন্ন পাছগুনোর জুত,
আর হেমন্ত—ঐ বুড়ো ছেঁড়া-জাকড়ার ব্যাপারি
সব-কিছু বেঁটিয়ে নিয়ে যে নাশার ফেলছে—
তার জন্তেও কষ্ট লাগে মনে :

কষ্ট হয়, পুঁথিবাটা সরল বলে
(যা-ই বসুক না চালাক লোকেরা),
মুখে-পড়া বোপের জুতও কষ্ট
আর খেতেও কিছু নেই যার শেষ নেই ।

যখন চোখের সামনে সব বাচ্ছ জলে
আর হেমন্তের শাদা বুলকালি
মাকড়শার জালের মতো জামলা দিয়ে নেমে আসে
তখন কষ্ট, কেন তাকিয়ে থাকার কোনো অর্থ নেই ?

বাগানের বেড়া ভিঙিয়ে একটি পথ
বার্চবনের মধ্যে হারিয়ে গেলে ।
বাড়ির মধ্যে জটলা আর হারির শব্দ,
আর দূরে সেই একই হাসি, একই জটলা ।

অগন্ত

টিক তার, প্রতিশ্রুতি-মতো
পরদার কাঁক দিয়ে ডোরের আলো ঘরে এলে,

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩

বাঁকা একটি জাকরান-রক্তের রেখা
ঠেকলে এসে শোফার ।

সূর্যের উত্তপ্ত হলুদে
ছেয়ে গেলে পাশের বন, পাড়াগাঁর বাড়ি,
আমার বিছানা, ভেজা বালিশ,
বইয়ের শেলফের পিছনে দেয়াল ।

মনে পড়ছে বালিশ কেন ভেজা ।
অপ্রে দেখলুম তোমরা আসছো,
একের পর এক, বনের মধ্য দিয়ে,
বিদায় দিতে আমাকে ।

শিথিল ভিড় করে হাটছিলে তোমরা ।
কিন্তু একজনের মনে পড়লে
যে পুরোনো 'পাকির' মতে
আজ, ছুটুই অগন্ত, ঋতুর রূপান্তরের দিন^১ ।

সাধারণত, এই তিথিতে, এক দহনহীন দীপ্তি
টারব-সিরির চুড়া-থেকে ছড়িয়ে পড়ে,

^১ জুলিয়াস সীজার প্রবর্তিত সম্ভাবিত গলিক্সা রোমেরে বহুকাল প্রচলিত ছিলো । কিয়ৎ
যোশো শতকে তাকে গুহস্তর তুলে ধরা পড়ে ; তৎকালীন পোপ ত্রয়োদশ খ্রীস্টাব্দে তার সম্ভাবনামূলক
করেন । রোমান কা্যলিক পেশজবি এই নতুন খ্রীস্টাব্দের গলিক্সা গ্রহণ করতে বৈরি করেনি, কিন্তু
ইংলও ১৭৫২-র আগে তা গীতুত হয়নি, আর রাশিয়া ও পূর্ব-রোমেরপের পেশজবিত্ত তা প্রচলিত
হয়েছে মাত্র বিশ শতকে । জুলিয়াস পালিকে বলে 'পুরোনো' আর খ্রীস্টাব্দের পালিকে 'নতুন' ।

^২ বীণ্ড একবার তাঁর শিরদের সামনে ঐশ্বর্য্য আবির্ভূত হয়েছিলেন ; একে বলে তাঁর
রূপান্তর । এর ঘটনাবলি টারব পর্বত ।

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৬

আর হেমন্ত, কোনো চিরের মতো স্পষ্ট,
সব দৃষ্টি নিজের দিকে টেনে নেয়।

তোমরা চলছিলে ছোটো, কম্পান,
ভিথিরি-নার অন্ডার-বোপের মধ্য দিয়ে,
চলছিলে কবরখানার দিকে, যেখানে আদার মতো লালচে গাছপালা
মধুতে তৈরি পিঠের মতো জলজল করছে।

গাছগুলির শব্দহীন উচ্চতে
আকাশ তাদের মহান প্রতিবেশী;
আর, মোরগের লম্বা টানা কর্তনাদে
দূর ডাক দিয়ে যায় দূরতরকে।

গাছগুলোর কাঁকে-কাঁকে, কবরখানার মাথিখানে গাড়িয়ে
সরকারি পোষতার মতো যত্ন
আমার মৃত মুখের গিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে
মেপে নিলে—কত বড়ো কবর চাই আমার জন্ত।

স্পষ্ট স্তনতে পেলো সবাই
কাছাকাছি, যুদ্ব একটি গলা;—
গুটা আমার অতীত স্বর, প্রবক্তার,
ধ্বংস তখনো স্পর্শ করেনি তাকে

‘বিদায়, ঐ রূপান্তরের
নীল আর সোনালি;

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩

নারীর একটি অস্তিম আদরে কোমল করে তোলা
আমার মরণলগ্নের সব তিত্ততা।

‘বিদায়, আমার কালোত্তর আয়কাল!
বিদায়, নারী, যে-ভূমি যুদ্ধে আহ্বান করেছিলে
অবমাননার পাতালকে।
আমি—আমি তোমার যুদ্ধক্ষেত্র।

‘বিদায় আমার উন্মুক্ত পাখার বিস্তারকে,
উড়ে চলার স্বাধীন প্রতিজ্ঞাকে বিদায়!
বিদায়, স্থগিতশীলতা, অমৌলিক শক্তি,
বাণীর মধ্যে উন্মোচিত বিশ্বরূপ!’

নেশা

উইলো গাছ, আইভিলতার ঘেরা,
ঝড়ের দিনে লুকিয়েছি ডার তলার,
এক চাঁদয়েই দু-জনে রই ঢাকা,
আমার বাহুবন্ধে বঁধা ভূমি।

ভুল হ’লো যে। বোপের গাছগুলো
আইভিতে নয়, কড়া নেশায় ঘেরা।
তাহ’লে, বেশ, চাদরটাকে টেনে
নাও মাটিতে পেতে।

বসন্তের বন্যা

বসন্তের বরফ-গলা প্রাবিতপথ অরণ্যের
মধ্য দিয়ে রাস্তা এক যোড়সওয়ার
উরালে কোন বিজন চবা খেতের দিকে চলছে—
অন্তরাগের আশ্রম তখন মরন্ত।

অধীর ঘোড়া লাগামে করে দংশন ;
পিছনে তার বার্নাগুলো অনেক নালায় ছড়িয়ে গিয়ে
কলধরে ফেনিয়ে তোলে
অশ্বখরের প্রতিধ্বনি।

কিন্তু যখন অথারোহী লাগাম ছেড়ে
মন্দগতি,
বসন্তের বন্যাধারা গড়িয়ে চলে
বজ্রনাথে।

উঠলো হেসে কে যেন, ঐ কান্না কার ?
পাখান-তলে পাখান হ'লো হুঁ।
কম্প ভুলে, ঘুণিহলে এলিয়ে পড়ে
ছিন্নমূল বৃক্ষ।

অন্তরাগের আশ্রম-জালায়
ভালেপালয় করলা-রঙা দিগন্তরে
উঠছে বেজে পাগল নাইটিসেলের
কণ্ঠ, যেন উচ্চকিত দণ্ড।

ঐ যেখানে অশ্রমতী লতা
এলিয়ে বৈধব্য-বাদে খাঁদের ধারে হয়ে পড়ে,
সেখানে তার কণ্ঠে কোঁটে নাটটি বাশি
গলে যেমন ভাকাত-নাইটিসেলের^১।

বলাৎকার ? তবে কি ছুরদুট কোনো,
দুঃখ, জর আসির ?
অরণ্যের ঝোপের ফাঁকে তীক্ষ্ণ এই ছুরদা-গোলা
ছুটছে কাকে হানতে, কেউ জানবে না ?

আগামিরের গুপ্ত বাসার বিশ্বর থেকে বেরিয়ে এসে
অরণ্যের দেবতা ঐ গানের পাখি
দিক না দেখা কৃষক-সেনার^২ পায়ের-চলা, ঘোড়ায়-চড়া
শাশীদলের যুগ্মযুগ্মি।

আকাশ, মাঠ, ধরিজী ও অরণ্য
স্পৃষ্ট এই যান্ত্রিক, স্বপ্ন, বেদনাময় উদ্গাদনায় ;
বিহ্বল ঐ শব্দ তারই সরিষাভ—
আনন্দ, আর বেদনাময় উদ্গাদনা।

শীতের রাত্রি

ছুরার ছেয়ে দেয় পুথিবা
সকল সীমা তার ছেয়ে দেয় ;

১ কৃষীর রূপকথার প্রাচী উল্লেখ।

২ কৃষীর পুণ্যকালীন পারিভাষিক-বাক্যের কথা বলা হচ্ছে। তাদের মধ্যে অবিকার্য ছিলো
চাষি ; যখন-যখনে সুখের মুখে ঢাকাতো তারা।

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৬

টেবিলে অ'লে যায় মোমের বাতি,
টেবিলে অ'লে যায়।

যেমন ঝাঁকে-ঝাঁকে গ্রীষ্মে
আলোর দিকে ছোট কাঁটেরা,
তেননি জানালার নিবিড় ভিড়ে
অমছে ভূবারের পাপড়ি।

হাওয়ার তাড়া থেয়ে আঁকছে
বৃত্ত, তীর ওরা জানালার।
টেবিলে অ'লে যায় মোমের বাতি
টেবিলে অ'লে যায়।

আলোর উদ্ভাস দীলিড়ে;
পরস্পরে সংবিলু—
হস্ত, পদতল সেখানে ছায়া ফেলে,
এবং নিয়তিস্ব স্বপ্ন।

শব্দ ক'রে ছুটো জুতো
চমকে প'ড়ে যায় মেঝেতে।
মোমের ফোঁটা-ফোঁটা অশ্রু ক'রে পড়ে
মাতের বাতি থেকে মাঘরায়।

ধবলকেশ ঐ ধবল ভূবারের
আধারে সব গেলে। হারিয়ে।

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩

টেবিলে অ'লে যায় মোমের বাতি,
টেবিলে অ'লে যায়।

হঠাৎ কোণ থেকে কাপট হাওয়া
হুঁ দিলো বাতিটার আগুনে;
তপ্ত প্রলোভন আগলো দেবদূত,
পাখায় ধূত কুশচিহ্ন।

ক্ষেত্রয়ারি ভ'রে বিরতিহীন
ভূবার পৃথিবীকে ছেয়ে দেয়,
টেবিলে মাঝে-মাঝে মোমের বাতি অ'লে
টেবিলে অ'লে যায়।

অহুবাদ : বুদ্ধদেব বহু

বোদলোয়ারের পাপবোধ ও আমরা

লোকনাথ ভট্টাচার্য

(ক)

প্রথমেই বলতে চাই যে পাঠকের রসিক চিত্তকে আমি কোনো নৈতিক তর্কের মধ্যে বিক্ষিপ্ত করতে চাই না। আমার প্রবন্ধের বিষয় এমন এক কবির কাব্য, যা সমসাময়িকের কঠোর তর্জনী সম্বন্ধে পরবর্তী কালের কণ্ঠপাথরে তার অমান অমর স্বাক্ষর একেছে—জুঝু তাই নয়, সেই স্বাক্ষরকে দিনে-দিনে উজ্জলতর করে তুলেছেন দেশ-বিশেষের বহু পরবর্তী কবি;—এবং তা অভাবনীয় চিন্তা ও অহুত্বের মধ্য দিয়ে নতুন পথের দিগ্‌দর্শন দিয়েছে। বোদলোয়ারের কবিতার আলোচনায় আমাদের পরিচিত প্রচলিত অর্থে ছায়া অথবা অস্তারের, ভালো অথবা মন্দার, পাপ অথবা পুণ্যের কোনো প্রশ্নই ওঠে না; কিন্তু বা এখানে প্রাসঙ্গিক তা আরো অনেক ভিতরের ও গভীরের জিনিস, তার উৎস অজ্ঞানীবন, তাকে বলা যায় সত্যের আন্তরিক ও অন্তঃস্ব নির্ধার; অতুলিত সীমা পেরিয়ে বৈজ্ঞানিক অর্থে তার নাম দেওয়া চলে অধ্যাত্ম অথবা দর্শন। দর্শন বলছি এই অর্থে যে এক পূর্ণ নির্মল দর্পণের মতো তা ব্যক্তির বহুতর অহুত্বকে প্রতিফলিত করে, বিভিন্ন আলো-ছায়ার সমাবেশী দোঁটানার মধ্য দিয়েই। বলা বাহুল্য, সেই অস্তরের নির্ধারিত অধ্যাত্ম অথবা দর্শন বলব না, যদি সে সৌন্দর্যের পথ ধরে প্রকাশিত হ'তে না পারে, অজ হৃদয়ে প্রবেশের পথ বুজ না পায়। তাকে দর্শন বলব তখন যখন সেই ব্যক্তির হন ঝড়া ও শব্দ, এবং পরবর্তী বহু অহুত্বিত হৃষ্টির জনক। এক কথায় যে-সব কবি দার্শনিক—এবং সমস্ত যথার্থ কবিই দার্শনিক—তাদের কাব্য ও দর্শনের এই হ'লে ভূমিকা।

সংক্ষেপে এককথা বলা সহজ হবে যে বোদলোয়ার তৎকালীন ও পরবর্তী কবীরা কবিতায় দিলেন তাঁর পাপবোধ, যদিও তার সবটুকুই একান্ত তাঁর নিজস্ব নয়, তার একটি দুঃখ অংশ তাঁর যুগের দান, যে-যুগে বোদলোয়ার

বাস করেছেন, এবং যে-যুগে আমরা বাস করছি। তবু, যে-অংশটুকু তাঁর নিজের, তারই মধ্যমাগে সেই সমগ্র পাপবোধ একটি দর্শন হয়ে উঠেছে, পেয়েছে একটি অশ্রুতপূর্ব একা ও পূর্ণতা। কবীরা ভাষার প্রতীকী কবিতা—যার ছায়া পড়েছে জগতের অস্তিত্ব বহু বিশিষ্ট সাহিত্যে—তা এই পাপকে দিলো পূর্ণতা; বোদলোয়ারের উৎস থেকে তা নেমে এসেছে আজকের দিন পর্যন্ত, ছুটে চলেছে আগামীর অভিমুখে, অস্তিত্ব তার অনেক অসামান্য লক্ষণে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত আজকের বহু দার্শনিক, সম্পন্ন কবি ও কবিতা। বাংলা কবিতা ও কাব্যসচেতন বাঙালী হুঁদী পাঠকসমাজের পক্ষে এটা আমি বলব একটা গর্বের কথা যে আজ আমরা ক্রমশই জাগ্রত হয়ে উঠছি এই অতি বিশেষধর্মী কাব্যের বিষয়ে তা কবিতাতেও অবশেষে থলে দিয়েছে নতুন জানালা, নতুন দিগন্ত, নতুন অহুত্বিত উদ্ভূত হবার জন্ম আমাদের প্রস্তুত করেছে। পুনরুজ্জীবিত করতে চাই না, তবু বলি ভেরনের, র্যাবো, মালার্বে ও ভালেবির মধ্য দিয়ে কাব্যলক্ষী যে-বিশেষের মুকুট পরানেন, যা এমনকি পরবর্তী ও আমাদের নিকটবর্তী এন্ড্রাসের রাজনৈতিক উত্তরজীবনেও দীপ্যমান, তার উজ্জলতম কাহিনীতে সেই এক ও একমেবাবিধী শাল বোদলোয়ার। এবং কারো যেন নমস্কার করতে ছিঁদা না থাকে সেই গ্রাহেলিকা-শিল্পকে, ধীর প্রজ্ঞা প্রথমে দেখেছিল বোদলোয়ারকে জাগ্রতের প্রথম, কবিরের রাজা হিসেবে। যদিও বাংলাদেশে আমরা ধরেছি এক ধরনের উকী পদ্ধতি যাতে আমাদের কয়েকজন আগে উদ্ভূত হয়েছেন—কেউ-কেউ হর্যেতা দীক্ষিতও হয়েছেন—র্যাবো, মালার্বে বা ভালেবির, এবং যদিও বোদলোয়ার স্বয়ং খাপছাড়াভাবে অনুদিত হয়েছেন কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী কবির দ্বারা এর আগেও, কবীরা প্রতীকী কবিতার উন্মাদিমুখে আমাদের তাঁরখান্ডা আয়ত্ত্ব হ'লে। অতি সম্প্রতি, বুদ্ধদেব বব্বর 'লে রায় দ্বা মাল'-এর প্রায়-সম্পূর্ণ অহুত্বদের সঙ্গে-সঙ্গে। সেই অহুত্বদের আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় নয়, শুধু এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বব্বরকে স্মরণ করি অতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে, যেহেতু এই প্রবন্ধের কাব্য-তাঁর অহুত্বা, এবং যে-সমস্ত প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে বোদলোয়ার

কবিতা

চৈত্র ২৪, ১৩৩৬

ও বিশেষ করে তাঁর 'পাপের' নহছে, তা বলবার কোনো অবকাশই ঘট না যদি না এই অল্পবাদ বেরোত।

গোড়াতেই শপথ করেছি নৈতিক স্বপ্নের প্রশ্ন তুলব না, সাহিত্যে নীতি বা সাহিত্য ও নীতির সম্বন্ধ নিয়ে সমস্ত আলোচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে মরচে-পড়া বুলিমাড়, বিপুলতার দরুন যার তার নিশ্চয়ই অনেক, কিন্তু যাতে আর ধার নেই। না, এ-প্রশ্ন নীতির নয়, স্বপ্নেরের; প্রশ্ন পাপের, পাপ ও স্বপ্নেরের সম্বন্ধ নিয়ে। সমস্তাটি এত হৃদয়, এত বেশি অন্তরের যে কোনো নিরপেক্ষ বিচার এ-বিষয়ে হয়তো সম্ভব নয়, বিশেষ করে আমার পক্ষে তো নয়ই, কেননা আমার জ্ঞান ও বিচারশক্তি অতি পরিমিত, আর উপরন্তু আমি হয়তো নিজেই ইতিমধ্যে এই পাপের মোহে যুক্ত, তার মায়াবী ও গৌরবের নামে নতজাহ। এবং আমি জানি এই মুহুর্তায় হয়তো বিকোভের বা অস্বস্তির কোনো কারণ নেই, যদি এই পাপমোহের মধ্যে আমার দেখতে পাই নতুন প্রাণের চেতনা, প্রকাশের ও প্রকাশভঙ্গির নতুনতর সম্ভাবনা। জানি, বুদ্ধদেব বহুর মতো ধীরা আশা রাখেন যে বোধলেন্নারের এই 'পাপের ফুল' বাংলা কবিতার নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে, তাঁদের বিরাগে বলায় হয়তো আমার কিছুই নেই, উটেই হয়তো তাঁদেরই আমি পক্ষপাতি।

তবে দ্বন্দ্বটি কিসের? জানি না, হয়তো এটা স্বপ্নই নয়—শুধু মাঝে-মাঝে আমার মনে হয়, এবং কিছুকাল ধরে বড়ো বেশি করে কেবলই মনে হচ্ছে, যে এই পাপমোহ, বিশেষ করে তাকে যে-অভিন্ন রূপ বোধলেন্নার দিলেন, এবং এই নতুনের চেতনা—এ আমাদের একটি সম্পূর্ণ বিপরীতের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে, যে-বিপরীতকে আমরা ভাবতে এতদিন ধরে শুধু যে স্বীকার করিনি তাই নয়, তাকে চিনিনি, জানিনি, না আমাদের যুগন্তর বা দৈনন্দিন জীবনে, না আমাদের কাব্যে ও দর্শনে। এবং এই না-জানার দরুন আজকের এই আলিদনে হয়তো কী এক আধ্যাত্মিক বিপ্লবে আমাদের জাগতে হবে একদিন, না কি স্থির নিশ্চিত পরস্পরে এগিয়ে গিয়ে পৌছবে এক মহত্তর শান্তি ও স্নহময়, তা নিয়ে দূরকল্পনা করার আগে আমি একটু খিতিয়ে

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩

দেখতে চাই এই পাপের রূপ কী, এবং তার নামে আমাদের এতদিনের আমার কোথায় দাঁড়াই। তাঁরা আমার ক্ষমা করবেন ধীরা ভাববেন আমি সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি করছি এক অবাঞ্ছন্য মরস্তার উপাধন করে, কেননা আমি জানি যে অপরিসীমতর পরিচয়ের মধ্যে ভবিষ্যের সংকল্প নিহিত থাকে। তাঁদের দৈর্ঘ প্রার্থনা করে আরো একবার বলি, এখানে কোনো গুহু আমি বাধ্যছি না, আসলে কোনো গোপ ব'লেই মানছি না এটাকে।

আমার আলোচ্য বিষয় বোধলেন্নারের জীবন ও পাপমোহ, ও তার সঙ্গে তাঁর কাব্য ও জীবনদর্শনের সম্বন্ধ; পরে, সংক্ষেপে, পাশ্চাত্য দেশে পাপের সনাতন রূপ; এবং অবশেষে, পাপ ও ভারত। আগেই বলেছি, আমার জ্ঞান ও অহভবের ক্ষমতা সামান্য—ধীরা আরো অনেক বেশি জ্ঞানেন, আরো অনেক বেশি অহভব করেন, তাঁরা ক্ষমা করবেন। এই পাপমোহের তীব্রতা ও তার একান্ত অভাবের প্রসঙ্গে যে-হুইকে এত ভিন্ন করে দেবেছি, হয়তো তারা আসলে হুইটির অচ্ছেদ্য অদৃশ্য ঐক্যের মধ্যে এক, এবং তাই যেন হয়, এই প্রার্থনা করি।

(খ)

চমকে না-গিয়ে উপার নেই—এবং এই চমক কথাটার ওপর একটু জোর দিতে চাই—অর্থন পতি :

'চিরকালের নিখিলমানব ছুটি পরম্পরবিষয়ী সমান্তরাল ও হুপংগ হয়ে নাড়া দেয়—একটি ধাবিত হয় ঈশ্বরের দিকে, অতটি শয়তানের উদ্দেশে। যা ঈশ্বরের গুতি বা আধ্যাত্মিকতা, তাতে ধ্রুনিত হয় উর্দ্ধোদ্যাহের বাসনা, আর শয়তানের আহ্বান, যা পশ্চর্ধ; তার আনন্দ অবতরণের।' অথবা, তরুণ সাহিত্যিকদের প্রতি বোধলেন্নারের উপদেশে, 'যুগার ব্যবহারে রূপন হওয়া চাই, কারণ যুগ মহামূল্য স্বরা, তাতে নিহিত আমাদের রক্ত, বাহ্য, নিভ্রা, ও আমাদের প্রেমের দুই-তৃতীয়াংশ।'

কবির কবিতা ও দর্শন তাঁর জীবন থেকে অবিচ্ছেত, এক-কা সাধারণভাবে

কবিতা

চৈত্র ১৩৩৬

সত্য—বোধলয়োর তা সত্য অসাধারণভাবে। তাঁর পাণবোধ, তাঁর নির্বেদ, অতি তিক্ত বৈরাগ্য, যা ফুল হয়ে ফুটেছে তাঁর কাব্যে, তাঁর শিকড় তাঁর জীবনে—তাই তাঁর বিশিষ্ট সমালোচকমাত্রই তাঁর জীবনের ব্যাখ্যা বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছেন। বোধলয়োর নিজেই কি অসংখ্যার বরেননি, 'এক নির্জনতার অহুত্বিত আঁশের আঁশের সঙ্গী। আত্মীয়হীন ও পরিবার সত্ত্বেও—এবং বহুবাক্যের মধ্যেও প্রায়ই—আমি অহুত্ব করেছি আমার সেই চির-নির্জনতার নিশ্চিন্ত।' আবার, ১৮৫৪-এর একটি চিঠিতে: 'জানি আমার জীবন একবারে প্রথম থেকেই অভিশপ্ত হয়েছে, এবং তা-ই তা থাকবে চিরকাল। তবু, জীবন ও ইন্দ্রিয়ের পিপাসা আমার প্রচণ্ড।'

এই ক্ষেত্রে অসংখ্য সংখ্যাত্রেই জেগেছে তাঁর অদ্বৈত পাপের ফুল। অভিশপ্ত জীবন? কেন, কী করে? খুব সংক্ষেপে সেই জীবন হ'লো এই।

১৮২১-এর এপ্রিলে শার্ল-পিয়ের বোধলয়োরের জন্ম হল পারী শহরে। পিতা ফ্রান্সেস-জ'সোয়া বোধলয়োর, কারিগর-শিল্পী, ১৮২১-এ বার বার ৬১ বছর, ৬২ মা কারোলিন ছাফে, বয়স ২৮। বাবা মারা গেলে, কবি যখন ছয় বছরের শিশু। বছর না-খুবত্রেই মা আবার বিয়ে করলে ওসিক নামে সেনাভিভাগের এক পদস্থকে। এই ঘটনাটিতে কবির শিশুমন দুর্ভাগ্য হ'লো, তা তাঁর পরের ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক জীবনে ফেলল এক কবীর ছায়া ও প্রভাব। পরে তাঁকে বলতে শুনি—'আমার মতো ছেলে বাঁচা থেকে তাঁকে কি আবার বিয়ে করা' মাজে?'

এই ঘটনার পাঁচ বছর পরে, ১৮৩৩ সালে, লিঙ্ক-র এক শিক্ষায়ত্রে বোধলয়োর ঢুকলেন ছাত্র হয়ে। তখন থেকেই দেখা দিল সেই নির্জনতা ও বিষমতার অহুত্বিত, যা কবিকে মুক্তি দেবে শুধু তাঁর মৃত্যুকালে, কিন্তু তাঁর কালের সূর্য যা কখনো ভাগ্য করবে না, কখনো সন্ধ্যা অমর। বিভালায়ের সহপাঠীদের সঙ্গে মনোমালিঙ্গ হয়, যা প্রায়ই সহজ বাগদানবাদের চেয়েও প্রকৃততরূপ নেয়।

১৮৩৬-এ পারীতে প্রভাববর্তন ও কৃতিত্বের সঙ্গে পড়াশোনা। ইতিমধ্যেই

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩

ভাবী বোধলয়োরের ব্যক্তিত্বের ধীরে-ধীরে উন্মেষ হচ্ছে। একটি-দুটি কবিতা লেখা আশঙ্ক্য হ'লো। তখনকার এক বন্ধু তাঁর সেই জীবন সফরে বলেছেন, 'চিত্ত অসংখ্য, দুর্ভাগ্য চালাচলন, মিল্লিক, সন্নিহিত ও সন্নত নীতিজ্ঞানের শৈথিল্যে তার এক মাত্রা-ছাড়া নো গর্ব, কবিতা-পাথল, মুখে উগো-গোড়িয়ে প্রভূতির কবিতা লেগেই আছে, এক কথায় আমাদের অনেকের কাছে তাকে মনে হ'ত একটু বিকৃতমস্তিষ্ক।'

১৮৩৯-এ, পড়াশোনা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই, ভীত বিচলিত পিতামাতার প্রতি তাঁর বৈরাগ্য: সাহিত্যই হবে তাঁর জীবনের রত। এই সিদ্ধান্ত, যা থেকে পরবর্তী জীবনে একদিনের জন্মেও তিনি নড়েননি, সেনাধ্যক্ষ ওসিক-কে বিশেষ ঝট করেছিল। সেই মনোমালিঙ্গ চলবে সারা জীবন, সেনাধ্যক্ষের মৃত্যু পর্যন্ত, মাঝে-মাঝে দু-একটি অতি স্বপ্নস্বপ্ন আশোপাস সত্ত্বেও। তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে স্বপ্ন-দেখা, জীবনদর্শন গড়ে তোলা, তৎকালীন ফরাসী সাহিত্যজগতের তরল ও প্রখ্যাতদের (বালজাক বাঁদের অন্তর্গত) সংস্পর্শে আসা। বাহির যেহেতু ছাত্রা ফেলে অন্তরে, তাই গোপালক-পরিচ্ছদ বদলাতে হবে, বিশিষ্ট হ'তেই হবে সব বিষয়ে। অতএব তাঁর প্রচেষ্টা 'ভাঙি' হবার, যার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ঐক্যতাকে তিনি ধীরে-ধীরে তাঁর দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করবেন। স্থগাতি ও নির্দায় গৌরব বোধ করা, কারণ তা অস্বাভাবিক ও অসাধারণ, বোহিমিয়ান সমাজে ঘোরা। ১৮৪০-এ সঙ্গর ঘটনা এক ইহুদি যুবতী বৈশ্যের সঙ্গে, নাম সারা, পরিচিত মুশেণ ব'লে, সম্ভবত যার প্রণামে তিনি আক্রান্ত হলেন উপদ্রব রোগে। এই রোগই তাঁর প্রাণ বেরে একদিন।

কোনো যুবকের সঙ্গে, যেছায়া পবিত্র কবলে পড়ায় তেমন আশ্চর্যের কিছু নেই, তবে বোধলয়োরের তার রূপ স্বতন্ত্র, কখনো তা আগে থেকেই নির্বাচিত, তার পিছনেও আছে চিত্তের অস্বাভাবিকতা, তাঁর দর্শন। এখানেও তাঁর মায়ের পুনর্বিবাহ এক প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে। মাকে তিনি সারা জীবন ঘৃণা করেছেন অপরের জী ও শয্যাসিঁদুরী হিসেবে, তাঁর নিজের পিতার জী

বলে নয়। হয়তো সম্ভব, কেউ-কেউ ভেবেছেন, তাঁর পিতার যুগ্মর ঠিক পরেই বোম্বেলোরাকে সঙ্গে নিয়ে একই বিধানাঙ্ক ভ্রমেন তাঁর মা—হঠাৎ এক অতিশয় দিনে তাঁর সেই স্থান এসে কেড়ে নিল কোথাকার এক অপরিচিত অস্ত্র পুরুষ, আর সেই সঙ্গে যেম মায়ের হৃদয়ের কোণ থেকেও শিশু বোম্বেলোরার নিজেকে বিতাড়িত হ'তে দেখলেন। এই ঘটনায় নরনারীর যৌনতা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটার ওপরই তাঁর মন এমনভাবে বিগড়ে গেল যে পরে ধীরে-ধীরে তাঁর দর্শন তাঁকে উদ্ভূত করল একথা ভাবতে যে যাকে বলা হয় জায়া যৌন সম্ভোগ, তথাকথিত বিবাহিত নরনারীর মধ্যে, তা অনিবার্যভাবে পৈশাচিক ও গভীরতর এক পাপ, কারণ তাতে পাপকে এড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে জায়ের নাম দিয়ে। হয়তো অস্পষ্টভাবে এই ধারণার বশবর্তী হয়েই নৃশংস-এর অলিঙ্গনে তিনি ধরা দিয়েছিলেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে বোম্বেলোরার খৃষ্টীয় ধর্ম ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্মছিলেন ও বড়ো হয়েছিলেন—যে-ধর্ম তাঁকে আগে শিখিয়েছিল পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে ধর্মবিশ্বাস শালা ও কুচরুত্রে কালোঁর মতো পরিকার উপদেশ। প্রথম সম্ভোগে তিনি বেগে উঠলেন এক মিশ্র চেতনায়, অহতব করলেন মৌলভা-হানির চরম লজ্জা, নিষিদ্ধ ইক্সিমস্বের মানি। কিন্তু দীক্ষা যখন ঘটল একবার, তখন আর নিষিদ্ধি রইল না। আবার অন্তরিক, এই উজানের পথে বেগে উঠল এক বিচিত্র আনন্দাহুত্ব, এক ধরনের মুক্তি—পর্যায়ের কঠোর দৃষ্টি থেকে, সমাজ ও নীতির কবল থেকে, গভাহুগতির শৃঙ্খল থেকে। এক কথায়, এ যেন মতেমন হ'য়ে পাপচর্চা, পাপে আনন্দবোধ। পরে বোম্বেলোরার ববলেন, প্রেমের আনন্দই এই যে নরনারী সমাজে পাপ করে, তাকে পাপ বলে জেনেই।

বলা বাহুল্য, কবির এ-সব কার্তি তাঁর মাতা ও বিপিতার মনে স্বেঘের সম্ভাব্য করেনি। তাঁরা শঙ্কিত হ'য়ে ছেলেকে এক দূর বাজায় পাঠাতে মনস্থ করলেন। বর্দা থেকে ভাঁহাঙ্গে চলে গেল কবি চললেন কলকাতার দিকে, কিন্তু সীতাই এই বাজায় তাঁর এমন অসুচি ধরল যে ভারত পৌছানোর বহু আগেই

তিনি ফিরতি পথ ধরলেন। কিন্তু যাবা একেবারে ব্যর্থ হ'লো না, কারণ তা তাঁর পরবর্তী কালো কমাগত প্রতিক্ষণি তুলাবে তপ্ত জলবাহুর আবেশের, তথা কৃষ্ণাধীরের প্রতি কামনায।

১৮৪২-এ বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেন। আগামী তিন বছর কাটবে আরামে, অপব্যয়ে, পূর্বের স্বপ্ন শোধ ক'রে, ও প্রায়শ্চিত্ত ও নতুন কবি-সাহিত্যিকদের সংশ্লিষ্টভাবে। আলাপ হবে গোতিয়ে, সাঁৎ ব্যত ও ভিত্তর উগো-র সঙ্গে। এই সময়েই প্রথম পরিচয় অস্ত্র এক তরুণী গণিকার সঙ্গে, নাম জ্ঞান ছাড়াই, রূপে-গুণে কোনো দিক দিয়েই যাকে অসাধারণ বলা চলি না, উপরন্তু অশিক্ষিত, নির্বোধ, এবং যে বোম্বেলোরার প্রতি অবিচ্ছিন্ন আহুগতোও নিজেই আনন্দ রাখেনি সারা জীবন—যদিও কবির জীবনে ও কাব্যে তার প্রভাব হয়েছে হৃদয়প্রসারী, কবি তাকে কখনোই একেবারে তাগ করত পারেননি। শুধু তাই নয়, এই আধা-নিগ্রো আধা-ইউরোপীয় রমণীর হাতে কবিকে সারা জীবন আর্থিক কারণেও নিগ্রহভোগ করতে হয়েছে। আবার এই সময়েই শোনা যায়, বোম্বেলোরার মেশার চর্চা শুরু করেন, বিপজ্জনক গটিকা ইত্যাদি সেবন ক'রে—সেচ্ছায়, জোর ক'রে, শিখে নিতে চান, যারা এই সবে যাতে, তারা কেমন ক'রে যাতে, কী তাদের অহুঠান-পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার, ইত্যাদি।

তাঁকে নিয়ে গণিক-সম্পত্তির চিন্তার শেষ নেই। ছেলে পয়সা ওড়াচ্ছে দু-হাতে—ওপিক ভাষাভারের দারস্থ হ'য়ে এক তৃতীয় ব্যক্তি নিয়োগ করলেন, যার মধ্যস্থতায় কবি পাবেন তাঁর মাসিক প্রাপ্য। ১৮৪৫-এ ঘটল সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর স্বার্থ আগমন, প্রকাশ করলেন সেই বছরের সার্ল, বা চিত্তপ্রদর্শনীর সমালোচনা। ১৮৪৬-এ দুটি কবিতার প্রকাশ, তরুণ সাহিত্যিকদের প্রতি উপদেশ নামে একটি নিবন্ধ রচিত হ'লো।

একটির পর একটি রচনার প্রকাশ হ'তে লাগল। রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ, যা এলো যেমনি হঠাৎ, বাবেও তেমনি। ১৮৪৭-এ আমেরিকান কবি এডগার পো-র রচনার সংস্পর্শে এলেন, যার দ্বারা তিনি স্রশেষ লাভান্ব হ'লেন

ও বার অহুবাধ তিনি পরে সতেরো বছর ধরে করতে থাকবেন। মার্কিন কবির দর্শন তাঁর আশ্রয় হ'লো, সেই কবির মাধ্যম একভাবে তিনি নিজেরই মানসভা আবিষ্কার করলেন।

কিছু পদ্যে, ব্যক্তিগত জীবনে, সংস্পর্শে এলেন অভিনেত্রী মারী দোর্ভ্যাগ-র। একই সময়ে, মাদ্রাস সাবাসিত্যের প্রতি এক দুর্নিবার আবেগের জন্ম, থাকে কবি বেশ কিছুকাল ধরে বেনামে কবিতা ও প্রেমপত্র পাঠাতে থাকবেন। এই সময়ে উপঢাঙ্গ লেখার বাসনা জাগে তাঁর, যা কার্বে পরিণত কখনো হবে না। চলতে থাকল তাঁর সৌন্দর্যভবের বাধ্য, ও অবশেষে, রত্ন দে দো মঁদ-এ, আঠারোটি কবিতার প্রকাশ, যা পরে 'লে ম্যার দ্য মাল'-এর অঙ্গীভূত হবে।

১৮৫৭-তে খুঁজে পেলেন এক প্রকাশক, নাম পুলে-মালাসুসি, যিনি রাজি হলেন 'ম্যার দ্য মাল'-এর প্রকাশে, ও বার সপ্তে কবির বৈদ্যুতিক ধাক্কে আসরূপ। কিন্তু বইটি বেরোনার সঙ্গে-সঙ্গে পার্বীর অত্যন্ত দৈনিক 'কিগারো' ভাতে দেখলেন দুর্নীতির চরম। মামলা আরম্ভ হ'লো প্রকাশক, মুদ্রক ও কবির বিরুদ্ধে। তাঁর বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কবি নিষ্পত্তি পেলেন না। কিছু জরিমানা হ'লো; শুধু তাই নয়, বইয়ের ছয়টি কবিতা অপসারিত করার নির্দেশ দেওয়া হ'লো। উদ্ধৃতিত হ'য়ে ভিক্টর উগো লিখলেন: 'এই শাস্তিদানে সরকার আপনাকে সন্তুষ্ট করলেন এক অনন্তসাধারণ বৈশিষ্ট্যে, তাঁদের ছায়ের দ্বারা তথাকথিত নীতির ওজুহাতে আপনাকে দণ্ড দিয়ে—এই শাস্তি আপনাকে পরালো আরো একটি মুহূর্ত।' উত্তরে বোলসেয়ার বললেন, 'আমি জানি, এমন থেকে সাহিত্যের যে-কোনো ক্ষেত্রেই হাত দিই না কেন, আমি থাকব এক অম্লর হয়ে।' কিন্তু মালাসুসি-কে লিখেছেন পরে, ১৮৫৯-এ, 'জানি আমার ম্যার দ্য মাল নিশ্চয়ই বাঁচবে,' এবং ১৮৬১-তে, 'প্রথমবার আমার জীবনে, আমি নিজেকে প্রায় সন্তুষ্ট বলতে পারি। বইটির স্বত্বীয় সংস্করণ অদ্বত ভালোে কাছাকাছি হবে, এবং তা থাকবে এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুর প্রতি আমার চরম ঘণা ও বিরাগের শেষ জ্ঞানবন্দি হয়ে।'

অবশ্য বইটি বেরোনার সঙ্গে-সঙ্গেই মাদ্রাস সাবাসিত্যের কাছে এতদিনের বেনামি কবি ধরা পড়ে গেলেন। আরম্ভ হ'লো আবার এক নতুন প্রেম ও বিতৃষ্ণার নাটিকা, বার বারনিকা নামল অতি শীঘ্র। কবি লিখেই চলেছেন চিত্রকলার বিষয়ে, এবং তাঁর সৌন্দর্যভবের আলোচনা—শুধু মাঝখানে একবার, ১৮৬১-তে, ক্যাসী আকাদেমীর সভা হ'তে উঠে পড়ে লেগেছিলেন, ভাগ্যে প্রার্থীর তালিকা থেকে নাম তুলে নেন আগেই, নয়তো নির্বাচনে তাঁর পরাজয় ছিল নিশ্চিত।

১৮৬২-র গোড়া থেকেই স্বাস্থ্য খুব খারাপ হ'তে আরম্ভ করলো। কৈশোরে যে-মৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এবং যা থেকে এতদিন তুল ক'রে ভেবেছিলেন সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন, তা তাঁর চরম পর্যায়ে তাঁর দেহকে অধিকার ক'রে বদল। কবি লেখা ছেড়েছেন, রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। এক সম্ভার্য তাঁকে এইভাবে এক নাট্যরঙ্গের সামনে ঘুরতে দেখে একজন জিজ্ঞাসা করেন, 'এ কী, বোলসেয়ার, কী করছেন আপনি এখানে?' বোলসেয়ার বলেন, 'মৃতদের মাথার মিছিল দেখছি।'

এদিকে আর্থিক দুশ্চিন্তাভেদে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, ঋণ বেড়েই চলেছে, পার্বী থেকে পরাণে পারলে বাঁচেন। কী খোঁজল হ'লো, বেলজিয়ামে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে অর্থোপার্জন করা যায় না কি? গেলেন বেলজিয়ামে, কিন্তু তার বেশি আশ কিছু হ'লো না। রোগও বেড়েই চলেছে। একদিন হঠাৎ নামুয়ের এক গির্জার সামনে হতভম্ব হয়ে পড়ে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে ব্রাসেলসে নিয়ে আসা হ'লো—ইতিমধ্যে বান্ধুশক্তি লোপ পেয়েছে, যদিও বুদ্ধি বিবেচনা দৃষ্টিশক্তি সব ঠিকই আছে। দেহের এক অংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত, জীবনের অবদান আসন্ন। এক বছর এইভাবে পড়ে থাকার পর মৃত্যু হ'লো পার্বীতে, ৪৬ বছর বয়সে, ১৮৬৭-র ৩১শে অগস্ট তারিখে।

মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে লিখেছিলেন: 'যেমন শরীরে, তেমন চৈতন্যে, আমি সারা জীবন অহুত্ব করেছি এক অতলস্পর্শ গহবরে শূন্যতা, যা শুধু ঘূমের শূন্যতাই নয়, শূন্যতা কার্বে, স্বপ্নের, স্মরণের, বাসনার, অহতাপের,

মনস্তাপের—সেই শূন্যতার অহুত্বিত আনার স্বন্দরকে নিয়ে, সংখ্যার ধারণা নিয়ে...। যেমন আনন্দে, তেমনি ভয়ের সঙ্গে চর্চা করেছি আবার মৃত্যুর। চিরকালই আমি ঘৃণাদোষণও, এবং আজ, ১৮৬২-র ২৩শে জাম্মারিতে, পেন্সন এক অভূতপূর্ব সাবধান-বাণী—দেখলাম, উন্নততার ডানার কাণট ব'য়ে গেল আমার ওপর দিয়ে।'

(গ)

শান্তোত্রি। ও বায়নের বিষাদের উত্তরাধিকারী হ'য়ে, ভিই-নি-র আধ্যাত্মিক নৈরাশ্রে ও ক্ষোভের এবং ল্যাক্স ছা লিল-এর সৌন্দর্যের পৃথবাদের প্রভাবে, বোদলোয়ার ধ'রে নিয়েছিলেন যে এই পৃথিবীর সব-কিছুর মূলে রয়েছে মন্দ, ধার্মাণ, এক চরম, প্রসূত পাপ। শুধু, যা অন্ধদের কাছে ছিল একটি দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যস্ত চিন্তার রূপ মাত্র, বোদলোয়ার তাকে গভীর যুক্তির দ্বারা রীতিমতো এক জীবনদর্শনে পরিণত করলেন। সমাজ যদি মন্দস্থী তো তার সংস্কার সম্ভব, কিন্তু তা ক'রে লাভ নেই; মনের মধ্যে গুটিকে ব'সে নিজের বিষয় নিরন্তর কথা ভেবে এক বিভিন্ন আনন্দ পাওয়াও চলে, কিন্তু তাও বোদলোয়ার করলেন না। উল্টে তিনি নিজেকে দেখলেন অস্ত স্রবনের মতোই একজন মাহুয় হিসেবে, বিষয়, দৃষ্টান্তের উত্তর ও এমন এক পাণে আক্রান্ত যার হাত থেকে উদ্ধার নেই; বিষয়, কেননা পবিত্র, দৃষিত, কেননা মন এক নাম-না-জানা হারানো স্বপ্নের দিকে মুখাই শক্তি চেয়ে, শান্তি চেয়ে, সামঞ্জস্য চেয়ে, চিরধাবনাম। কিন্তু সকলের হ'য়ে কথা বলার এত বড়ো অধিকার তাকে কে দিল? এইখানোই আশ্চর্য্য, অহংবাধ, যা ব্রহ্মায়, শুধু তাঁরই নয়, তাঁর অহুগামী পরবর্তী সকল করি।

তবে মাহুয়ের নিরন্তরই যদি এই পাণ, তা হ'লে প্রচেষ্টার লাভ কী?—পরে যেমন ঘাঁবে বলেছিলেন, সকল প্রয়াসেই কী মরণ নাচবে না এলোমেলো? এই পাণের হাত থেকে মুক্তি নেই, না প্রেম, না মরণ, না দেশান্তর-যাত্রায়, এবং এই প্রচণ্ড দ্বন্দ্ববাদ কী হেসে উড়িয়ে দেবে না মাহুয়ের

এতদিনের জয়ধ্বজকে, ছুয়া দেবে না রোমাটিকদের অতিচরিত অতিবাহিত আবেগ-অহুত্বকে? কিন্তু মজা হচ্ছে এই, এবং বোদলোয়ারের ব্যক্তিগত বৈত দ্বন্দ্বের বাহায়াই এই, যে এই দ্বন্দ্ববাদকে ভিত্তি ক'রে, ও তা শব্দও, তাঁর অকূল সৌভাগ্য, পতন ও অহংশোচনাকে তিনি নিমিত্ত মাত্র ও পথ হিসেবে ধ'রে নিতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন আবিষ্কার করতে তাঁর স্বন্দরকে, যে-স্বন্দর এই পৃথিবীর সকল নীচতাকে জয় করেছে, যার বিভা দিয়া, এবং সব পাখির ও প্রাকৃত আকাঙ্ক্ষা ও হতাশা যার এক অস্বচ্ছ বিলাপস্বরী দর্পণ বই নয়। তাই তিনি চাইলেন যে তাঁর আর্ট, অর্থাৎ তাঁর স্বন্দর, তা সমস্ত মাহুয়ী প্রেরণাকে আলিঙ্গন ক'রে ও এক তাঁর নিখাদে স্বর ফুলে, মেলাবে উচ্চতম মিনারে সব অহুপ্রেরিতদের, বুদ্ধির শীমানা পেরিয়ে আপাত-বিভিন্নের সম্মিলন ঘটবে সে প্রতীকের পূর্ণে—শব্দ হোক, পূর্ণ হোক, বর্ণ হোক আর গন্ধই হোক, তারা বলবে এক ভাব, মিলবে এক হ'য়ে স্বন্দরের জাহ্নবে, কবির মধ্যস্থতায়। কবি ও স্বন্দর এক নয়, শুধু তাঁর চেতনার স্বন্দর জাগিয়েছে কবিকে। তাই, বোদলোয়ারের মতে, কবির কর্তব্য হ'লো এই আপাতবিভিন্নের মধ্যে যে-সত্য এক ও গুহ, তাকে আবিষ্কার করা, প্রকাশ করা। এবং যেহেতু তা চিরায়তের পথে সম্ভব নয়, বা আছে বা হচ্ছে, বা হ'তে পারে তার বর্ণনায় বা প্রাপ্তিতে তা নেই, তাই কবিতার যেন শক্তি থাকে চমকে দেবার, মানসিক শান্তি ও স্থিতিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে গুলুকে উদ্ঘাটন করার। তা যেন বিজ্ঞপ্ত করতে পারে চিরায়তকে, তা যেন দ্বন্দ্ব জাগায় ও দ্বন্দ্বায় জেগে ওঠে। এবং যেহেতু সব-কিছুই পাণ এই পৃথিবীর, স্বন্দরের প্রকাশ ঘটবে পারবে শুধু পাসেরই মধ্য দিয়ে—পাণ হ'লো স্বন্দরের একটি অতি বিশিষ্ট, অতি প্রধান ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

হয় সবই ভালো, মরাত ভালো-মন্দের সংশ্লিষ্ট এই পৃথিবী, অথবা সবই মন্দ, যুক্তিতে এই ভিন ধরনের দর্শন সম্ভব। এর মধ্যে প্রথমটির প্রশ্ন বোদলোয়ারে ওঠেই না, কিন্তু বাকি দুটির পরস্পরের মধ্যে একা-না-ধাক্কাও তাদের যুগপৎ অস্তিত্ব তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়, যদিও দেখানোই তিনি মন্দের

মুখে ভালোকেও মেনেছেন, সেখানে অন্তত প্রজন্মভাবে দেখিয়েছেন ভালোর ওপর মনোবৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও নৈতিক। কখনো তাঁর হৃদয় নেনেছে আকাশ থেকে, কখনো অন্তঃস্পর্শী পাতাল থেকে উঠেছে সে, সে একই সঙ্গে দিবা ও নারিকী, কখনো তিনি হৃদয়ের সবচেয়ে সূক্ষ্ম রূপ খুঁজে পেয়েছেন শুধু শরভানেরই মধ্যে। এই মন্দ ও ভালো-মন্দের যুগপৎ অস্তিত্বে বৈবৈধ্যের বেজ্জে তাকে কীণ বলব সেই বৈবৈধ্যের তুলনার, যা তাঁকে পাগের প্রকাশের মধ্য দিয়ে ছুটিয়েছে আমরণ দিবা বিভার হৃদয়ের অহসন্মানে। এই জীবন-দর্শন হয়তো সূক্ষ্ম নয়, কারণ তাতে সামঞ্জস্যের অভাব—তাই দর্শন হিসেবে তার শার্বকতা বা সম্প্রদায় নিয়ে তর্ক করা চলে, যদিও বোধলোয়ারের হাতে কাব্য হিসেবে যে তার উৎকর্ষ ঘটেছে তা অনস্বীকার্য। হৃদয়ের শেষ কথা সে হৃদয়, যেমন তিনি বার-বার বলেছেন কবিতার শেষ কথা তা কবিতা, তা ভালোও নয়, মন্দও নয়। নীতিবাদীরা সকলে বোধলোয়ারকে মানেননি, আজও মানেন না, কিন্তু তাঁদের মধ্যেও কেউ-কেউ এক ধরনের আপোলের আশায় অবশেষে বলেছেন যে বোধলোয়ারের কাব্যও নৈতিক, কারণ সবার উপরে তা কাব্য, তা হৃদয়, এক অনবদ্য অমৃতপূর্ণ হৃদয়—হয়তো তা মুখে বলেছে পাগের কথা, মেতেছে পাগে, কিন্তু যে-অহুভূতি পাঠকের মনে তা জাগাতে পেরেছে, তা যে-কোনো ঐচ্ছিক কাব্য পড়ারই অহুভূতি। এর বেশি বোধলোয়ারও কিছু চাননি—বলেননি কি তিনি নিজেই, 'এলে তুমি আকাশ হ'তে না মরক হ'তে, যে আমার হৃদয়, তাতে আমার কী এসে যায়?'

তাই তাঁর কাব্যের ও দর্শনের বা প্রথম বিশিষ্ট লক্ষণ, যা অনভ্যন্ত পাঠকেরও চোখে পড়বে ও যা তিনি নিজে বহুবার অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, তা হচ্ছে চমকে দিতে পারার ক্ষমতা। এই চমকে দেওয়া তাঁর হৃদয়ের ও কাব্যের একটি অতি বিশেষ ও অপরূপ লক্ষণ, এবং এটাই সঙ্গে সঙ্গে বৈবৈধ্যের বা চালচলনের তাঁর 'ভাষি' হবার সাধনাই নয়, তাঁর পাগের প্রতি প্রেম। একটি বাহির, কিন্তু বাহ্য নয়, কারণ তার ছায়া অন্তরেও পড়েছে, আর অচ্যুত অন্তরতম। একটিকে ছোঁওয়া যায়, অচ্যুতকে শুধু

অহুভব করতে হবে। তাঁর হৃদয়কে তাই শুধু অহুভ হ'লেই চলবে না, হ'তে হবে হৃৎপূর্ণ, পাগে উজ্জ্বল। দ্বিতীয় বিশিষ্ট লক্ষণ: তাঁর কাব্য চোখেছে ভালোকে নয়, হৃদয়কে।

নির্জন ও আত্মকেন্দ্রিক বোধলোয়ার যথার্থ প্রেমের কবিতা প্রায় লেখেননি বললেই হয়, তাঁর অহং-এর কেন্দ্রীকরণ ও বাস্পীকরণের মধ্যেই ধৃত ও ও প্রকাশিত তাঁর কবিতা। প্রেমের, তাঁর মতে, থাকতেই হবে এক ধরনের মৃত্যু ও ছেলোমাহুবি, একমাত্র তা-ই হৃদয়কে সংরক্ষণ করে, কিন্তু প্রেমকে যদি প্রকৃত হ'তে হয়, হ'তে হয় 'প্রাকৃতিক', তবে তো তার পাগ না-হ'য়ে উপায় নেই।

ভালো নয়, হৃদয়। এইখানে আটো নীতিবাদের প্রসঙ্গে বোধলোয়ারের চরম উক্তি: 'সমাজের বাইর পাখীগুলো যখন চৌচাঁর আটে স্ত্রীলতা, স্ত্রীলতা বা দুর্নীতি নিয়ে, তখন আমার মনে পড়ে যায় সেই পাঁচ সিকে দামের বেজার কথা, নুইজ ভিইদিও, যাকে আমিই প্রথম নুইজ-এ নিয়ে গিয়েছিলাম একদিন। ঐ সব নয় ভাঙ্গু ও চিত্র দেখে কলার কী লজ্জা, কাপড়ে চোখ ঢাক, আমার জামা ধরে টানে, বলে এমন স্ত্রীল নোবাগি কী করে সর্বসাধারণকে দেখানো চলে!'

কী আশ্চর্য, এই পাগের ও হৃদয়ের জগৎ একাধারে অনন্ত ও ভিন্ন। পরবর্তীদের অনেকের মধ্যে এখানে র্যাবোকে দ্বন্দ্ব না-ক'রে পারি না। যেখানে বোধলোয়ার ধামলেন, মরকে, সেখানে থেকে র্যাবোর যাত্রা শুরু হ'লে। সেই অবিশ্রান্ত বালক বৃত্তীয় হৃদয়-মন্দের পাঁচটি ভাষা-বন্ধকে তুড়ি মারে উড়িয়ে আকাশ ও নরকের মধ্যে সেতু বাঁধলেন, স্বয়ংবর্কিে দিলেন রং, মাতুলেন শব্দের রসায়নে, সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত নিদর্শনোভার ওপরে ছড়িয়ে দিলেন তাঁর কর্তব্য। বোধলোয়ারের কাছ থেকেই র্যাবো নিলেন তাঁর হৃদয়ের দীক্ষা, প্রতিরূপের প্রতি আসক্তি এবং সকল অহুভবকে সেই দীর্ঘ, অহুভবিত ও প্রবল উজ্জানে টেনে নিয়ে যাওয়ার আবেগ। অভ্যন্ত আচারের প্রতি তাঁর বিজ্ঞপ, নারীর প্রতি এক বিজাতীয় যুগ, তাও পাওয়া বোধলোয়ার:

থেকেই। তাঁর একেবারে আধুনিক হয়ে যাওয়ার সংকল্প, তাতেও বোধনোয়ার।

অবাক হবার কিছু নেই যে গত শতাব্দীর সকল নতুন আলোকমুখী কবীরা কবিতা 'লে স্যার দ্য মাল'কে করল তার তব-কবচমালা।

(ঘ)

খৃষ্টীয় ধর্ম ও দর্শনে অল্পত বীজের আকারে এই আধ্যাত্মিক পাণবোধের সবই ছিল ও আছে, যে-পাণ বোধলোয়ারে নিল এক পরম পরিপক্ব রূপ এবং যাকে তিনি তাঁর সহযাত্রী কবি ও শিল্পীদের রক্তে সংক্রমিত করলেন— যে-কবি ও শিল্পীরা 'অকিশং' নামে নিজদের চিহ্নিত করতে চাইলেন রীতিমতো একটি গোষ্ঠী হিসেবে।

গুটপূর্ব ইহুদী পুরাণে পাই মাহব ও জগৎ বিষয়ে এক অদ্ভুতাক্ষর ধারণা, তাতে কেবলই বলা হয়েছে সব-কিছুর চরম পাণ ও অপকর্ষের কথা। প্লেটো বললেন ঈশ্বর নিষ্পাপ, কিন্তু সেই সত্ত্বেই যেনে নিলেন পাণকে এক স্বতন্ত্র মৌলিক উপাদান হিসেবে। জরথুষ্ট্রের ধর্ম দুই দেবতাকেই সমান আসন দিলেন, এক অর্ধব্রহ্ম, যিনি শুভের দেবতা, অজন্ম পাণের দেবতা, অর্ধিহন (তুলনীয়: অখর্বের)।

পাণের প্রসঙ্গে খৃষ্টীয় দর্শনে মাহমের আদিপত্তন পেয়েছে দুই-তৃতীয়াংশ স্থান—আদমের পাণ, যা খৃষ্টীয় মতে সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু মানতে যদি হয় যে এই পত্তন ঘটেছিল, তা হ'লে তো একদিন হঠাৎ এটাও ধ্বংসে নিতে হবে যে সেই ঘটনার আগে কোথাও একটা উচ্চস্থান ছিল, নিম্নলব্ধ নীতি ও ধর্মের এক দোতলার বাসান্দা, যা থেকে সেই আদি মাহব পড়ল, এবং যে-পত্তনে সে চিরকলুণিত করে দিল তার নস্তুতিকে। এই যুক্তিতে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে তাই বলা যেতে পারে যে ছুটো জিনিস একই সত্ত্ব মাহমের মধ্যে আছে—প্রথম, এক চুই ও দ্বিতীয় জ্বর, শরতানে দীক্ষিত আদমের উত্তরাধিকার, যা হ'লে আদিপাণ;

অন্তর্গত নীতি ও ধর্মের এক সমান্তরাল ক্ষুদ্র বা ছুটেছে ঈশ্বরের স্পর্শ নিয়ে। যদি জগৎ একদিন সৃষ্টি হয়ে থাকে একটা বিধি বা বিধান বা বৈজ্ঞানিক প্রণালী ধরে যাতে ভালো-মন্দের প্রশ্ন নেই, তবে পাণ নিয়ে তর্কই ওঠে না; সমস্তটি এসে গেল তখন যখনই বলা হ'লো স্রষ্টা এক ঈশ্বর আছেন, এই সৃষ্টি তাঁর।

তবু, যে-পাণের অব্যর্থ হাত বৃকে নিয়ে সমস্ত মাহমের জন্ম, অথবা যে-আদি ও অনন্ত পাণের হুচনা হ'লো আদমের পত্তনে, এর কোনোটাতেই ব্যবহারিক খৃষ্টীয় বিবেক ততটা পীড়িত নয়—পাণ বলতে সে বিশেষ করে বুঝতে চেয়েছে মাহমের কাঁধ ও আচরণের পাণ, যা মূলত নৈতিক মাত্র, আধ্যাত্মিক নয়। অবশ্য এই প্রশ্নদে বলা উচিত হবে সেই ঐতিহাসিক বিতর্কের কথা যা জেসেলিগ পাণের প্রকৃতি নিয়ে আগন্তিন ও পেলেজিয়াস-এর দুই বিপক্ষ দলের মধ্যে। প্রথম দল বললেন পাণ অনিবার্য নয়, শুধু স্বতঃ-প্রযুক্ত, তাই নৈতিক মাত্র, তা অদহানি বা আবশ্যক গুণের অভাব ('privatio boni'), অতএব নঞবাক্য। শুভই সত্তা, পাণের নিজের কোনো অস্তিত্ব নেই, সে জাগে শুধু সহজাত পূর্ণতার অভাবে ('spontaneous defectus a bono')। অন্তরল পাণকে ধিলেন সত্তা, তাকে বললেন এক সারবস্ত, যা থেকে নিষ্কৃতি নেই, যা ঈশ্বরকৃত 'eo ipso'-র মতোই মানবস্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই পাণ আধ্যাত্মিক। আগন্তিনের দল আরো বললেন, পাণের প্রকৃত রূপ অহংকারে, এবং তার প্রকাশ হয় ঈশ্বরের পথ হতে ষড় বাসনার মধ্য মিলে, এবং যেহেতু সেই ষড়তা একটি সাময়িক অবস্থা মাত্র, পাণ মাজেই নশ্বর।

কিন্তু পাণের এই আধ্যাত্মিকতাকে সঁতা বলে মানলে ব্যবহারিক জগতে মাহমের সন্ন্যাস না-হ'য়ে উপায় নেই। তাই ধর্মীয় নেতারা আগন্তিন ও পেলেজিয়াসের বিতর্কের এক আংশিক আপোষ চেয়ে বললেন যে জ্ঞানানার সত্ত্ব-সত্ত্বেই যদিও মাহম পাণে আবদ্ধ থাকে ও দ্বিভূত, যদিও সে ঈশ্বরের শুধু চরম জোড়েরই অধিকারী, অধিকারী একমাত্র অনন্ত নরকবাসের, সে যুক্তি পাণে,

আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে, যদি সে ঈশ্বরের দয়ার ভিখারি হয়, এবং পরম পিতার পুত্র স্বয়ং এই মন-জগতে এসেছেন সমস্ত মাহুষের পাপ নিজের কাঁধে তুলে নিতে, আশ্বাসনে তিনি ধোত ক'রে দিয়েছেন, সেই অনিবার্য পাপ। অর্থাৎ, বৃষ্টির ধর্ষণান্নমতে মুক্তি পেতে হলে হ'তেই হবে তাঁর দয়ার ভিখারি। তাই র্যাবার মৃত্যুশিয়রে পুরোহিতক বলতেই হ'লো যে তিনি এই অভিশপ্তের মধ্যে এক আশ্রিত বিধানের জ্যোতি দেখেছেন, এবং ইজ্রাবেল অবশেষে মাকে লিখতে পারলেন মৃত ভাইয়ের বিষয়ে উজ্জ্বলিত হয়ে।

এই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক ছাড়াও পাপের একটি আধিভৌতিক অবস্থাকেও স্বীকার করা হয়েছে। এই আধিভৌতিক অংশটি, বিশেষত শারীরিক দৃষ্ণে কষ্ট যন্ত্রণা ও মৃত্যু, মহিমান্বিত হয়েছে পূর্বকৃত পাপের শাস্তি হিসেবে। জঁরে যে-পাপ, তার মোচন মৃত্যুতে।

দর্শন হিসেবে বোয়লোয়ার ভাই হয়তো একেবারে আনেকোবা নতুন কিছু দিলেন না। তাঁর নতুনত্ব এই যে সেই পাপচেতনার তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বাঁচলেন তিনি, তাতে মরলেনও, তাকে চেয়ে-চেয়ে যিনে-রিনে গভীর মননের সঙ্গে পড়ে তুললেন তাঁর জীবনদর্শন। যে-পাপবোধ তাঁর জীবনে, যার অপূর্ব প্রকাশ তাঁর কবিতায় ও গদ্য রচনায়, তা বিপাকপ্রসারী হওয়ার আগে বহু কঠিন মূহুর্তের সাধনার দ্বারা অহুধ্যাত ও নির্বাচিত হয়েছিল।

(ঙ)

একটু আগে যা বললাম, বোয়লোয়ারের অভিনবত্ব শুধু তাইতেই নয়—পাপের আলোকে এক নতুন ভূমিকা দিলেন তিনি স্বন্দরকে, এবং এই দানই নিঃসন্দেহে তাঁর প্রধানতম। এদিকে আমরা ভারতে দাঁড়িয়ে আছি এক অস্ত্র সরহুর তীরে।

তবুও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, ভালো ও মন্দ অথবা পাপ ও অপাপের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনায়, তবুও বহিঃশীল মাহুষের স্বন্দরের স্বরূপ-ব্যাখ্যায়। ভারতের সেই বক্তব্যটিকে বলবার চেষ্টা করছি অতি স্নগ্ধ কথায়,

যে-ভাবে তাকে জেনেছি বা অহুভব করেছি আমার সামান্য জ্ঞান ও অহুভুতির ক্ষমতাতে, এবং যা এগে আগে অনেকে বলেছেন আরো অনেকে হৃদয় ক'রে ও অনেক বিস্তারিতভাবে।

প্রথমেই, ভারতের বহুমুখী চিন্তায় ও অনন্ত বিপরীতের মধ্যে যে এক ও অনন্ত, তাকে আমরা যেনেছি অনাদি কাল ধরে ও মানব এখানে। মানতেই হবে যে তা মূলত বৈদ্যাত্তিক, শুধু পুঁথির বা শিক্ষালয়ের তত্ত্ব নয়, আমাদের মস্তুর জীবনের অভিজ্ঞতার ও অহুভুতির বহমান নদী, এবং তারই আলোকে উদ্ভূত ভারতের সমস্ত অলংকারশাঃ, রস ও স্বন্দরের স্বরূপ, শুধু সাহিত্য বা কাব্যেই নয়, চিত্র ও ললিতকলার অস্ত্রাঙ্গ ক্ষেত্রেও। ঈশোপনিষদ যাকে বললেন 'তদন্তরন্ত সর্বত্র তদ্ব সর্বত্র বাহুত' (সকলের অন্তরে, আবার বাইরেও), তা-ই রসের ব্যাখ্যায় সাহিত্যদর্পণের লেখকের কাছে প্রতিষ্ঠাত হ'লো 'পরন্ত ন পরন্তেতি মমেতি ন মমেতি চ' (পরের, কিন্তু পরেরও নয়; আমার, কিন্তু আমারও নয়)। পশ্চিমী চিন্তার সঙ্গে আমাদের আরো একটি মূল প্রভেদ, যেমন সংগীতে, তেমনি সাহিত্যে ও অস্ত্রাঙ্গ আর্টে, ব্যক্তির সত্তা ভারতে কখনো ধাঁড়াননি এক ভিন্ন একক হয়ে, কিন্তু স্রোতধিনীর মতো বার-বার সে মিলেছে এক চিরকালের সমুদ্রে, তার ব্যক্তিত্ব ব্যঙ্গনার নতুনত্বে, সেই অঙ্গ ও শাব্দত একের নতুনতর প্রকাশে বা প্রকাশভঙ্গিতে। তাই ভারতীয় সংগীতে নেই বীতোলেন, ভারতীয় কাব্যে নেই বোয়লোয়ার।

মাত্র নৈতিক ও এক ধরনের বাহ্যিক অর্থে পাপ ভারতেও বিস্তারন, কিন্তু সে নয় সেই অন্তরের পাপ, এক আদি ও মৌলিক গভন, যা থেকে নিস্তার নেই। স্বন্দর ও সম্পূর্ণের অহুসরণের সাধনা ধরেই নেয় যে সেই স্বন্দর ও সম্পূর্ণের উটোটিও আছে, যাকে অতিক্রম করতে হবে। গীতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ভালো ও মন্দের এক প্রাপণপ শঃগ্রাম বলে, যা থেকে ভগবান মাহুষকে রক্ষা করতে চান তাঁর প্রেমের বর্ষণে। অস্ত্রাঙ্গ, দর্শনে, পদ্যাদিক বহিঃর সমস্ত কিছুর পিছনে এক ভয়ের কথাও বলা হয়েছে, বলা হয়েছে তারই ভয়ে জ্বলেছে আশুন ও হৃৎ, তারই ভয়ে ইন্দ্র, বায় ও মৃত্যু।

ছুটেছে। কখনো দ্রুত মাহুষের অন্তিম প্রার্থনা চেয়েছে কব্জের দক্ষিণ মূখের করুণা। কিন্তু সেই যে 'সে', তার স্বরূপ এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও অমৃত, তাতে পাণ্ড ও পুণ্য, জন্ম ও মৃত্যু, ভালো ও মন্দ, ভয় ও ভয়ের অভাব—এগুলো সবই আছে, আবার কোনোটা নেই। কারণ তার যথার্থ রাজ্যে না জন্মে স্বর্গ, না জন্মে চল্লিশ-তারা-বিদ্যায়, অগ্নি ত্রৈ কোন ছায়—কিন্তু তারই দ্ব্যোতিতে সবই স্বপ্রকাশ, সব আলোকিত, তারই আলোয়। সে সর্বব্যাপী, শুষ্ক, অকায়, অরূপ, অস্বাভাবিক, অস্বাভাবিক, এবং সেই কবি, সে একাধারে মনোবী, পরিষ্ক ও স্তম্ভ। সে সত্যের মুখ ঢেকে রেখেছে এক হিরণ্ময় পাণ্ড দিয়ে, বায় উন্মোচনের সঙ্গে-সঙ্গেই নিঃশেষে বিলীন হবে রূপের, স্পর্শের ও অহুত্বের এত আপাতভিন্নতা।

একদিকে, সবই আনন্দ, সবই তার চেতনায় চিন্ময়, সবই অমৃত ও তুচ্ছ-তার সংক্রামণের অতীত; অন্যদিকে, একই মুক্তির পথ ধরে, সবই আঁপতিক, নিজস্ব আলোকবহিত, একমাত্র তারই আলোয় এত সত্যের এই বিভিন্ন রূপ, স্বতঃস্ফূর্ত সবই মায়। তবু, গভীরে, কোনো নগ্নরূপ শূন্য দিকে এই দর্শনের ইঙ্গিত নয়। তাতে জীবনের সকল শক্তি ও প্রকাশ একীভূত হয়েছে এক বিরাট অরণ্যের মতো, বায় সহস্র বাহক একেবারে বৃক-মণ্ডা লয়ে নটরাজ নাচাচ্ছেন স্রষ্ট ও সংহারের তুমুল তাণ্ডবে। যদিও গভীরে, দৃষ্টির অগোচরে বা মৃদুকানো, তা অনন্ত শান্ত, তা অজল প্রশান্তির জ্যোতি। যে-হৃদয় এক ও অবিভী, যেজায় সে ছুটিয়েছে এত বিপরীতের দ্বন্দ্ব, স্বহৃদয়ের মধ্য দিয়ে আনন্দ পাবে বলে, নিজেকে অহুত্ব বরণে বলে, নাচবে বলে, নাচাবে বলে জন্ম-মৃত্যুকে, মুক্তি-বন্ধকে, ভালো-মন্দকে। সেই নটরাজের পায়ের তলায় পড়ে আছে পায়ের বায়নরূপী অপমায়, এবং, কাঁঠের মধ্যে যেমন তাপ নিহিত থাকে, সকল আত্মা ও জড়কে সে জাগিয়েছে তার নৃত্যের স্পর্শে, তাদের নৃত্য করাচ্ছে ঘুশির ভরদে।

এবং এই ঘুশিটাই সবচেয়ে বড়ো কথা, স্রষ্টার সব-কিছুর পিছনে এই ঘুশিটাই কাজ করে থাকে। স্রষ্টার আঘাতে যে ছিল এক, সে হতে চাইল

বহ। কেন? কারণ তার আনন্দ পাবার বায়না, বিচিত্রের মধ্যে নিজেকে অহুত্ব করার বায়না। তবে সেই বায়নার মধ্যে নিহিত ছিল এক প্রচণ্ড বেদনাও, যা একের বুক কাটিয়ে দিয়ে কোটালো ফুল, গাছ, মানুষ, পশু, পাখি, স্বপ্ন, দ্বন্দ্ব, জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, ঘৃণা ও আত্মা কত কী। আদি স্রষ্টার এই একই মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে মর-জগতের মাহুষের স্রষ্টার ক্ষেত্রে। সকল স্রষ্টার আগে, ও পরে পাঠকের রসাধারনেও, কবির বেদনামিশ্রিত আনন্দের রূপ আদি স্রষ্টার বেদনার অহুত্ব। কিন্তু এই বেদনা বা বিশ্রলভ, ও বোললোয়ারের হৃদয়ের জন্ম 'nostalgia' এ ছুই এক বসন্ত নয়, যেমন এক নয় বোললোয়ারের হৃদয়ের ধারণায় 'bizarre'-এর অংশ ও তারতীয় রসের অনৌক্ষিক।

হৃদয়ের এর চেয়ে কোনো হৃদয়বতর ব্যাখ্যা আমার পরিচয়ে নেই। অতর্কিত, ও একই সঙ্গে, অত কোনো জীবনদর্শনই নয় এত সম্পূর্ণ, এত বিদ্বান ও এমন চির-আনন্দিক। তাই চুপ করে থাকব যদি বাংলা-দেশের বিশিষ্ট কেউ-কেউ বলেন যে এই অমৃতের আত্মনা তাঁদের এমন ভিজে গামছায় অহুত্ব দিয়ে, বহু ব্যবহারে তাতে আজ লোপে আছে শুধু এক পুরানো মিষ্টি গুড়ের আখ্যান, এবং তাকে সম্বন্ধ করতে হলে এবার চাই পশ্চিমী পাণের চেতনা।

বোললোয়ার বা তাঁর কাব্যের মাধ্যম নিয়ে প্রশ্ন নয়—তাকে ভালোবাসলাম, তাঁর সায়নে নতজাহ্ন হলাম। আবার বলি, সেই কাব্যের অহুত্বের ফলে বাংলা সাহিত্যে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ হয়েছে ও হবে, সন্দেহ নেই। আমি শুধু ছুইকে ছুই হিসেবে দেখাতে চেয়েছি, প্রার্থনা করে তাদের এক। এবং, সবচেয়ে বলি, হৃদয়ের অবকাশ কোথায় যদি ধরার মতো করে ধরতে পারা যায় অমৃতকে?

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৬

তিনটি কবিতা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

দুঃখ

তবু কি আমার কথা বুঝেছিলে, বেনেবউ পাখি ?
যদি বুঝতে পারতে
নারী হ'তে ।

আমাকে বুঝতে পারা এতই সহজ ?
কান্নকেই বোঝা যায় নাকি !

শুধু ব'হে যায় বেলা, ঈশ্বর নিখোঁজ ;
কিন্ধা বৃষ্টি এ-দুখে পোশাকি,
না-হ'লে কী ক'রে আজো বেঁচে আছি রোজ,
বেনেবউ পাখি !

কুসংস্কারের শিল্প

মুছি না পারের ছাপ ; ফুলের পাপড়িতে
তবু পরিপাশ আঁকি ;
সিন্দূর পরাই এয়ায় বুদ্ধার মতন
একান্ত নিভৃত ।

পই ছিটিয়ে দিতে বলি নোটন-নোটন পায়বাদের ;
দধিমদনের আয়োজনে
বাঁধা দিই না, মাদলিক ভাঙ করি পুর্ণিমা চাঁদের ।

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩

আর যদি ডান চোখ কেঁপে ওঠে, ডরে
আমারো তো মেদিনী বিদরে ;
বউ-ঠাংহুশানীর হাট কমনীয়তায় কোঁতুহলী
সন্ধ্যাবেলার আগে কেন তাকে চুল বাঁধতে বলি ।

বেঁচে থাকা

নতুন মুখোশ পরো, নতুন মুখোশ পরো—
মুখ যদি রাখতে চাও, তবে
একবার ফুল হ'য়ে ফুটবে,
আঁরবার শুধু পত্রের বুক, বেহেতু পুষ্পেরও
অহংকার পুরাতন, মরণে ও মিলন-উৎসবে ।

কৃত্তপরিবর্তনের রড়া ছুঁব ।
ভালোবাসা মুহূর্তভঙ্গুর ? তবু বেঁচে থাকা ভালো ।
বিপুল-বিপলে শুধু বৃকের পালক
ঝ'রে যায়, ঝ'রে যায়, মহাজন নিটুয়, উগ্র ;
শরীর বদল ক'রে চোবাই করবে দুঃখতাপ ?
মেটাও নিশ্চিত নয়, আজ যা গোলাপ
কাল তা বরলে হয়তো ক্ষুধার্ত পুরুষ । আর আজ
ব্রহ্মপুঙ্খ পুঙ্খ খে-জন,
সে বৃষ্টি মৃত্যুর পর কাঁটপতরের প্রজনন ;
জীবন অন্তত এক পাঠযোগ্য ভাষান্তরন,
আত্মহত্যার ম'রে নেই কোনো কাঁদ ।

এসো, বাঁচি, কৃত্তপরিবর্তন সবেও,
বাঁচিয়ে রাখতে হবে মৌল মৃতদের ;

কবিতা

চৈত্র ১৩৩৬

বাঁবা রোদুয়ে, ঠাণ্ডা রাজিবেলায়
বাদের জীবন থেকে বাঁচবার উৎসাহ রাঁয়ে যায়,
কাছে এসে, চলো বাই মুহুর্তকে গভীর ভালোবেসে
নতুন সুখোশ খুঁজি সিংহলে, জাভায়, শ্রীমদেশে ॥

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩

প্রাসাদ

আলোক সরকার

বড়ো-বড়ো থামের সামর্থ্য হৌত্র রাজপথ প্রশস্ত বিধান
নম্পন্ন ভিড়ের তীব্র রক্ত যেন উন্মুক্ত শোণান।
হয়তো আশ্চর্য তবু শোনো শাহদীর মন্ত্র, তোনায় অমল অবকাশ
প্রার্থনার বিরুদ্ধ অহঙ্ক ভাষা রূপ মাটি, কুৎসিত উঠোনে
হলুদ ফুলের পরিশ্রম—ছাইগাথা-বিক্ষত অধীর।
তবু স্বর, বিক্ষিপ্ত সংহত ধোঁয়া, তবু স্বর অসহ গোপনে।

মাটিকে মেশাই জলে ফুল আনি নতুন বীজের
অবারিত হাওয়া তবু প্রত্যক্ষ নিবিড় সেই প্রতিষ্ঠ প্রাসাদ
আর স্বর শহরের। 'প্রিয়তমা, অভিমান কোবো না প্রাণের
স্রোতখিনী জানো। নিরন্তর যন্ত্রণা বিধায়
আমিও কি পর্দা-গড়া জানানার বিজ্ঞানার মমতা আশ্রয়
সম্পূর্ণ বিবৃত। বুনো ফুল বিবর্ণ পাতার অর্থ নাও।

সিঁড়িটা সার্বক যার পরিচিত দালানে নির্ভয়,
রীতির প্রগতি—আমি সম্মানিত মাথা নত করি।
দালানের প্রপিতামহের ছবি বড়ো ঘর মুহুর্তে উধাও;
একটি আকাশ এক নীলিমার রহস্ত অরব বিভাবরী
তাকে আমি শুধু চিনি, সে আমাকে নন্দিত রঙের কারুকাজে
ছন্দিত সাজায় এক সম্পূর্ণতা।

পাশাপাশি সার্বক প্রেমের লগ্ন প্রেম এক স্বতঃস্ফূর্ত উবা
স্বস্তির উজ্জল সাল। উচুনিচু মাটির বিরুদ্ধ হাওয়া ভীষণ আঁগুয়ালে।

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৬

বিবিধ ফুলের রং নীরল বিদেশ। ভাখো স্থির মাঠ শেব হ'লো
আর-এক দেশের আরো বড়ো অমাবস্তা বাস্তি নিঃশব্দ বেশভূষা
দরিত্র হাতের ভাষ্টি। প্রিয়তমা
দীপ্ত প্রানদের ঘর নিবিড় বিখাসে, মনে আজো রক্ত জলোজলো।

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩

ছটি কবিতা

বংশীধারী দাস

তিরিশ পৌষের রাত

তিরিশ পৌষের রাত সমস্ত ইন্দ্রিয়ে যুত্থাহিম
ভীক্ হাওয়া ছুঁড়ে কাল ব'লে গেলো : বিজ্ঞাত যুবক,
টবের সীমায় এই এক টুকরো মৌলবের শব্দ
সে-ও তোর জন্তে নয়, জাখ ওই পাগড়ি-বসা ফুলে
তোর স্বপ্নসাধগুলো পেয়ে গেছে সার্থক রূপক।

তিরিশ পৌষের রাত চিন্তার চাদরে জড়োসড়ো
বিমূঢ় পৌরুষটাকে ব'লে গেলো : অকৃতী যুবক,
তাদের ম্যাজিক তোর অনায়ত্ত, তাই সব ছক
কার্যক্ষেত্রে এলোমেলো হ'য়ে যায়, এবং কখনো
চিন্তা ও কর্মের দ্বৈতে সংযুক্তির মেলো না শড়ক।

তিরিশ পৌষের রাত চারিদিকে নিষ্পন্দ অসার
অস্তিত্বকে লচকিত করে বলে : বিমূঢ় যুবক,
এই পাট নির্জনতা, এই হিম, বিবর্ণ পাতার
বন্থন শব্দ—জাখ, এরা তোর চেতন সত্তার
গভীরে হঠাৎ বেন হ'য়ে গেলো কালজ পেচক।

তিরিশ পৌষের রাত কুরাশার ছর্ভে প্রতীকে
গুপ্তিভই থেকে যাবে ?—গ্রন ছোঁড়ে উত্তির যুবক ;
জাখে, সেই বিজ্ঞ পেচা উড়ে যায় অস্ত্র এক আকাশের দিকে।

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৬

আমরা তিনজন

দীপক, সমর, আমি—আমরা তিনজন
একালের লক্ষ্যেই মায়ক অর্জন
অর্থ, প্রেম, কীর্তি, যশ জীবনের সাকল্যের মীন
স্বয়ংবরা যে-কুশীন ঋণদ-সভার
সেখানে অশুশ আমরা জেনে নিয়ে, বিকেলের পলাতক রোদ
গায়ে মাখি পার্কের বেকার বেঞ্চে বেওয়ারিশ ঠাই বেছে নিয়ে।
ফুটপাথে চায়ের বোতালো এক অনার্জিত ভাষাটো বিকেল
বধির আকাশটাকে ব্যাধ করে স্থপট বিদ্রোহে;
দূরে, জাখো, সার্থক ছেলেটা তার টাই-এর বাহারে
পবিত্র ভদ্রিতে হাঁটে, হাতে তার সাকল্যের তীর
হাতে তার অত এক শব্দ-শাখা হাত
অভূত রোমাঞ্চে কাঁপে, ওর দৃষ্ট কর্তব্যের বিকেল চঞ্চল।

দীপক, সমর, আমি—আমরা তিনজন
আমাদের অস্তিত্বকে ঘিরে ব্যরে অনাদৃত হলো ফলগুলো,
অদূরে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘসেহ পাসপাছ প্রেতচ্ছায়া নিয়ে
সমর, যৌবন যেন তন্ত্রিত রয়েছে তার নিষ্পন্দ শাখায়,
ফান্ডনের হাওয়া এসে বন্ধ হাসি ছুঁতে দিয়ে গেলে
বিস্ত্র চিনেবায়ের নিষ্প্রাণ খোঁগায়।

দীপক, সমর, আমি—আমরা তিনজন
শহরের স্রাস্ত্র হৃৎ অন্তগামী দেবে
পুনরীর উঠে দাঁড়ালাম;
কায় ছায়া আপো পড়ে?—অসমর্থ এ-দেহের? না কি ওই মৃত শহরের?

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩

ছুট কবিতা

স্তব

ফুটপাথে কোটে ক্লষ্কড়ায় দিন
বাঁকানো রোদের বেধাটি সাজানো ঘরে,
কে বলে শহরে শুধুই জীবিকা, ঋণ;
অমরাবতীও তোমারই কর্তব্যে।

বন্ধু জানায়, তুমি বহুবলভা,
তুমিই বনো না তাতে কিবা যায় আসে
পরিমাপ? সে তো বণিকেরা ভালোবাসে;
স্রাস্ত্র না হোক বাহর মহোৎসব!

ছদ্মকে জানালা, মধ্যে অন্ধ গুলি
ধোঁয়া পাক খায় সন্ধ্যার নিখাসে
লক্ষ বৃকের সন্ধ্যের পথাবলী
দেয়ালে-দেয়ালে মাথা ফুটে ফিরে আসে।

হঠাৎ কখনো প্রমত্ত সংঘাতে
আখিরে আসে ঝড়,
কৈপে ওঠে তরী মাতাল বজ্রাবাতে
জাগে নির্ভীক লক্ষ কর্তব্যর।

সমুদ্রে নীল নির্জন আকাশে
পারিণ্য এনেছে ক্লেবনমুখর দিন,

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৬

উপযাচকের মতো কেন ফিরে আসে
কামনা আমার, অথই আমার স্বপ্ন।

বড়োদিনের ছুটিতে

ভারমণ্ডহারবারে গিয়ে পাঁচজন অন্নান যুবক
পিকনিকে যেতেছিলো প্রভাতের গোঁজহীন গম্ভালা থেকে,
সকাল দুপুর সন্ধ্যা ন'ঘণ্টায় পরিতৃপ্ত শব্দ
শেষ বাস্-এ ফিরে এলো লোকায়ত উত্তেজনা মেখে।

ছ'জন ছাত্রের সঙ্গে বাঁশ খেয়ে তিনজন বিস্কুট কেরানি
ভিন্ন রূপে ফিরে পায় কান্তিমান কৈশোর শৈশব
উত্তেজক স্মৃতিপুঞ্জ আঙুরের আঁরকের মতো,
নিশাথে পোড়ালো তারা মৃত্যুহীন সময়ের শব্দ।
সম্মুখে পকেটে পুরে পাঁচখানা অচল দুয়ানি
প্রাণ ভরে হেসে নিলো বাতাসের সঙ্গে অবিরত।

সিনেমা সাহিত্য নারী বৌনত্ব রাজনীতি পান
শেষ হলে যুবকেরা ভুবে গেলো যুধীন্তের রঙে,
সন্ধ্যার জৌপদী দিলো পাঁচ হাতে পাঁচ খিলি পান
পাঁচটি শৈশব-স্বপ্ন ঘুরে এলো পারী ও হংকং-এ।

এবং অচরিতার্থ বাসনার শতজিহ্বা তুলি
রক্তধাসে ভরে নিলো জীবিকার যুদ্ধজরী এ-পঞ্চপাণ্ডব,
দুসর অজ্ঞাতবাসে জ্ঞানাত্মকে নামলো গোবুলি
পাঁচটি বিপন্ন বৃকে পাঁচখানি অলস বাণ্ডব।

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩

শহরে কিরলো তারা, বক্তৃত্রোতে ফসিলের মতো। পূর্বসূরী
সামাজিক সত্যতার অর্থহীন পঞ্চম ঋতুতে;
ঘাতক স্বভিত্তি হাতে নিরস্তর বক্তৃতাখা ছুরি
সদরীয়ে পাঁচজন পরিতৃপ্ত পঞ্চভূতে ॥

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৬

তারকা-গ্রহর

শান্তিকুমার ঘোষ

আমাকে একটু দাঁও।

আমার অধর রাখি তোমার কপালে।

দীর্ঘ হাত শুয়ে নিখুঁত সখ-কিছু কোমলতা উজাপনদির।

তোমার অস্তিত্ব শুধু উল্কাভার অহুতবে।

আলোকবর্ষের পারে যদিও এখনি যাবে

নক্ষত্রফেনার মতো তোমার তরুণ গ্রীবা, গ্রীবার কবরী :

এ-মহুর্ত আমাদের—আমাদের তবু।

*

জন বেড়ে উঠে আসে পাড় ভেঙে ঘুম ঘেন বৈকালী জোয়ার
লাফ দিয়ে ছুঁতে চায় কেবলি তোমার বাহ—নিখল আকোশ...
ছাড়বে না সদ তবু তুখোড় ছোকরা সেও যুবতীর পিছে।

সেতুতটে প্রায়লীন শরীর তোমার জলে আকাশরেখার :

রূপ ঘেন দারা দেহে পাতাগুলি আলোকিত লাল তামা বোদে।

অহুতি পাট হোক...হৃদয় আরো তীর করে। ইন্ডিয় আমাব।

*

যতই শাসন করে, উদ্দাম যুকের তাল হবে কি প্রহৃত ?

অপেক্ষার দিনরাত্রি, আশা বিদ্যারপঙ্কজ—আশার সকার

মহুর্তের মুহূর্তগুলি ফলবান হয় যদি ঈশ্বিত প্রহরে।

*

২১২

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩

জোড় বেঁধে বহুব্র রাজহংস চ'লে যায় বিপরীত স্রোতে।

নিমেঘের দীপ্তি মুছে অন্ধকার নীচে ফের ব্যগ্নাবিহীন।

আকর্ষণক্ষেত্রে টানে আঙনের পুঞ্জ এক নক্ষত্রপ্রেমিক।

*

এবার একটু দাঁও।

তোমার কপালে রাখি আমার অধর।

এখনো যায়নি সব প্রাণনের যুগে।

কপিত পাতার মতো ক্লম্ব এখনো ধরে

বসন্তের বেগ। দৃষ্টির চুখনে আজো খোঁজে অমরতা।

উন্মুখ, অস্তিত্বের যদিও সমস্ত প্রাণ

দুবস ঘনার রক্তে : বিপুল আসন্ন গতি—জ্ঞত বিকর্ষণে।

২১৩

অনেক রাত্রির মতো

অনেক রাত্রির মতো আরো এক রাত্রি এলো, তার
একটি নামাত্র যুম অবশেষে অন্তহীন হ'লো :
নিঃসঙ্গ শোবার ঘর, বাতি নেবা, জানালার ধারে
সহস্র দেখেছে শুধু এক ফালি বিদেশী আকাশ।

তোমাকে সমুদ্র নিলো : শান্ত নীল অতল জলের
আলোয়ে তোমার কিছু কোনোদিন আর হারাবে না :
সেদিনের শীর্ষ বাহু মেলে দেবে প্রবালের তাল,
যে-চোখ বিষয় ছিলো তারা দেখে মুক্তা হ'য়ে যাবে।

এবং আমরা বাবা পরিশ্রান্ত মাঝিক এখানো—
ছোটো-ছোটো যুগ্ম ছুয়ে বিচ্ছেদের বোঝা ব'য়ে-ব'য়ে
এ-জীবন বর্তটুকু দিতে পারে তারও চেয়ে বেশি
অনেক আশ্বাস নিয়ে মানচিত্র পার হ'য়ে যাবো :

আমাদের স্বপ্নে আজও হোলো ছেয়ে সোনালি পশু,
নৃতন বন্দরে আরো অপেক্ষিতা নৃতনা প্রেমী ॥

চিঠিপত্র

জীবনানন্দ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

‘কবিতা-সম্পাদক সনীপণ্ড,

‘কবিতা’র গত আধিন সংখ্যার প্রকাশিত ‘জীবনানন্দ দাশ ও মানিক
বন্দ্যোপাধ্যায়’ প্রবন্ধটি নামা কারণেই উল্লেখযোগ্য। ওতে ভাববার কথা
অনেক আছে; অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে লেখক অনেক ভেবেছেন, অনেক
পড়েছেন। প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হ'লো জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মধ্যে ‘প্রতিদাম্য’ স্থাপনা। লেখক সফল হয়েছেন এ-কথা বলি না। এই
ধরনের লেখা পড়বার আগে যে-ছটি ঘটনা আমি চোখের সামনে রাখি, তার
একটি হ'লো টমাস মানু-এর ‘গ্যোটে ও টলস্টয়’, অর্থাৎ বুদ্ধদের বহুর ‘এক গ্রীষ্মে
দুই কবি’। আমি আশা করেছিলাম, ঐ ছটি প্রবন্ধ থেকে পাঠ নিয়ে
জ্যোতির্বিদ্য দত্ত তাঁর লেখার হাত দেবেন।—কিন্তু নিরাশ হয়েছি। লেখক
বা করেছেন তা হ'লো জীবনানন্দ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুড়ি ছ'য়ে-ছ'য়ে
বাংলার সাহিত্যমহলে কানামাছি খেলা। তিনি এক নিম্নাঙ্গে অজ্ঞাত জীবিত
ও মৃত কবিদের সমুদ্রে বাছা-বাছা কথা ব'লে নিয়েছেন—যেন তাঁর আগে
কেউ ব'লে দিয়ে তাঁর অত সাম্যের কথাগুলোকে নষ্ট ক'রে দেবে, সেই ভয়ে
একই প্রবন্ধে তাঁকে হুড়মুড় ক'রে সব কথা ব'লে ফেলতে হ'লো। টমাস
মানু-এর ‘গ্যোটে ও টলস্টয়’ প্রবন্ধে প্রকৃতি ও শিল্প, ঋষি ও দেবতা, ব্যাধিমন্দিরে
অনবরত চক্রবুদ্ধিহারাে পাক বাচ্ছে; এক বৃত্তে আছে গ্যোটে ও টলস্টয়,
অত্র বৃত্তে শিলার ও ডক্টরেভস্কি—কিন্তু কোনো সময়েই সার্কারের রিডের
খেলা ব'লে মনে হয় না—মনে হয় না তুলোর বস্তার কাঁপ দিয়ে পড়া—বা
হয়েছে জ্যোতির্বিদ্য দত্তের প্রবন্ধে। জীবনানন্দ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শিল্পজগৎ, ‘দেবদাক-দীপের’ নির্জন জগৎ আর ‘শুসারের বাস হয়ে বাওয়া’
সেই ইন্ডিয়াজগতের দ্বন্দ্ববিক্ষোভ এ-প্রবন্ধে ফুটে ওঠেনি এক বৃত্তে। ‘এক
গ্রীষ্মে দুই কবি’তে আমরা দেখেছি একজন লেখকের ব্যক্তিগত গ্রীষ্ম কী-ভাবে

বোম্বেলয়ার আর ভট্টয়েভস্কিকে যমজ বলে আবিষ্কার করে নিয়েছে, নিয়ে এসেছে একই 'কবিতার ছায়াভরা জ্যোৎস্না'র মধ্যে। এ থেকে আসলও এই দুই 'কবির' অন্তরের স্বরূপকে আবিষ্কার করে পেয়েছি। জীবনানন্দ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একই মহৎ চৈতন্যের সন্তান, শিশুর মতো, 'প্রকৃতির দ্বন্দ্ব'—এসবই না-হয় মানলাম—কিন্তু তাঁদের ব্যাবির স্বরূপটি কোথাও ধরা পড়েনি এই প্রবন্ধে—তাঁরা প্রাকৃত, শৈল্পিক মন, বা শৈল্পিক হ'লেও স্বাধীনতা দত্ত বা বুদ্ধদেব বহুর মতো মন—তাঁরা না-হয় এখনকার মতো মনে নেওয়া গেলে—কিন্তু তাঁদের ব্যাবি, হৃৎস্পর্ক, আত্মহতা—এসব এলা কোথা থেকে? প্রকৃতি তো পূর্ণতা, শান্তি। এখানে মানু-এর ঐ বিখ্যাত প্রবন্ধের আশ্রয় নিতে হয়—সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, গোটে ও টলটল প্রকৃতির সন্তান হ'লেও, এবং সেইজন্যই, শরতাবির ও ব্যাবির চেতনার আত্মা—অন্ত পক্ষে ভট্টয়েভস্কি ও শিলার আত্মিক শক্তিতে বিপরীত বলেই প্রাকৃত বিদ্যোভকে উপেক্ষা করতে পারেন—বাইরের কোনো আত্মা তাঁদের স্পর্শ করে না। জীবনানন্দের মধ্যে সেই অর্থে বৃহৎ একজন টলটল ও একজন শিলার বিদ্যোভ—যেমন তিনি ঘাস-মাতার গর্ভে ঘাস হ'য়ে জন্মতে চেয়েছেন, আবার তেমনি 'বোধ' এবং 'আদিম দেবতার' কবিতায় শিলজগৎ ও ইন্দ্রিয়জগতের সংগ্রাসের ছবি একেছেন—শিল্পকে স্থাপন করেছেন 'ব্যবহৃত' রূপসী উর্ধ্বে—যা ইয়েটস করেছেন তাঁর বাইল্যান্টাইন কবিতা ছুটিতে—আর টমাস মানু তাঁর 'টোনিও জ্যোগার', 'ভেনিসে মৃত্যুর মতো গল্পে। জীবনানন্দের কাব্যেও প্রকৃতি ও চৈতন্যের এই স্বর্গ প্রতিফলিত হয়েছে, তাই তিনি, স্বাধীনতাযেব তুলনায়, 'মরল নিশাপ শিশু' মাত্র মন। তাঁর 'উর্ধ্বে গ্রীষ্মের মতো নিম্নতর' একপ্রশংসনিস্ট শিল্পী অভ্যর্থনা মুখের সেই বিশ্বগ্রাসী, স্বরবিদ্যারক চাঁৎকারের ছবিকেই মনে করিয়ে দেয়। ভট্টয়েভস্কিকে কি আসল নিশাপ শিশু মনে করবো—কেননা তিনি সুস্থির চাইতে বোয়িক বলে বোম্বেলিয়েন? অতিরিক্ত মন ও বিকৃতশিল্পন করেছিলেন বলেই তিনি নির্বিবেক স্বভাবের অরচন মন—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও মন তা। জ্যোতির্বিদ দত্ত নিজেই বলেছেন, 'স্বভাবস্বর্গ নিশাপ

কুম্ভকে তুলে ধরা হয়েছে মন আর শিল্পের সন্ধে তাঁর স্বর্গ বোঝাবার জন্যই। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' শিরোনামাতেই প্রমাণ করে যে অচেতনের সঙ্গে চৈতন্যের দ্বন্দ্বই তাঁর বিষয়—স্বভাবের সঙ্গে বিবেকের বিরোধ, দেহের সঙ্গে মনের। শশী কি চেতনা থেকে নিশ্চেতনার যাচ্ছে—না নিশ্চেতনা থেকে চেতনার—সে ছিলো কাককার নায়কের মতোই বুদ্ধিমান ও নির্দোষ—কিন্তু এই নির্দোষিতাই তার অপরাধ—সে ক্রমাগত অগিলি জানে—অজানতা কেটে যাচ্ছে—বিবেকের ভার নামছে তার উপর—তার চারপাশে অন্ধ নিশ্চেতনাই বিপরীত উদাহরণ দিয়ে তাকে চৈতন্যশালী করে তুলছে—টলার উর্ধ্বে স্বাধীনতার ছবি সে আর দেখবে না—দেখকে তিলে-তিলে আত্মঘাতী সংগ্রামে গিয়ে ফেল মন তাঁর মাথা বাড়ী ক'রে পাড়ায়। গাওদিয়ার সেই বোকা মেয়ে মতি 'পশুদের মতো'—আর যে-ছলকালসারী, অভিনেতা কুম্ভকে পর্বত তাক লাগিয়ে দিয়ে শেষের দৃশ্যে রেলের কামরাই প্রকাশিত হ'লে—এই দুই কি একই? আর জ্যোতির্বিদ তো নিজেই বলেছেন যে চরম স্বভাবতী উপাধান নিহিত রয়েছে 'যাদবের ইহকাল-পরকাল'ইন আত্মহত্যায়। জ্যোতির্বিদ দত্ত এই দুই কবির নিশীথ-বায়ের শিল্পজগৎটির উপর চোখ দেননি, নিজেকে আত্মক রেখেছেন এদের ইন্দ্রিয়জগতের মধ্যে। এই দুই কবির দেহ ও মনের দ্বন্দ্বের তীক্ষ্ণ বৃক পেতে নিলে এ-প্রবন্ধ তীব্র এবং আবিষ্কারধর্মী হ'য়ে উঠতে পারতো এবং লেখক নিজেই বুঝতেন যে 'স্বভাব-কবি বলতে যে অর্বাচীন উদ্ভাস বরা প্রকৃতির ছবি চোখে ভেঁসে ওঠে', এদের হৃদয়ের সঙ্গে তাঁদের কিছুমাত্র মিল নেই—আর এইকুণ্ড তিনি দেখতে পেতেন যে জীবনানন্দ শুধু 'জন্মের মতো জাগ্রত ইন্দ্রিয়' আর পন্ডার ছন্দ সখল করে আসরে নামেননি। যদি তিনি ঐ দুই কবিকে সহজ চোখে দেখতেন তাহ'লে স্বভাবকবির সঙ্গে তাঁদের পুরোপুরি মিল নেই বলে মন্তব্য করে গুরুর তাকে ধ্বংসে হ'তো না। 'বিদ্যারশ্মি' আর 'অচেতন' ভেদবোধে তাঁনবার গণ্যবোধও তাঁর বাহ্যিক বলে বোধ হ'তো। ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে হ'তো তিনি কলকাতাকে কোন কবি কেমনভাবে দেখতেন তার একটা জিরিস্তি দিয়েছেন,

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৬

আর-ওরই মধ্যে বড়ো একটা রক্ত ক'রে টেনে এনেছেন 'সেই চরিত্রহীন বাউণ্ডুলে,' 'সেই উচ্ছ্বল শব্দবিলাসী যুবক'টিকে কিন্তু আমরা ঐ কবির যুবা-বয়সকে তাঁর রচনা থেকেই কল্পনা ক'রে নিই ; 'মৌলিনাথে'র পাশে 'টোনিও ক্র্যোগার' রেখে পড়লেই তাঁর যৌবনের মধ্যে তাঁর শিল্পী-যুবক প্রবেশ করে—যে অবশেষে বোদলোয়ারের মতোই বলতে চায়, 'পাছে রেখা হস্ত হয় স্থগা করি সব চঞ্চলতা।' 'আজ তিনি প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করেছেন,' এ-কথারই বা অর্থ কী ? প্রকৃতি কি কবির ড্রেসিং গার্ডিন যে তাকে যখন স্থিতি পরিত্যাগ করা যায় ? 'যে-আঁধার আলোর অধিকে'র 'গাছ, ফুল, পুকুর, মেঘলা দিন', কি তারই প্রমাণ ?—'এরা শুধু গণিতের কঠিন সংকেত'—কিন্তু এরাই স্থিতি ও ভাষার মায়াজালের প্রভাবে, 'গা বেয়ে আঁড়ুলতা' বারিয়ে দেয়। কবিতা প্রাণ পায় এদের উপর কবির আত্মার আলো প্রতিকলিত হ'লে। তাই 'প্রাগৈতিহাসিক নীলিমা'কেও কবির প্রয়োজন। প্রকৃতিকে একেবারে খেলনা পুতুলের মতো পরিত্যাগ করলে, 'মেয়েদের হাতের আঁদরের' কুকুরটির 'হরিণ-চোখে স্বরণের ছবি' এঁকে দেবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর জাগতো না। এই শাপগ্রস্ত নির্বোধ প্রকৃতিকে চেতনার তীরে বিদ্ধ করবার জন্তই 'যথেষ্ট কবি' হবার সাধনা তাঁর।

জ্যোতির্ময় দস্তের প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশের ভাবনাগুলি খুবই উদ্দীপক। সত্যি মনে হয় নতুন কিছু পাওয়া গেলো। 'সে-দৃষ্টি হঠাৎ যেন কামড়ালো বুকে।' তবে থেকে-থেকে মনে একটা সন্দেহ জেগে ওঠে : মনে হয় তিনি মহাভারতে আত্মবিজয়ী ভীষ্মের মৃত্যু, 'আট বছর আগের একদিন', ও 'জন্তুর মতো জাগ্রত ইন্দ্রিয়ে'র জীবনানন্দ, যাদবের আত্মহত্যার অসাধারণত্ব, হোসেন মিঞার মধ্যে 'শিল্পীর উত্তর' (অন্তত এই জায়গায় এ. বোবা গেলো যে জ্যোতির্ময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার গূঢ়তা বিষয়ে সচেতন)—এইগুলিকে চমকপ্রদ ক'রে সাজাবার জন্তই এই প্রবন্ধ রচনা করেছেন। কিন্তু মূল বক্তব্য স্পষ্ট হ'লো না।

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪, ক্রমিক সংখ্যা ১০২

আগস্ট ১৩৫৭

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গল্পশিল্প
বুদ্ধদেব বসু

—
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তারাপদ রায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত,
লোকনাথ ভট্টাচার্য, বটকৃষ্ণ দাস, অমর ষড়ঙ্গী,
অমিতাভ খাস্তগীর, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
মণিচূষণ ভট্টাচার্য, আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন,
গোপাল ভৌমিক, মোহিত চট্টোপাধ্যায়

—
পোল ভেরলেন-এর দুটি কবিতা
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

—
ইন্দিরা দেবী স্মরণে
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কবিতা

বর্ষ ২১

বর্ষ ২২

বর্ষ ২৩

ও বর্ষ ২৪-এর

সম্পূর্ণ সেট

পাওয়া যাচ্ছে।

বহু মূল্যবান কবিতা

অনুবাদ-কবিতা

ও

প্রবন্ধের সংকলন।

প্রতি সংখ্যা ১।০০

প্রতি সেট পাঁচ টাকা

মাণ্ডল স্বতন্ত্র

* "কবিতা"র শতক (ইংরেজি) সংখ্যাটির
নগদ মূল্য দু-টাকা

কবিতা

সুন্দর
কেশগুচ্ছ



রেমেল
কেমিক্যালের

ক্যান্ডিডাইজিন
হেয়ার ক্রিম



কেশমূল সমাজে রূপ
ও কেশের অগ্রদিক্তর

রেমেল
কেমিক্যাল

কলিকাতা, বোম্বাই-কানপুর

কবিতা

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি প্রদর্শনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনস্মৃতি

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত চিত্রাবলী-বিস্তৃতিত শোভন সংস্করণ

মূল্য বোর্ড বঁধাই ১২২

এই সংস্করণে সুবিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় আছে

॥ অজ্ঞাত সংস্করণ ॥

কাগজের মলাটে সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপরিচয় সংবলিত : ৩০

বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয়সহ সাধারণ সংস্করণ যন্ত্র

সুচি

স প্ত ম থ গু

কাদম্বিনী দত্ত ও শ্রীমতী নিবারণী সরকারকে

লিখিত পত্রগুচ্ছ

মূল্য কাগজের মলাট ৩০০, বোর্ড বঁধাই ৪০০ টাকা

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

Invitation to Poetry

KAVITA 100

*international
English-language
number*

*Poems and
translations by*

A collection of contemporary poems, in English translation, from many Indian and Western languages. Ten languages and seven nations represented.

Rabindranath Tagore, Jibanananda Das, Sudhindranath Datta, Amiya Chakravarty, Premendra Mitra, Humayun Kabir, Buddhadeva Bose, Bishnu Dey, Samar Sen, Gopal Bhaumik, Naresh Guha, Umashankar Joshi, G. Sankara Kurup, Maithili Sharan Gupta, Mahadevi Varma, Sochi Raut Roy, Hans Egon Holthusen, Ingeborg Bachmann, Werner Rehfeld, D. J. Enright, Galway Kinnell, Dorothy Norman, Pierre Reverdy, Paul Gilson, Francesco Arcangeli, Rajeshwari Datta, Jyotirmoy Datta, Nikolaus Klein, Lila Ray, Sujit Mukherjee, and many others.

*A Note on Modern
Bengali Poetry*
Jyotirmoy Datta

Available :
KAVITABHAVAN
202 RASHEHARI AVENUE
CALCUTTA 29
Rs 2/-, 3 sh. 6d. or 75 cts.

‘কবিতা’র আগামী সংখ্যা

(বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৩৭)

সুধীন্দ্রনাথ-স্মৃতি-সংখ্যারূপে
প্রকাশিত হবে

প্রকাশের আনুমানিক তারিখ : ৭ ডিসেম্বর ১৩৩৮

অনুবাদ সাহিত্য

৩৬তম জিভাগে ৩ বরিস পাষ্টেরনাক

অনুবাদ—বীমাবী দত্ত ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতার অনুবাদ—বুদ্ধদেব বসু
সম্পাদনা—বুদ্ধদেব বসু

১৯৪০ সালের পূর্বরাষ্ট্রীয় বিবিসি-উপস্থাপন। রুশগণের স্ট্রেট মস্কোবায় এর প্রশংসায় পুষ্পিত। মৃত্যুর কয়েকবছর আগে পাষ্টেরনাক বলেছিলেন, 'আমি আমার মৃত্যুর রক্ত নিয়ে 'জাতির জিভাগে' লিখেছিলাম।' তেবত ও রুশ-এর পরে অল্প কোন বর্ণ বৈশ্বকর রচনায় রাশিয়ার রক্ত এমন অীতভাবে অনুভূত হয় নি। এই উপস্থাপনের দশ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে আমেরিকার আর পাঁচো তিন লক্ষ কপি ব্রিটিশ কমন্ওয়েলথ।

৥ দাম দ্বায়ে টাকা প্রকাশ ন. প. ৥

শেষ গ্রন্থ ৩ বরিস পাষ্টেরনাক

অনুবাদ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'জাতির জিভাগে' ছাড়া বরিস পাষ্টেরনাক একটি বাস উপস্থাপন লিখেছিলেন নোট 'শেষ গ্রন্থ'। এই গ্রন্থের মূল কাহিনীর ঘটনাকাল ১৯১৪ সালের গ্রীষ্ম বসু: হামিয়ার শান্তির ও স্বাধীনতার সেই গ্রীষ্মই শেষ, তখনও 'বালির প্রতি শব্দা ছিলো বীষণের, ফুলের চেয়ে ভালোবাসাই ছিলো সহজ ও খাড়াবিক।' ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক উভয় দিক থেকেই 'শেষ গ্রন্থ' স্মরণীয় গ্রন্থ।

৥ দাম তিন টাকা ৥

৩৭তম সন্ধান ৩ বাইট ও রাসেল

অনুবাদ—পরিমল গোস্বামী

বদমান কালের অস্তিত্ব স্ট্রেট মস্কোবায় হিসাবে বিস্তৃত বাইট ও রাসেল, মনে কি ভাবে সন্ধানিত করলে মৃৎকাল সত্ত্ব ও অসংলোভ্য করেছেন এই গ্রন্থ।

৥ দাম পাঁচ টাকা ৥

৩৮তম সন্ধান ৩ গল্প-সংগ্রহ [প্রথম খণ্ড]

অনুবাদ—দীপক চৌধুরী

মহৎ প্রতিভার চরিত্রকার হলেও হরক কথাসিদ্ধি রপেই তেমন যোগ্যেই বিদ্যাহিজের আসার সমর্থক নয়। শিরহফার উৎকর্ষ, চরিত্র-চিত্রের নিপুণতার ও কাহিনীর মনোহারিত্যে তেমন যোগ্যেই-এর এই গল্প-সংগ্রহের প্রতিটি রচনাই চিরকালীন সাহিত্যের অক্ষর সন্দর্ভ।

৥ দাম পাঁচ টাকা ৥

৳ই দুটি বেসল পালিশাশ-এর সংযোগিতার প্রকাশিত।



৩৭তম সন্ধান ৩ বাইট ও রাসেল

১৫ বক্সিস চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

৩৯তম সন্ধান ৩ বরিস পাষ্টেরনাক

- ৩ তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ স্তবোধ ঘোষ
- ৩ প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩ প্রবোধকুমার সাত্তাল
- ৩ অবধূত ৩ রমাপদ চৌধুরী ৩ বিজু-তি-তুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ সৈয়দ মুজতবা আলী
- ৩ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩ মনোজ বসু
- ৩ আশাপূর্ণা দেবী ৩ লীলা মজুমদার
- ৩ বিমল মিত্র ৩ বিক্রমাদিত্য ৩ বিমল কর

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

২, আশাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা বারো

জগৎহরাল নেহরু	বুদ্ধদেব বসুর নতুন বই	প্রাণতোষ ঘটকের
পত্র ও ছ	একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু	নতুন উপাশাস-রাজারাজার
দাম—৩০ টাকা	দাম—তিন টাকা	দাম—৩০ টাকা
ডঃ সত্যনারায়ণ রচিত	শতাব্দীর চরিত্রাধ্যায়	মহাচিন্মের ইতিকথা
হিমালয়ের অন্তরালে	দাম—৩০ টাকা	দাম—৩০ টাকা
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	সর্বপল্লী বাহারকুমার	দীপক চৌধুরীর
কাব্য-সংগ্রহ	সংকলিত	বড় এলো
দাম—৩০ টাকা	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	দাম—৩০ টাকা
নবরত্ন দেব ও	দর্শনের ইতিহাস	অমরাধর রায়ের
রাধাবাগী দেবী	সম্পাদিত	জাপানে ৩০
কাব্য-দীপালি	প্রথম খণ্ড। দাম—৩০	স্বাধীনতা সুরকার
দাম—৩০ টাকা		পৌরাণিক অভিধান
		দাম—৩০ টাকা

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪ বক্সিস চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গল্পশিল্প

বুদ্ধদেব বসু

রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখেছেন কবির মতো; তাঁর গল্পের গুণ কবিতারই গুণ; যা কবিতা আমাদের দিতে পারে, তাই তাঁর গল্পের উপঢৌকন। যদি কোনো বণ্ডপ্রলয়ে তাঁর সব কবিতার বই লুপ্ত হয়ে যায়, থাকে শুধু নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, তাহলে সেই প্রবন্ধ নাটক উপন্যাস থেকেই ভাবীকালের পাঠক বুঝে নিতে পারবে যে রবীন্দ্রনাথ এক মহাকাবির নাম।

হ্যাঁ, প্রবন্ধ থেকেও বুঝে নিতে পারবে। প্রবন্ধ: যাতে স্পষ্ট কোনো বিষয় চাই, বিশেষ কোনো পদ্ধতি চাই, যাতে যুক্তির সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে মীমাংসার দিকে পৌছাতে হয়—অন্তত সেইরকমই ধারণা করি আমরা—তাতেও এই অবিখ্যাত কবি পরতে-পরতে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন; যে-কোনো বিষয়ে যে-কোনো আলোচনার বিষয়টাকে ছাপিয়ে ওঠে তাঁর স্বব, ছাতি, স্পন্দন, বেগ, তরঙ্গ—এক কথায়, তাঁর ব্যক্তিবস্তু। অর্থাৎ, প্রবন্ধ যেমনটি হওয়া উচিত নয় বলে আমরা জানি—অন্ততপক্ষে পাঠশালায় যা শেখানো হয়ে থাকে—তাঁর প্রবন্ধ ঠিক তাই।

যাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের পক্ষপাতী নন, বা যারা মনে করেন আলোচনা-ধর্মী রচনার কবিতার গুণ দোষ বলে গণ্য, অতএব বর্জনীয়, আমি তাদের কথা বেশ বুঝতে পারি। এমনকি তাঁদের কথায় শার দিয়ে ফেলতেও লজ্জা হয়েছি মাঝে-মাঝে। সত্যি তো—রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে কত পুনরুক্তি, কত অবাস্তব অংশ, অনেক বলেও মীমাংসা বেন অস্পষ্ট থেকে যায়, গুরুমশাই-ধরলে 'বুঝিয়ে' যেন বলতে পারেন না। যুক্তির বললে তিনি দেন উপমা, তথ্যের বললে চিত্রকল্প; যেখানে পাঠককে স্বমতে টেনে আনা তাঁর প্রকৃষ্ট অভিপ্রায় সেখানে তিনি তীক্ষ্ণ ক'রে তোলেন তার ইন্ড্রিয়গুলিকে; যেখানে বুদ্ধির কাছে প্রমাণ দিতে হবে সেখানে তিনি বেআইনিভাবে আমাদের স্বপ্নের আর্দ্রতা সম্পাদন করেন। সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, ইতিহাস—এই সব

বিষয়ে, পূর্বোক্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও, শব্দার্থকার থেকে বক্তব্যকে তবু আলাদা করে নেয়া যায় ও চেনা যায়; কিন্তু—বা তাঁর প্রিয়তম ও অন্তরতম, সেই সাহিত্য বিষয়ে যখন আলোচনা করেন তখন কোনো বিশ্লেষণযোগ্য 'সাধারণ' মনে দুইত্ব হ'য়ে ওঠে; ভাঙে থাকে না কোনো পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞার্থ বা বিধান; কোনো স্থপতি হ'য় যথেষ্ট করতে তাঁকে অক্ষম বা অসিদ্ধক ব'লে মনে হয়, কিংবা কখনো তা ক'রে ফেললেও নিজেই সেটাকে যত্ন করেন—হয়তো বা পরমুহূর্তেই। মানতেই হবে, যে-অর্থে আর্কিটল, আনন্দবর্ধন বা মল্লিনাথ সমালোচক, সে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সমালোচক পৃথক নন।

তা না-ই বা হলেন; ঐ পদবি তাঁর প্রাপ্য কিনা তা নিয়ে তর্ক করবো না আমরা। শু' বনি: একাধারে সফোর্সেস ও আর্কিটল কি হওয়া যায়, বা একাধারে কালিদাস ও মল্লিনাথ—সেটা কি স্বাভাবিক, না কায়, না সম্ভব, না কি মর্ত্যলোকের পক্ষে সম্ভব; আর-এক কথা: হোমর ও সফোর্সেস যদি আগে জ'মে না যেতেন, তাহ'লে কোথার থাকতেন আর্কিটল; বাস্তবিক কালিদাস প্রভৃতি কবির সামনে না-দেখে কোনো আনন্দবর্ধনকে কল্পনা করতে পারি কি? সাহিত্যব্যাপারে সৃষ্টিকর্মই প্রধান ও প্রাথমিক, সমালোচনা তার অন্তর্গামী মাত্র; এবং কোনো উত্তম সৃষ্টিশীল প্রতিভা যখন সমালোচনার হাত মেনে তখন তাঁর পক্ষে যা সম্ভব হ'তে পারে তা 'সমালোচনাকেই' সৃষ্টিকর্ম করে তোলা।' এই কথাটা রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন; তাঁর প্রবন্ধের আলোচনার এটি মনে রাখতে হবে। মেনে নিতে হবে, পুণ্ড ও গুপ্ত রচনা মিলিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে-অখণ্ডতা প্রকাশ পাচ্ছে সেইটাই তিনি; কোনো পাঠকগোষ্ঠীকে হুঁশ করার লক্ষ্য তা ছাড়া অজ কিছু তিনি হ'তে পারেন না; আমরা গ্রহণ করি বা না করি তিনি অনবচ্ছিন্নভাবে তিনিই থেকে যাবেন। তাঁর পুণ্ড অতিভাবী? তাঁর কবিতাও তা-ই। অলংকারবহুল? অস্পষ্ট? উজ্জ্বলপ্রসঙ্গ? তাঁর কোনো-না-কোনো পর্যায়ের কবিতা বিষয়ে এর প্রত্যেকটি কথা সত্য। যেমন 'বসন্তথাপনের' মতো গল্পরচনায় তিনি প্রবন্ধের আকারে কবিতা লিখেছেন, তেমনি কবিতার আকারে প্রবন্ধ লিখেছেন 'এবারে কিরাও

যোরে' বা 'বহুস্বর'। আমরা তাঁকে দোষ দিতে পারি সাহিত্যে বর্ণসংকরতা' দৃষ্টিয়েছেন ব'লে; পুণ্ড কবিতার রীতি, ও কবিতার পুণ্ড বিষয়ের সঙ্গার ক'রে তিনি উভয়েরই কতি করেছেন এমন কথাও স্বীকার্য হ'তে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে-প্রশ্নটি সত্যতবে জরুরি হ'য়ে ওঠে তা এই: আমরা তাঁকে বর্জন করতে পারি কি? রবীন্দ্রনাথের দোষগুলি শিশুদের মতো সরল, কোনো ভান নেই তাদের, আত্মগোপনের কোনো চেষ্টাই নেই, নিজের ব্যক্তি আভিনায় ব'লে অভ্যস্ত সহজে তারা খেলা করে, দর্পকের হাতে ধরা প'ড়ে যেতে ভয় করে না, বরা প'ড়ে গিয়েও মলিন হ'তে জানে না। এক বিরাট প্রতিভার আশ্রয়ে খেয়ে-প'রে বড়ো হচ্ছে তারা; যেমন তাদের দ্বাসপ্রাপ্তির লক্ষণ নেই, তেমনি তাদের উৎসাহল সেই প্রতিভাও পরাক্রান্ত; প্রয়োজন হ'লে তা বজ্রপাতের মতো অবিশ্বাসীকে বিদীর্ণ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সেই লেখক, যার দোষ আমরা যে-কোনো-কোনোদিন ধরতে পারি, আর থাকে না-হ'লে আমাদের কারোই এক মুহূর্ত চলে না। আর এখানেই তাঁর চরম জয় যে তিনি অপরিহার্য: তাঁর দোষগুলিকে ছাড়তে গেলে তাঁকেই ছেড়ে দিতে হয়, তাই সব দোষ নিয়েই—যখন মনে-মনে তাঁর 'বিক্রমে' তর্ক করছি তখনই সব দোষ নিয়েই তাঁকে বরণ ক'রে নিতে হবে; উৎকর্ষের অজ বহু উদাহরণ তাঁকে মান ক'রে দিতে পারে না, যেমন পারে না বহু তাঁরীর স্মৃতি গৃহদেবতাকে অপসৃত করতে।

কিন্তু কোন অর্থে অপরিহার্য, কোন অর্থে গৃহদেবতা? তিনি 'কথা ও কাহিনী' না-লিখলে মধ্য বিচালয়ে পড়াবার মতো ভালো বাংলা কবিতায় বই পাওয়া যেতো না, সেইজ্ঞত? 'জনগণমন' রচনা না-করলে সর্বভারতে সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য জাতীয় সংগীত দ্ব্যপা হ'তো, তাই? 'শ্রীতিবতন' প্রথম না-করলে উৎসবে, অঙ্গপ্রাশনে, শ্রাদ্ধবাগনে, ও চলচ্চিত্রে নারীকা-কর্কট গীত হবার মতো সংগীতের অভাব ঘটতো ব'লে? না কি তাঁর প্রবন্ধের ভাষার থেকে বক্তৃতায় ও সাংবাদিক রচনায় উদ্ভূতিযোগ্য যখন আমরা অনবরত পেয়ে বাজি, সেইজ্ঞত? বাংলাদেশে ও সর্বভারতে তাঁর

যে-প্রাতিষ্ঠানিক মূর্তি স্থাপিত হয়েছে—যাকে বিগ্রহ বললে ভুল হয় না—তার উপর কোর দিতে চাচ্ছি না আমি; যেখানে আমরা উঠতে-বসতে তাঁর নাম করছি, প্রায় যে-কোনো অস্থান আশ্রয় করছি তাঁকে শ্রবণ করে, প্রায় যে-কোনো সভ্যদের সমর্থকরূপে দাঁড় করছি তাঁকে, সেখানে তিনি সর্বদ্বন্দ্বের স্বতঃপ্রাপ্ত আশ্রয়, আমাদের আশ্রয়স্থানের পক্ষে প্রয়োজনীয়, সহায়ার একটি প্রতীকরূপে সর্বভারতের পক্ষে অপরিসীম। কিন্তু ও-রকম বিনাযায়ে কোনো পাঠক তাঁকে পেতেই পানেন না (কেননা পাঠক হ'তে হ'লে নিজের উপর দায়িত্ব নেবার শক্তি চাই); তাঁর রচনার মধ্যে প্রবেশ করতে হ'লে তাঁকে উপার্জন করে নিতে হবে আমাদের; তিনি যে একজন বড়ো কবি বা ভালো কবি, এই মোটা কথাটাও আমাদের আবিষ্কারসাপেক্ষ। আর, একজন পাঠক হিসেবেই আমি বলতে চাই যে দোষ তাঁর যতই দেখতে পাওয়া যাক, তাঁকে না-হ'লে আমাদের এক দণ্ড চলবে না।

কিন্তু এক বাছাই-করা রবীন্দ্রনাথ কি সম্ভব হয় না? আমরা কি পেতে পারি না বাছা বাছ দিয়ে তাঁর বাণী, উজ্জ্বল বর্ণন করে উপলব্ধি, কিংবা তাঁর 'শ্রেষ্ঠ' রচনার সমাহার? সেটা সম্ভব নয় বলতে পারি না, বরং আমরা মানতে বাধ্য যে তাঁর মতো অতিপ্রজ্ঞ লেখকের পক্ষে সংকলন একটি উপকারী চিকিৎসা। সে-দিকে তাঁর নিজেরও অহুদাঙ্গী সম্পাদকদের প্রয়াস দেখা গেছে, সাহিত্য-আকাদেমির এই গ্রন্থেও* সে-চেষ্টা প্রতীয়মান। ভাবীকালেও, তাঁর রচনা থেকে চয়নের প্রয়োজন নিবৃত্তির অহুদুত হবে মনে হয়, কেননা তাঁকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি; কোনো বিদেশী অথবা নতুন পাঠকের কাছে তাঁকে উপস্থিত করতে হ'লে প্রথমেই তাঁর বহুশ্রুতি ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে চাই—'জানেন তো, তিনি স ব র ক য লেখা লিখেছেন, আর প্রায় এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে-লেখেননি।' পাছে কেউ ভাবে যে তিনি শুধু কাণ্ডকৌশল পলাবলি লিখেছেন তাই আমরা

* সাহিত্য-আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'নিবন্ধমালা' দ্বিতীয় খণ্ডের সুনির্মাণ।

চেষ্টা করি তাঁর সমাজবিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে ভুলে ধরতে; পাছে-কারো ধারণা হয় যে ঐশ্বরকে ভালোবাসার কলে জগৎটাকে তিনি দেখতে পাননি তাই আমরা 'গল্পগচ্ছ' বুটে-বুটে তাঁর বাস্তববোধের উদাহরণ বের করি। এই সবই সংকর্ষ, তাঁর বিষয়ে আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক, কিন্তু তাঁকে প্রদক্ষিণ করার পরে বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সদ্গন্ধগ্রহণে যখন উত্তত হই তখনই ধরা পড়ে যে গভীরতম অর্থে তিনি কবি, কবি ছাড়া আর-কিছুই নন। এক উৎপ থেকে, একই উৎসাহের প্রেরণায়, তাঁর বিখ্যাত ভিন্ন-ভিন্ন 'দিক'গুলি বিকীর্ণ—ঠিক যে-ভাবে 'নির্ভর'ের 'দগ্ধভদ্র' কবিতার বলা আছে—থোপে-থোপে ভাগ-করা' মন নয় তাঁর, সাময়িকভাবে জুড়ে-দেয়া কিন্তু আগলে সম্পর্কহীন অনেকগুলো গাড়িকে এড়িয়ে মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে না; তাঁর সব বৈচিত্র্য এমন প্রতীহত ও অপ্রতীহতেরা জলশ্রোতের পতিত্বি। 'কবি রবীন্দ্রনাথ', 'উপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ', 'প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ'—এই বিভাগগুলিকে তাই অস্বীকার না-ক'রেও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করা যায় না; পরস্পরে প্রতিষ্ঠা তারা, পরস্পরের উজ্জীর্ণক ও পরিপূরক, এবং এক অখণ্ড সত্তার প্রতিকল্প। যে-মৌলিক উপাদানে রবীন্দ্রনাথ গঠিত সেটা কবিশক্তি, সেটাি তাঁর গভীরতাকে সূত্রায় ও সার্বক করে তুলেছে; আশুন যেমন যে-কোনো ইচ্ছনে ভাবের, তেমনি তাঁর কবিশ্রুতিও যে-কোনো রূপকরে প্রদীপ্ত; দীপ্তির ভারতম্য নিশ্চয়ই আছে; নিশ্চয়ই 'নোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে ও 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধমালায় কবিরেব একই প্রকার ঘনতা নেই; কিন্তু কবিতার দ্বারা স্পষ্ট ব'লেই তাঁর প্রায় যে-কোনো সমস্তই কিছু-না-কিছু যৌবনশোণিতা লক্ষ করা যায়—হোক না তাঁর প্রসঙ্গ পুরাতন বা বক্তব্য স্থগিচিত বা উপদেশ আভ্যন্তর থেকে আসা। হাড়ে-হাড়ে কবি নয় এমন কেউ কি লিখতে পারতেন 'ছেলে-ভুলানা ছড়া'র মতো, সখাচোচনা বা 'বাংলা ভাবাপরিচয়ের' সুবন্ধ, বা 'সহজ পাঠের' মতো বর্ণপরিচয়পুস্তক? 'কবিতা' আছে ভাষার সর্বক—ছন্দ থাকলেই কবিতা থাকবে—সর্বত্র আছে, নেই শুধু বিজ্ঞাপনে ও সংবাদপত্রে। সাহিত্যের যে-বিভাগটিকে আমরা 'গভ' নাম

দিয়েছি তাতেও কবিতা আছে—বাক্য-বাক্যে খুব ভালো কবিতা—নানা রকম
ছন্দে ভাষা রচিত। আসলে গল্প বলে কিছু নেই : আছে বর্ণনা, আর
নানা ধরনের কবিতা, কোনোটি শিথিল, কোনোটি সংহত, কোনোটি বা একটু
বেশি ছড়িয়ে-বাওয়া। যেখানে ঠাইলেন দিকে প্রবৃত্ত, সেখানেই পদবিদ্যাস।
স্বকোন মালার্ধের এই উক্তির প্রমাণরূপ কোনো-একজন—সারা জগতের
মধ্যে কোনো-এ কজন কবিকে যদি পাঁচ করতে হয়, তাহ'লে সেই কবি
—মালার্ধে নন, তাঁর নিজ পোল ভালোয় ও নন—তর্কাতীতরূপে তিনি
রবীন্দ্রনাথ। কেননা মালার্ধে ও ভালোর গল্প তাঁদের কবিতার মতোই
সাংস্কৃতিক, গল্পরচনার বিষয়গুলিও 'বিশুদ্ধ' ও নির্ভাব—বলতে গেলে
তাঁদের কবিতা ছাড়া বিষয় নেই, আর কবিতার বিষয়ে কবির মতো
লিখতে গেলে অন্ততপক্ষে ব্যবহারিক প্রতিবন্ধক জন্মই থাকে। কিন্তু
রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখেছেন সাধারণ ভাষার, অনেক সময় নিষ্কংসাহজনক
সাংসারিক বিষয় নিয়ে (সমবায়নীতি বিষয়েও তাঁর প্রবন্ধ আছে), গড়ক
কবিতার স্তরে উন্নীত করার সচেতন চেষ্টা ব্যর্থতার আগে তাঁকে করতে
দেখি না। অথচ, যেহেতু ফাইল তাঁর পক্ষে যান্ত্রিক, ছন্দ তাঁর মজাদার,
তাই তাঁর সমগ্র গল্পের মধ্যে এমন লেখা আপেক্ষিক অর্থে জন্মই (কিন্তু
নেই তা নয়), যা প্রতিরূপিত তোলে না, বেশ বেগে যায় না, স্পন্দিত হয়
না স্বরণে, দেয় না সেই অপার্থিব অহঙ্কৃত আমরা যার নাম দিয়েছি আনন্দ।
এমনি করে তাঁর গল্পের ভিতরে কবিতাকে পাচ্ছি—'মাক্য-মাক্যে খুব ভালো
কবিতা, কোনোটি শিথিল, কোনোটি সংহত, কোনোটি বা একটু বেশি
ছড়িয়ে-বাওয়া।'

২

'নিষেধমালার' এই খণ্ডের প্রবন্ধগুলিকে পাঁচ অংশে ভাগ করা হয়েছে :
'আত্মপরিচয়', 'পত্রাবলি', 'স্মরণ', 'ভাষা ও সাহিত্য' ও 'বিচিত্র'। অংদের
নিরোনামা থেকেই তার অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলির প্রকৃতি অস্বাভাবিক করে নেয়া

বাক্যে; শুধু 'বিচিত্র' অংশ বিষয়ে একটু বলা দরকার। এই বিশেষণটি
রবীন্দ্রনাথ নিজেই ব্যবহার করেছিলেন—তাঁর 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ১৩১৪ বঙ্গাব্দে
প্রকাশিত হয়; তাঁর দৃষ্টান্ত অস্বাভাবিক আমরা সেই গল্প রচনাকে 'বিচিত্র' বলে
অভিহিত করছি, যেগুলোকে অল্প কোনো বিভাগের মধ্যে সঠিকভাবে ফেলা
যায় না। আমরা বলতে চাচ্ছি, এই অংশের রচনাগুলিতে রচনাটাই প্রধান,
বিষয়টা উপলব্ধি মাত্র; যে-কোনো একটি প্রশ্ন অবলম্বন করে লেখক বিস্তার
করে দিলেন তাঁর ভাবনা ও কল্পনা, তাঁর মূল্যবোধ ও পদ্ধতি। এই
ধরনের রচনার জন্য আধুনিক বাংলা ভাষায় একটি নতুন নাম উদ্ভাবিত
হয়েছে—'রম্যরচনা' : ফরাসি বেল-লেভ-এর অলঙ্করণ এটি; কেউ-কেউ বলে
থাকেন—বা আগে বলতেন—'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ'। নতুন নামকরণের বিপদ
এই যে তা অযোগ্যকে আকর্ষণ করে, 'রম্যরচনা'কেও—বাংলা ভাষায় তাঁর
সাম্প্রতিক প্রাধিকার দিয়ে বিচার করলে—অস্বাভাবিক আশ্রয়স্থল বলায় ইচ্ছে
হ'লে অস্বাভাবিক হয় না। বাংলা কবিতা প্রবন্ধ উপলব্ধি কিছুই লিখতে পারেন না,
এবং সত্যিকার সাংসারিক পর্বত নন, বান্দেব না আছে তথ্য বা জ্ঞান, না
উদ্ভাবনশক্তি বা কল্পনামুখ্য, সংগতিবোধ করে কোনো বিষয়ে এক দৃষ্ট
চিন্তা করতে, বা পরস্পর দৃষ্টো ব্যাক্য রচনা করতে বাংলা স্বাভাবিক অক্ষর,
তাঁদের বিশুদ্ধ প্রগল্ভতা ছাপার অক্ষরে উদ্ভূত হয়ে উঠতে পারতো না,
যদি না 'রম্যরচনা' শব্দটির সৃষ্টি হতো। কিন্তু যেহেতু বহু নিষ্কৃত রচনা প্রশ্ন
পাচ্ছে সেহেতু আমরা বলতে পারি না যে ঐ শব্দই পরিভাষা, বা গল্পরচনার
ঐ বিশেষ রূপের অস্তিত্ব নেই। 'কবিতা' নামে প্রকাশিত অধিকাংশ রচনাই
কবিতা নয় এটা যদি মেনে নিতে পারি, তাহ'লে অধিকাংশ 'রম্যরচনা' যদি
রচনা না হয়, বা রচনাও না হয়, তাহ'লে অত্যন্ত বেশি বিচলিত হ'লে চলবে
কেন? নতুন নামকরণের পারিভাষিক উচিত্য নিয়ে তর্ক উঠতে পারে,
কিন্তু নতুন নামকরণের প্রয়োজন নেই বললে ভুল করা হয়। যোগ্যোপায়
ভাষায় 'essay' বলতে বিশেষ এক প্রকার সাহিত্যগুণদম্পার রচনাকেই
বোঝায়, কিন্তু আমাদের 'প্রবন্ধ' (সংস্কৃত থেকে বার অর্থ ছিলো পত্র বা গল্পে

যে-কোনো রচনা) শব্দের অর্থ এত বেশি ব্যাপক যে এক-এক সময় তাকে সীমিত করে না-নিলে ঠিক কাজ চলে না। 'নাস্তীদীর্ঘ সাহিত্যগুণসম্পন্ন গল্প রচনা' অর্থে 'essay' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন মিশেল মঁতেন—সাহিত্যের এই রূপটিও তাঁরই আবিষ্কার; পরবর্তী চারশো বছরে উদ্ভূত অল্প বহু উদাহরণের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আজকের দিনের পশ্চিমী পাঠকরা 'essay' শব্দটি দেখলেই বুঝতে পারেন কী-ধরনের রচনা পরিবেশিত হচ্ছে। যদি কোনো জীববিজ্ঞানী সর্বাঙ্গী প্রাণীদের পাকস্থলী নিয়ে কোনো গবেষণা প্রকাশ করেন, বা কোনো ধর্মবিদ প্রণয়ন করেন খৃষ্টীয় তত্ত্বের এক নতুন ব্যাখ্যা, বা কোনো ইতিহাসের অধ্যাপক রূপ বিষয়ে লেখেন ও ইটকির ছনিকার তুলনামূলক আলোচনা করেন—এর কোনোটিকেই কোনো পশ্চিমী পাঠক 'essay' বলবেন না; ও-সব জ্ঞানগর্ভ, বিবিশুদ্ধ ও উদ্বেগনির্ভর রচনার জন্ত 'monograph', 'dissertation', 'tract', 'treatise' প্রভৃতি অল্প বহু শব্দের প্রচলন আছে। কিন্তু আমাদের ভাষার রীতিনীতিতে 'পদ্ধতি'ও প্রবন্ধের বই, খাদ্যী বিবেকানন্দের 'ভক্তিবোধ'ও তা-ই, আর বিজ্ঞাপণের সংসারণের 'বিধাবিধিবাহিষয়ক প্রচার'কেও, অল্প কোনো নামের অভাবে, 'প্রবন্ধ' নামেই উপায় নেই। অস্বীকার করা যায় না, আমরা দু-একটা ব্যবহারযোগ্য পদ্য হ'লে ভালো হব।

বা যেখতে-সম্মতে প্রবন্ধের মতো, এ-রকম গল্পরচনার মধ্যে ছুটো-পুট ভাগ দেখা যাচ্ছে: তার একটাকে বিয়ের হলো সর্ব্ব বা মুখ্য, লেখক সেখানে নতুন জ্ঞান দিতে চাচ্ছেন, বা নতুন মত প্রচার করা তাঁর অভিপ্রায়। এ-সব রচনার রচনা, মধ্যভাগ ও সমাপ্তির একান্ত নির্দেশক হ'লো বক্তব্য; প্রতিপাদ্য প্রকাশ করার জন্ত যে-কটি মুক্তি ও উদাহরণের প্রয়োজন, লেখক তা পূর্বেই সংগ্রহ করে নিয়েছেন—লেখক হিসেবে তাঁর সমস্ত শুধু সেই উপাদানগুলিকে ভাবার মধ্যে সংরক্ত করা;—ভাষা তাঁর কাছে বাহনমাত্র, অপরিহার্য নয় একটি—বলতে গেলে তাঁর উপাদানসমূহের শৃঙ্খলাসমূহই তাঁর রচনা। আর অজটতে বিষয়টা গোঁপ; লেখক রচনাকর্ম শুরু করার আগে—তাঁর বাঁচ,

ম্যোমেশা ও সাধারণ পড়াশুনার বাইরে—কোনো 'গবেষণা' করেননি; কোনো পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা বা সমাজের পক্ষে হিতকারী কোনো উদ্দেশ্য নিয়েও লিখতে বলেননি তিনি; লিখতে-লিখতে ভাবনা আসে তাঁর, নিজেকে অসমর্থ করে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যান; তাঁর রচনা, মধ্যভাগ ও সমাপ্তির পিছনে থাকে—'বক্তব্য'কে উপস্থিত করার গরজ নয়, সেই সব অমোঘ ও অলক্ষ্য বিধান, যা কোনো কবিতা, নাটক বা উপন্যাসকে নিরস্ত্রিত করে। তাঁর ভাষায় থাকে রূপ, ছন্দ ও স্বাদুতা, পাঠকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে থাকে সৌভাগ্য, আসক্তি, হাস্তরসবোধ, জগতের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে থাকে সংরাগ ও দুর্ব্বলতা। শিবোনামার যে-বিষয়ের উল্লেখ থাকে তা নিয়ে যতটা বলেন, হয়তো ততটাই থাকে তাঁর নিজের কথা; আমরা জানতে পারি কী-ভাবে এই জগৎ তাঁর চেতনার মধ্যে প্রবেশ করছে, কোথায় তাঁর প্রেম, কোন সংসারে তিনি মগ্ন, কোন গোপন বেরনাকে রচনার মধ্য দিয়ে পরিপাক করে নিচ্ছেন। অর্থাৎ, বিষয় যা-ই হোক না, তিনি ব্যক্ত করছেন নিজেকে (এই স্থলটিও মঁতেনের), আর এই অর্থে তাঁর রচনা ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিনির্ভর, বলা যেতে পারে তাঁর ব্যক্তিত্বই দর্পণ। মঁতেন নিম্নলিখিত 'আমি' শব্দ ব্যবহার করেছেন, রবীন্দ্রনাথের 'আমরা'টিও 'আমি'র একটি বিনয়ী ও চতুর প্রকাশ; এবং এই 'আমি'—গীতিকায়ের রক্তার মতোই—দেগ-কালের বিশেষ লক্ষণদ্বারা চিহ্নিত হয়েও বিশ্বমানবের প্রতিভূ। জীববিজ্ঞানী যখন সর্বাঙ্গী প্রাণীর পাকস্থলী নিয়ে 'প্রবন্ধ' লেখেন তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের একটিমাত্র অংশকে উল্লেখী হতে হয়, কিন্তু অল্প খে-ধরনের প্রবন্ধের আমরা বর্ণনা করছি; তা লেখকের সমগ্র সত্তা থেকে নিঃসৃত; শুধু বুদ্ধির বা চিত্তের নয়, সেটা প্রাণের ও অন্তঃকরণেরও কাজ; যে-সাহস তাঁর শিশুকন্টার বিনোদের জন্ত মোহাতে হারানুভূতি দেয়, সখির ভয়ে পাতা শীত স্থান করে না, অবসর পেলেই মহাভারত পড়ে, আলকাব্যের গদ্য ভালোবাসে—সেই ইন্দ্রিয়বদ্ধ অসংগতিময় নান্যটিও তাতে লুপ্তিভিত ও প্রতিকলিত হচ্ছে। বাক্য বলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তা এই বিরাট জগতের একটি বহুদিক কবিকার উপর সহজ হ'লে থাকে,

অজ সব-কিছুর অস্তিত্ব দেখানে লুপ্ত; নিরঞ্জন জ্ঞান সেই দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।
আমরা বাক্যে প্রবন্ধকার বলছি, তিনি এই বিচ্ছেদপ্রবণ ঐকান্তিক দৃষ্টি থেকে
বাক্যে। জগৎটা তাঁর বিভিন্ন উপাদান নিয়ে তাঁর চৈতন্তের উপর অনবরত
আঘাত করছে; হৃৎকল্পে আকাজক্ষার স্পন্দমান রক্তাশ্রমের সাহসকে তিনি
কখনো ভোলেন না।—আর তাই তাঁর রচনা হ'য়ে ওঠে—সত্য নয়, জীবন্ত,
শিক্ষণীয় নয়, নন্দনজনক; তাতে থাকে না কোনো অস্বাভাবিক বৃত্তি, কোনো
এক রীমাংশ, নিশ্চিতভাবে কিছুই বলেন না তিনি; কিন্তু এমন কতগুলো
ইদ্রিত বিকীর্ণ করে দেন যা স্বদয় পাঠকের মনে বীজের মতো উড়ে এসে
পড়ে—হরতো ছড়িয়ে দেয় শিকড়, হরতো কোনোদিন সেখানেও এক নতুন
ভাবনাকে কলিয়ে তোলে। বিজ্ঞানীর মতো কোনো প্রকৃত সত্য তিনি
আপ্ত ভুলে দেন না আমাদের হাতে—মিতে পাবেন না; তিনি পাঠককে
তাঁর সহকারী করে নেন; বা তিনি আমাদের বলেন, উপহার বলেন, বলেন
গুজবে ও বর্ষাঝিলো, তার 'অর্থ' পূর্ণতা পায় পাঠকের মনে—যদি পাঠক
আপোষ্য না হন।

অতিগুরু হচ্ছে কি? বড় বেশি দাবি করা হচ্ছে? কিন্তু আমি তো
কোনো আদর্শ স্থাপন করছি না, রবীন্দ্রনাথেরই বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করছি।
এই প্রবন্ধ—বা প্রবন্ধের এই বিশেষ ধরন—স্বাভাবিক মতেন যার দৃষ্টি—
আমাদের সাহিত্যে তাঁর মহাশিল্পী হলেন রবীন্দ্রনাথ। এতে মিল্কিলাভের
পক্ষে যে-সব গুণ প্রয়োজনীয় বা কাম্যগুলির মনে হ'তে পারে, তাঁর প্রতিভার
সেগুলোর সরিষা পড়েছিলো। শুধু 'বিচিত্র' নামধারী অংশ নয়, এই গ্রন্থের
সব রচনাই পূর্ণোক্ত গুণসম্পন্ন; সবই স্বষ্টিশীল সাহিত্য; তাদের সূচ্য রচনার
মধ্যেই, আবেশবল্লভ নয়;—এমনকি তাঁর সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, ঐতিহাসিক
প্রবন্ধের মধ্যে যেগুলি কাঁলপ্রভাবে মলিন হ'য়ে যায়নি, সেগুলোতেও এই
একই লক্ষণ বিজ্ঞমান। কেননা রবীন্দ্রনাথ সেই লেখক, যার পক্ষে যে-কোনো
সময়ে শিল্পী না-হওরা দুঃখ্যো ছিলো, যার কোনো-কোনো প্রবন্ধগ্রন্থে (যেমন
'ছন্দ', 'বালা ভাষাশিচর') আমরা পাই গবেষণা ও নন্দনধর্মিতার সমন্বয়,

বিশ্লেষণশক্তির সঙ্গেই কবিতার উদ্ভাবনশক্তি। সাহিত্যের নিত্যম ও
সংজ্ঞার্ধগলিকে তিনি সাবলীলভাবে অতিক্রম করে যান: তাঁর আত্মজীবনী,
জন্মপঞ্জি ও চিত্রিপত্র আশ্চর্যরূপ ভাষা পাই না আমরা; পাই না সমালোচনার
ব্যর্থোপা ভাবকথা। পক্ষান্তরে, সমালোচনার মধ্যে আত্মজীবনীর অবতারণা
করতে বাধে না তাঁর, জন্মপঞ্জিতে জন্ম ভুলে গিয়ে জীবন, মৃত্যু ও শিল্পকলা
বিষয়ে দ্রুতকল্পনাকে প্রশ্রয় দেন। কোনো পাঠক ভুলেও যেন না ভাবেন যে
তাঁর 'সমালোচনা'-চিহ্নিত বইগুলিতেই সাহিত্যবিষয়ে তাঁর সব বক্তব্য বিস্তৃত
হ'য়ে আছে, বা তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র বাইরে আর কোথাও
আত্মজীবনী নেই। সাহিত্য বিষয়ে তিনি কী ভেবেছেন তা সম্পূর্ণভাবে
জ্ঞানতে হ'লে তাঁর চিত্রপত্র, আত্মজীবনী ও জন্মপঞ্জিও পড়তে হবে, আর
তাঁর জীবন বিষয়েও যথেষ্ট আমজা জানতে পাবে না যদি না তাঁর সমালোচনার
প্রতি মনোযোগী হয়। এই গ্রন্থের বিভাগগুলি করা হয়েছে হৃদয়ের ভ্রম বা
নিয়মবদ্ধতার খাতিরে; আসলে এই সব প্রবন্ধই পরস্পর-সম্পৃক্ত।

৩

এবং তাঁর কবিতার সঙ্গেও এদের সম্বন্ধ নিবিড়। কবিদের বিষয়ে সাধারণভাবেই
সত্য এই কথা, কিন্তু সব কবির কবিতা ও গজরচনা একই ভাবে অধিত হয়
না। যেমন বিলকের বিষয়ে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে আমরা বলতে পারি
না যে তাঁর কবিতা স্বয়ংসম ক্রমে হ'লে তাঁর পদ্যবলির সঙ্গে পরিচয়
অত্যাশঙ্ক। মার্গারে বা ভালেরির মতো নন তিনি: ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে,
বৌকিয়ে, পেচিয়ে, লুকিয়ে, ছলিয়ে, ছলে, কৌশলে, সংকেতে, কাঁদ পেতে—
শিল্পকলায় এমন একটি ভাববৃত্তি পড়ে তোলেন না, যা তাঁর স্বীয় কবিতার
সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। ইয়েটনের মতো আমাদের নিয়ে যান না তাঁর
কবিতার অন্তঃপুরে; কবিজীবনের বিবিকল্পে 'জীবনস্মৃতি' নিসন্দেহে নৈরাশ্র-
জনক। রবীন্দ্রনাথ বা করেছিলেন তা পুনরুক্তি; একই কথা পড়ে ও পড়ে
বলেছিলেন; পরস্পরের পরিপূরক শুধু নয়, তাঁর কবিতা ও গজ এক-এক

সময় প্রায় বিমিসরধর্মী। পাছে, ঝাঁপ আধুনিক কবিতার দীক্ষিত, একথা শুনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ক'মে-যায়, তাই এখানে উল্লেখ করি যে শার্লা বোদলোয়ার—আধুনিক কবিতার আদি উৎস যিনি—তাঁর গড়েও তাঁর কবিতার প্রতিজ্ঞা বিবল নয়; প্রবন্ধের মধ্যে কবিতার স্তবক বহু রচনা ক'রে দেন তিনি, ছিটিয়ে দেন কবিতার ভাঙার থেকে আঁত চিত্রকর, শব্দবহু ও অলংকার, কখনো-কখনো একই উপাদান থেকে রচনা করেন তাঁর কবিতা ও মনোগোচনা। দুই কবিতা প্রান্তে এইখানে—আর এই প্রান্তে তাৎপর্যময়—যে এওই কথা রবীন্দ্রনাথ গড়ে বলেছেন কম কথা আর কবিতায় কলোজ্ঞানে, আর বোদলোয়ার গল্প লেখেন সবিতারে, কিন্তু কবিতায় তিনি কঠিনরূপে সংহত। 'জীবনস্বত্ব'র 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ দুটিমাত্র অঙ্কনে যা বলেছিলেন, 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ অংশ তারই বাখ্যা ও সম্প্রসারণ; কিন্তু বোদলোয়ারের শিল্পবিৎসর প্রচুর মনোগোচনার নির্ভর তাঁর 'আলোকসুত' ('Les Phares') কবিতার এগারোটি চতুর্পাতিতে বিস্তৃত আছে। বোদলোয়ারের গল্প যেন তাঁর ছুটির ঘণ্টা—এই রকম মনে হয় আমাদের: ছন্দ, মিল ও স্তবকবিশাঙ্গের কসাইন শর্তপূরণের পরে, চতুর্দশপদীর ব্যাহের মধ্যে আদর্শকে সংরক্ষ করার অল্পমাত্র প্রয়াসের পরে, গল্পে যেন নিজেই নিষ্কৃতি দেন তিনি; সেটা তাঁর বিনোদ ও বিচারপের ক্ষেত্র, কৌতুক্যের মণ্ডপ এবং বিচারবুদ্ধির বৃগদাভূমি; অর্থাৎ, তাঁর ব্যক্তিরেণে যে-অংশ সামাজিক, রসিক ও ভদ্রাশী, বা তাঁর কবিতার প্রচ্ছদ থেকে কবিতাকে মেঘজ্বরিত রৌদ্রের মতো রঙিত ক'রে তুলেছে, তার বাহীন জাঁড়া গল্পগ্রন্থকে তাঁর অহমত ছিলো। বোদলোয়ারের গল্প বড় ভালোই হোক, তাঁর কবিতার বিকল্প বা সমকক্ষ হবার দাবি তা করে না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা কবিতাকে সংহত করার চেষ্টা করেননি বলে, কখনো-কখনো তাঁর কবিতা ও গল্পের পার্থক্য চিহ্নিত হয়েছে শুধুমাত্র পড়ন্তের ব্যবহার অথবা পংক্তিবিভাগের অসমমাত্রিক পদ্ধতির দ্বারা। 'পূর্ববী' থেকে 'জন্মদিনে', এই পর্যায়ের মধ্যে বহু কবিতা আমরা হুঁজে পাই, যা গড়ে একই প্রকার বা অধিকতর মনোমগ্ন ক'রে রবীন্দ্রনাথ

লিপিতে পারতেন বা রিখেই গিয়েছেন; 'পশ্চিমবাহীর ভাষাটির অনেক অংশকে প্রায় সঘন-সঙ্গেই ছন্দে-মিলে রূপান্তর করেছেন তিনি, 'শেষের কবিতা'র গুণশির অনেক স্থলে কবিতাকে দ্বান ক'রে নিচ্ছে; গুণকবিতা 'বাগা' একধাণা পত্রের সংস্কারদান; এবং পরবর্তী পত্রাবলিতে এমন কোনো-কোনো চমকপ্রদ বাক্য আমরা পাই, যা পলাতক স্বপ্নকালীন ভাবচ্ছায়, বাক্যে কাব্যরূপ দিতে গিয়ে তাঁকে কষ্টকরনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিতা ও সমুদ্র গল্প পাশাপাশি রেখে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে তাঁর কবিতা ও গল্পের বিবর্তন সমান্তর নয়; তাঁর হাতে গল্প যে-ভাবে বারে-বারে পরিবর্তিত হয়েছে, কবিতা সে-রকম হয়নি; কবিতায় তিনি যেন প্রকৃতির হাতে অভিব্যক্তি এক, সম্রাট, পজাকারে যা-বিচ্ছ লিখবেন তাই কবিতা হবে, বা তা না-হ'লেও অন্ততপক্ষে উপা'দের হবে, এই রকম একটা বিশ্বাস তিনি নিজেও প্রায় মেনে নিয়েছিলেন; কিন্তু গড়ে তিনি অনেক বেশি সচেতন শিল্পী, নিজেই নিজে লজ্জা করতে অনবরত সচেষ্ট।

এমন ক'রেই বাংলা সাহিত্যে এই অর্থটন ঘটলো যে আমাদের ভাষার যিনি কবিতাকর, এবং ঝাঁপ সমকক্ষ কবি আবহমান ভারতে আর নেই, তিনিই আমাদের গুণবীতির স্রষ্টা। 'স্রষ্টা' কথাটিতে ঐতিহাসিক দিক থেকে অপরিণতি হ'তে পারে; বলা বাহুল্য, বিভাগাগর ও বহির্মহাচক্র আদি তুলে যাছি না; আমি বলতে চাচ্ছি যে বহির্ম থেকে আত্মকর যিনি পর্বত বাংলা গুণ-ভাষে বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে, এবং আত্মকর যিনি আধুনিক বাংলা ভাষা বলতে বা বোঝায়, তার শাস্ত্র, প্রমাণ ও উদ্ভাসবর্ণের প্রধান ভাঙার রবীন্দ্রনাথ। 'বৌঠাঙ্কনানীর হাট' থেকে 'শেষের কবিতা', বা 'বিচিত্র প্রবন্ধ' থেকে 'ছেলেবেলা': এই গ্রন্থপর্বার বাংলা গুণের ইতিহাসকে ধারণ ক'রে আছে; বহির্ম ও বীরবলী গুণ, 'স্বাধু' ও 'চলিত' ভাষা, যতোগা, বৈঠকি ও দরবারি রীতি, প্রাচীন, আধুনিক ও আধুনিকস্তর শৈলী: এই তাঁর পঞ্চাশ বছরের জটিকে বাংলা গুণের অণুবিশ বলতে পারি আমরা, হয়তো মহাবিশ্ব বললেও ভুল হবে না। এর মধ্যে সবই আছে: ভাষি, হালকা, গুণী, চপল,

কবিতা

আখ্যায় ১৩৬৭

সংস্কৃত ও দেশজ, সমতল ও বন্ধুর; অত্যাতি, বজ্রোক্তি ও স্বভাষোক্তি; আছে বহু মিশ্র 'রাগিণী'; শাবিক মিতাচারের পাশে বিলাসীর উজ্জ্বল, সামাজিক দোষত্রয়ের পাশে ঐশ্বর্যের আত্মবিকিরণ। 'স্বাধীনস্বাধীন' পরিমিত, যথোচিত, প্রাঞ্জল ও প্রসন্ন গজ বীর রচনা, তাঁকে আমরা আঠারো-শতকী ইংরেজি অর্থে 'ভক্তলোক' বলতে পারি; কিন্তু তাঁর গদ্যে হঠাৎ 'গদ্যে বাইরে' যুগলেন অলংকরণের আভিশিষ্যে আমাদের প্রায় দশ আটকে আসে; গদ্য হয়, কালিদাসের ভাষা যদি বাংলা গজ হতো তাহলে তিনি যে-কায় লিখতেন, এ যেন তাই। আবার 'লিপিকার' আমরা জাহ্নকদের এক উল্টো খেলা দেখতে পাচ্ছি; 'গদ্যে বাইরে'র প্রায় সমকালীন এই গজকে বলতে ইচ্ছে করে 'সহকারী' অর্থে 'মেয়েলি': যেন হলনাফুলের যৌথিক ভাষার প্রামাণ্যোদ্যম নিরুশিত ক'রে রবীন্দ্রনাথ ছেঁকে নিয়েছেন তাঁর গজতা, আবণ্য ও মায়ণ্য, যা নিতান্ত প্রাকৃত, তারই উন্নয়নজনিত এই সম্মোহন পূর্ববর্তী 'ভাবগদ্যে'ও তিনি ঘটিয়েছিলেন। শুধু তাঁর লেখা পড়ে বাংলা গজের সবগুলি মজা ধারাকে আমরা জানতে পারি, এবং ঐতিহাসিক ও অসম্ভব কারণে আজ কোনো বাঙালি লেখক যথেষ্ট একথা বলা যায় না। আমাদের গজের অবিকল দর্পনরূপে তাঁকে বীকার না-ক'রে আমাদের উপায় নেই।

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ বহিরের অঙ্করণ করেছেন, ন্যযবসনে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব তাঁকে স্পর্শ করে, এবং এ-দৃষ্টি ছাড়া তাঁর সমকালীন বা পূর্বসূরীর মধ্যে আর কেউ নেই, বীর সঙ্গে গজশিল্পের দিক থেকে তাঁর তুলনা সম্ভব। দেহজ্ঞ, যদি আমরা অদেয়ন করি তাঁর 'বন্ধিনী' গজ কোথায় বহির থেকে শ'রে এসেছে, আর তাঁর 'দব্জপজ' যুগলেন রচনাই বা কোনদিক থেকে অ-প্রামাণিক, তাহলে হয়তো ধরা পড়বে তাঁকে বাংলা গজের ব্রহ্ম বলায় সংগত কারণ আছে কি না। সেই পার্বক্যাতি, আচার্য মনে হয়, এই। বাংলা গজের রমণীরতা বহিরের দান, তাঁর আপনে ঐ গুণটি দেখা দেয়নি, এবং তাঁর উপভাষা ও 'কমলাকান্ত' প্রভৃতি প্রবন্ধ রমণীর গজের রচিত বলেই আদ পণ্ডিত প্রান। কিন্তু এই রমণীরতা গজের অবধর্ম। অর্থাৎ, বহিরের গজ

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪

নাঈ-নাঈ পঙ্কজদের বোল শোনা যায়, গজের প্রবণদের মতোই তাতে অলপাঙ্গী অংশ অবিরল, তাঁর কোনো-কোনো বাক্য প্রায় পঙ্কজের পঙ্কি হতে পারে—স্বতন্ত্রপক্ষে ন্যযবসনে তাঁদের উল্লুখতা স্পষ্ট, এবং আঠারো-শতকী ইংরেজি দশমাত্রার গজের মতো উক্তি ও প্রত্যুক্তির ঘোঁটানার মধ্যে তাঁদের অবস্থান। তাঁর বাক্যগুলি স্বল্প, শিথিল মৈত্রদলের মতো তাঁরা ভালো-ভালো পা কেলো চলে, তাদের পৃথল্যা ও পারস্পর্য নৃক্তিনির্ভর, স্তম্ভিপ্রারের ঐক্যের দ্বারা তারা সংবদ্ধ। এবং, সমগ্রভাবে দেখতে গেলে, প্রমথ চৌধুরীর চরিত্রলক্ষণও এই: বাক্যবন্ধের এই গজতা, এই নৃক্তিনির্ভর বাগহজ্বল। 'মাণু' ও 'চলিত' ভাষা-সম্পৃক্ত বাধাহাবাদের ফলে এই ন্যযবসমি আনসা বহুদিন পর্যন্ত লগ করিনি; কিন্তু আজকের দিনে, যখন ঐ পৃথক অবসিত হয়েছি, তখন 'লোকহরত' বা 'দিবির প্রবন্ধের' পরে 'হাল-বাত' বা 'দানা চটা' পড়লে সহজেই ধরা পড়ে যে এই দু-জনের গজের চলন একই ধরনের, পঠনেও উল্লেকযোগ্য তদান্য নেই। কিন্তু এদের পরে রবীন্দ্রনাথ যুগলেন ভৎসণাৎ এক ভিন্ন ধরন দানিত হয়; আমরা অসম্ভব করি আর-একটি গুণ বাকে দীপ্তি বা শৃঙ্খলা বা রমণীরতা বললে যথেষ্ট হয় না, বাকে বলতে হয় প্রবাহ বা প্রবহমানতা—বা রবীন্দ্রনাথের পূর্বনন গজের নেই, পরবর্তী গজেরও লক্ষণীয় নয়।

বহিরে, বা পূর্বসূরি বিভাগাগুরেও, গতি আছে; কিন্তু বাকে আমি রবীন্দ্রনাথের প্রবাহ বলছি তা ভিন্ন প্রকৃতির; এবং এই প্রভেদের আকার খুব যতো না-হলেও প্রকরণে তা দৃষ্টপাণী। রবীন্দ্রনাথের গজের যেটি কল্প পা ইউনিট সোটি বাক্য নয়, অহুচ্ছেন; একমুদ্রে এক-একটি অহুচ্ছেনে তিনি চিত্রা করেন, এবং অহুচ্ছেনগুলির যোগকলের চাইতে তাঁর সমগ্র রচনাটিকে বড়ো বলে মনে হয়। বাক্যের সঙ্গে বাক্যের, বা অহুচ্ছেদের সঙ্গে অহুচ্ছেদের যথেষ্ট স্তম্ভ বাক্যকরণের বা নৃক্তির যোগই যথেষ্ট, এবং তাঁর দ্বারাও উল্লুখ গজ সম্ভব হয়ে থাকে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথে সেই যোগহুজ্বল এমন এক রহস্যময় প্রাণস্পন্দন, বাকে আমরা অবশেষে ভাবার ধর্মস্পন্দন

ব'লেই চিনতে পারি। তাঁর বাক্যপার্থ্য শুধু শাস্ত্রাধ্যাপনে প্রতিবাদী নয়, একটি অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতায় অতোজলিত; তাহা একে অস্ত্রের অহমধন-বাজ করে না, গড়িয়ে-পড়িয়ে পরস্পরকে বেন স্পর্শ ক'রে থাকে; জীবনের অধঃপ্রভাদের মতো তারা নমনীয়, তাহা লীলা জানে, ব্যত্যয় ঘটতে ভয় করে না, মানসমাত্র ভেঙে দিয়ে আশাতীতক মন্তব্য ক'রে তোলে। তাঁর একই ঘটনার মধ্যে নিঃসংকোচে পাশাপাশি স্থান করে নেয় ক্ষুদ্র ও মহল, এবং জটিল ও দীর্ঘাশ্রিত বাক্যবিশ্লেষণ; তাঁর দ্রুতি প্রতিবেশী বাক্য একই ভাবে আশ্রয় বা শেষ হয় না; বরাহ ও হস্ত শব্দের সম্মিলনে তিনি বেন অচেতনভাবেরই বায়বান রক্ষা ক'রে চলে, একই স্বরের পৌনঃপুনিকতা মধু করেন না; ক্ষুদ্র, বৈচিত্র্য ও ঐক্যের মাধুর্য স্বীকার ক'রে বেন ইংরেজি ধরনের অধর—যা তাঁর আগে বহিম ও বিজ্ঞানগত করেছেন, কিন্তু পার্শ্বোক্তি, সর্বনাম ও ব্যুৎক্রমের ব্যবহারজনিত যার পূর্ণ রূপটি দ্বিভাষ্যধর্মের আগে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বহিঃ সমালোচকরা তাকে কুলে নিয়ে কখনো-কখনো এমনও বলেছেন যে কতিপয় অযোগ্য আধুনিক লেখকই বাংলা গড়ে ইংরেজি দীড়ির প্রবর্তক। কিন্তু ইংরেজি তো আর নেই, সেটাই বিতংক বাংলা হ'লে পেছে, কিংবা ধ্বনটাকে হরতো ইংরেজি বলাই কুল; কেননা কমা-সেমিকোলনবি বিরতিহীন বাংলা গুণ যেদিন স্বীকার করে নিলে, সেদিনই বলে দেয়া যেতো যে, আপন প্রতিভার নির্বন্ধই, সে বহুদূর রূপকরণে অস্ত্র আধুনিক ভাষার প্রতিযোগী হ'লে উঠবে। অন্ততপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পরে একথা নিতান্ত অগ্রাহ্য যে এক-পাড়াই-ই ঐক্য-নির্ভর কৃত্তিবাসী পরাধের সঙ্গে বাংলা গল্পের কোনো মঞ্চ আছে, কিংবা 'পাটি বাংলা অর্থ' নামক অল্প কোনো পরাধ আর মন্তব্যগণ। বরং আমাদের একথাই, তর্কাতীত বলে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য নৃত্যধর্ম বা উৎস ও আশ্রয়, তা বাঙালির মূলের ভাষার নিজস্ব ও মৌলিক ছন্দ; যে-স্বরে আমরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলি, যে-ভাবে আমাদের কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন ঘটে থাকে—আমাদের আবেগ ও মৈদাশ, মংস,

উত্তেজনা ও দীর্ঘশ্বাস, এই সব-কিছুর এক আদর্শ শাস্ত্রপের নানাস্থর হ'লো রবীন্দ্রনাথের গুণ। এবং এই থাকে ছন্দ বলজি তা গল্পের নয়, গল্পেরই ছন্দ, পারিভাসিক বাস্তবের বাস্তবের তাকে ছন্দোপলব্ধ বলেতে পারি; তাতে গল্পের বা গানের মতো ভাল নেই, কিন্তু রাগসংগীতে আলোপের মতো নয় আছে; রবীন্দ্রনাথের অসামান্য কৃতিত্ব এইখানে যে আত্মীয় কবির মতো গুণ লিখেও, গল্পে—এমনকি গল্পকবিতায়—পঙ্কজের প্রতিধ্বনিকে তিনি স্থান দেননি। শ্রীমুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত নিজ বলেছেন যে তাঁর গুণ 'স্বাক্ষরিক গুণ, হৃদয় কোথাও পঙ্কজকী নয়।' এই 'স্বাক্ষর'টি অর্থনয়।

৪

এই ছন্দোমিত্তির জটাই রবীন্দ্রনাথের স্তম্ভি দুর্বল হ'লেও প্রবন্ধ ভেঙে পড়ে না, ঘটনাস্থত বাস্তবের অভাবসত্ত্বেও উপকৃত্য স্বরস্বির হয়, এবং নাটক অস্ত্রায় কার্যে দ্বন্দ্ব বা হ'লেও উল্লসখোঁপাতার সর্বাধা পার। ব্যতিক্রম নেই তা নয়; 'সবীম', 'পাশরি' ও অন্তত 'তিন সর্দার' গল্পকে কৃত্তিমতার পরাকর্ষ বলেতে আমি দ্বিধা করবো না; বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দের উপর ধার স্বাভাবিক ঠেশি ছিলো তিনি কেমন ক'রে ও-সব গ্রহ প্রণয়ন করতে পারলেন তা উত্তরপুরুষের সমস্যা হ'লে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের যে-একটি লক্ষণ আমাদের অস্থানভাবে বিস্মিত ক'রে রেখেছে তা তাঁর আশ্রিত বস্তুকৃতি; দ্রুত যুগেই তিনি বরং নিজের অহরহর করেছেন কিন্তু চৌক্যত নৃত্যন ঘটতে চাননি; আর সেইজাই 'পাশরি' বা 'তিন সর্দার'কে এমন চরিত্রাত্মক বনে হয়, তাতে পরে-পরে পাঠককে চমকে দেবার যে-প্রয়াস আছে তা দ্রিষ্ট ও ক্লেশকর ব'লেই গভীরতম অর্থে অ-স্বাভাবিক। অথচ প্রায় একই সময়ে রচিত 'বিশ্ববিদ্যার' ও 'ছেলেরোনা'তে গল্পভবির একই প্রকার নৃত্যন থাকলেও কৃত্তিমতার নিপীড়ন নেই; তার কারণ আমার এই মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রবীন্দ্রনাথের সজ্ঞতন ভাষা ব্যবহার করলে মানিয়ে যায়, কিন্তু গল্প-নাটকের পাজপাজীর মুখে তা অবিদ্যায়। কাল্পনিক

চরিত্রের মুখে চরিত্রশোভন ভাষা বসাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়ই ব্যর্থ হয়েছেন, নাটকরচনার এইটাই তাঁর বিয় ছিলো; 'ভাকবনের' মূঢ় আয়তনের মধ্যে তা প্রকট হয়নি, কিন্তু 'রাজা' থেকে 'রক্তকরবী' পর্যন্ত যেখানেই আছে জনতা বা প্রাকৃতজন সেখানেই তাদের কথা শুনে আমাদের মনেই হয় যে এদের কোনো নিজস্ব সত্তা নেই, এরা কর্তার হাতের কীড়নক মাত্র। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের গল্প সবচেয়ে প্রামাণিক ও স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে, যখন তিনি নিজের জ্ঞাননিতে কথা বলতে পারেন; তাই তাঁর খেচর রচনার মধ্যে অবশ্যম্ভাব্য তাঁর 'গল্পগুচ্ছ', তাঁর উপন্যাসের বর্ণনার অংশ, এবং তাঁর প্রবন্ধপর্থাৎ, চিঠিপত্র ও আত্মজৈবনিক রচনাবলি। অস্তুত এগুলো থেকে বাছাই করে নিলে আমরা গজশিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রকৃষ্ট পরিচয় পেতে পারি।

প্রবন্ধরচনার একটি গভীরপন্থিক পদ্ধতির সঙ্গে আমরা পরিচিত আছি: মাটির মণিই ছাত্রকে বলেন, অমুক-অমুক পুস্তক পাঠ করে এই বিষয়ে প্রশ্ন লিখে আনো; এবং ছাত্র যদি প্রশ্ন করলে পাঠে যে উল্লিখিত বই-কটি সে পড়েছে, পড়ে অস্তুত অংশত বুঝেছে, এবং সেই বোধটুকু তাঁর 'বীয়া ভাষা'য় প্রকাশ করতেও অপারগ হয়নি, তাহ'লেই সে পরমানখরি ছাত্র বলে গণ্য হ'লে। আমরা ধরে নিতে পারি যে উত্তরজীবনে নিজে অধ্যাপক হয়ে সে এই পদ্ধতির ব্যাপকতর ব্যবহার করবে, শাভাবিক পুস্তক অধ্যয়ন করে রচনা করবে নূতন গ্রন্থ, তার অধ্যয়নমায়ের ফলে কোনো-একটি শীঘ্রিত বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বর্ধিত হবে। সম্ভবত সেই বিষয়টি হবে অ-সামান্য, অর্থাৎ সাধারণ সাহিত্যালিঙ্গুর পক্ষে মনোহর নয়, কিন্তু বিশেষজ্ঞের আয়বণীয়। এখানের পুস্তক তার নিজের ক্ষেত্রে মূল্যবান, কিন্তু ততদিনেই মূল্যবান যতদিন সেই বিশেষ বিষয়টিতে নূতনতর জ্ঞান সংকলিত না হয়। কিন্তু প্রবন্ধরচনার অল্প একটি উপায় আছে, সেই উপায় প্রতিভাবানের। কোনো-এক শুভ মুহূর্তে রেকথ তাঁর স্বজ্ঞান দ্বারা অকস্মাৎ একটি সমাজকে অহুত্ব করবেন—সেটা 'সত্য' কিনা তাও সঠিকভাবে বলা যায় না, শুধু এইটুকু বলা যায় যে তাঁর অহুত্বটি সত্য। সেইটিকে প্রকাশ করার লক্ষ্য সে-গণ তথা,

মুক্তি ও উদাহরণ তিনি উপস্থিত করেন, সেগুলিও নির্ধারিত বা স্থচিহ্নিতভাবে আহবিত নয়, তাঁর উদ্দেশ্যের তাপে যা-কিছু মনে পড়ে যায় প্রায় তাই তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করে থাকেন। এই ধরনের প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে মুক্তি অথবা তথ্যে জাতি ধরা পড়লেও রচয়িতা অনাহত থাকে, কেননা তাদের বৌদ্ধিক অহুত্বটি প্রমাণনির্ভর নয়, যাজ্ঞানিক, অতএব চিরকালই মূল্যবান। উদাহরণত, রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধটির উল্লেখ করতে পারি; আদ্যকের দিনে তার প্রতিটি তথ্য যদি পড়িতেরা বাস্তব করে দেন তবু সেটিকে বর্জন করতে পারেনা না আমরা, ভারতবর্ষীয় সমাজতা বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আমাদের মূঢ় করে রাখবে। এবং এই দৃষ্টি অ-অর্থো সত্য যে কোনো-এক সময়ে কোনো-এক পুরুষ তাঁর প্রভাবের ভারতের একটি সমগ্র রূপ উপলব্ধি করেছিলেন। যেখানে উপলব্ধি আছে সেখানে আমরা ভুল করতে ফুলে যাই।

এই ধরনের সমালোচনাকে বিধর্মণী বা ইম্প্রেশনিষ্টিক আখ্যা দিয়ে অনেকের মূর্খানালারের চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন তোলা উচিত: বিখ্যাত কার মনে প্রতিভাত হচ্ছে? তা যদি হন কোনো সমকালীন সাপ্তাহিকের লেখক, যিনি পাঠকের মধ্যে পাঁচ মিনিট গালগল্প করে প্রশস্ত জানিয়ে দিতে ভালোম না যে কোনো-একটি বই পড়ে তাঁর 'কেমন লাগলো', তাহ'লে এ-বিষয়ে আলোচনার কোনো প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু যদি তা হন কোনো আলাপচারী স্রামুয়েল জন্সন, বা বুদ্ধ গোটে, বা সমগ্রিক জন কীটস, বা বোলসেরার অথবা টোমাস মাদ্—কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাহ'লে এই তথ্যকথিত বিধকে আর অশ্রদ্ধা করার উপায় থাকে না; আমরা দেখতে পাই যে কোনো-একটি ভাব, তাদের মনে বিদ্যিত হয়েছে ব'লেই, যাজ্ঞানীয় গাঢ় হয়ে উঠেছে; এদের একটি অসভর্ক মুহূর্তের মুখের কথা, বা ক্ষণভ্রমিত পদের কোনো উক্তি—কখনো-কখনো তাও যেন অর্থ ও ইদ্রিতে সমগ্র। এর পরে আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনেতেই হয় যে ভগবানের রাজ্যে স্থিতির বলে কিছু নেই; যে প্রতিভা নামক রহস্যময় ব্যাপারটি অজ্ঞাতভাবে

আমাদের উপর জিতে যায়—নির্দিষ্ট শাস্ত্রসমূহ না পড়েও, বরষে প্রায় নাবালক হ'য়েও, এমনকি আলোচ্য বিষয়টিকে অত্যন্ত জ্ঞান নিয়েও—দাবীলীলায়ে আমাদের উপর জিতে যায়। ধারা নিজেরা সৃষ্টিগীল প্রতিভাবান লেখক উপা সাহিত্য বা আধুনিক বিষয়ে যা বলেন তার মূল্য স্বতঃসিদ্ধ বলবে তুল হয় না; কেননা আমরা দেখতে পাই যে পণ্ডিতেরা যুগে-যুগে তাঁদের উক্তি পর ভাষা রচনা করেন, কিন্তু পণ্ডিতের গবেষণার সঙ্গে পরিচয়স্থাপন কবিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয় না।

কবি-সমালোচকের মন কী-ভাবে কাজ করে, আমাদের ভাষায় রবীন্দ্র-নাথ তার অতুলনীয় নির্দশন। তাঁর প্রবন্ধে উপমার প্রাচুর্য দেখে কেউ-কেউ বলেছেন যে তিনি স্থানে-স্থানে অকারণ 'কবিত্ব' ক'রে থাকেন। একথাটা ঠিক নয়; আমাদের স্বভাব যে উপমা ভিন্ন দর্শনশাস্ত্র অচল, উপনিষদ ও প্লেটো থেকে আরম্ভ করে তার উদাহরণ অপূর্ণাঙ্গ। বরং এটাই লক্ষ্যীয় যে রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ রীতিমতো ভাবিক ভাষায় রচিত, যাকে গভস্তম গভ বলা যায় তাও তিনি অনেক লিখেছেন; বস্তুত, 'সবুজপত্রের' আগে পর্যন্ত প্রবন্ধে বা কথাসাহিত্যে তাঁর কবিত্ব সম্পূর্ণ নিহিত পায়নি। অথচ তাঁর যে-কোনো পর্ধ্যায়ের রচনার আমরা একজন কবির উপস্থিতি অহতব করি; তার কারণ তাঁর মনের বিহ্বাসধর্মিতা। যেন বিহ্বাসের উদ্ভাসের মতো তিনি মুহূর্তে তাঁর মূল চিন্তাটিকে আমাদের মনের সামনে উপস্থিত করেন: আলোচ্য বিষয় যাই হোক না, রাস্তানীতি বা ধর্ম, শিক্কা বা ইতিহাস, তিনি তৎক্ষণাৎ বিস্মৃতির একবারে মর্ধ্যস্থলে চলে যান; পাঠকদের মধ্যে ধারা বিশেষজ্ঞ তাঁরা নতুন কোনো তথ্য না-পেলেও নতুন একটি দৃষ্টি লাভ করেন; আর ধারা তাঁর সঙ্গে একমত হ'তে পাবেন না তাঁরা দেখতে পান যে তাঁদের স্বমতের সপক্ষে নতুন যুক্তি এ রচনা থেকেই আহরণ করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ সেই দ্রষ্টাদের অন্তরম ধারা বুঝিয়ে দেন আমরা যাকে 'স্বাভাব্য' বলি সেটি সবচেয়ে অকিঞ্চিৎকর সামগ্রী; আসল কথা অস্বাভাব্য—সেই 'বিশ্ব' বা বিশ্বগ্রহণের সহজ ক্ষমতা, যা বিশ্ব ও বিশ্বকীকে

যুগপৎ উদ্ঘাটিত করে। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ একজন অত্যন্ত ঔৎসাহ্যাজনক ব্যক্তি, তাই তিনি যে-কোনো বিষয়ে যাকিছু বলেন প্রায় তাতেই আমাদের ঔৎসাহ্য অনিবার্য।

এখানে বলা দরকার যে তাঁর সাহিত্য ও রসভবের আলোচনার আমরা প্রথম থেকেই একটি ভিন্ন স্বর লক্ষ করি; এখানে তাঁর কবিত্বভার কাজ বেশি, উপমা আরো প্রচুর, রীবাংসা আরো অনিচ্ছিত, এবং উপস্থাপনা—শাস্ত্রীয় আদর্শে দেখলে—সবচেয়ে কম তৃপ্তিকর। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য সমালোচনা-গ্রন্থ 'পঞ্চকূত' সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না এটি 'সমালোচনা' না কি 'বিশ্লেষণ' বিভাগে অঙ্গীকারযোগ্য; এমিকে 'বিশ্লেষণ প্রবন্ধ'র নামেই যদিও 'বিশ্লেষণ' আছে, তবু সেটিকে অনেকাংশে রসভবের বিচার বললে তুল হয় না—বিখ্যাত 'কেকাবিনী' প্রবন্ধ তো রীতিমতো মননভবের অহীলন। পরবর্তী গ্রন্থগুলিকে 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', এই ধরনের স্বস্পষ্ট নাম দিয়ে তিনি পাঠক, সম্পাদক, ছাত্র ও অধ্যাপকের হৃদয়ে ক'রে দিয়েছেন, কিন্তু এখানেও তাঁর লেখার ধরনে 'শোনা, বলছি' ভাবটা নেই, নিজেই সত্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার ব'লে থ'রে নিয়ে পাঠককে শিক্ষিত করার ভাব নর তাঁর; যেমন 'পঞ্চকূত' ভিন্ন-ভিন্ন 'চারিত্র্য'র সাহায্যে ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিকোণ উপস্থিত করেছিলেন, তেমনি এখানেও যেন নিজের সঙ্গে তর্ক করতে-করতে তাঁর যাত্রা; একটু এগিয়ে, আর-একটু পেছিয়ে, যাকে-যাকে হ'টতে যোগে, কখনো কোনো আকস্মিক ও উজ্জল ভাবনার পশ্চাদ্ধাবন ক'রে, কখনো বা দূরকল্পনার উৎসাহে আলোচ্য বিষয় বিস্তৃত হ'য়ে—এমনভাবে লেখেন যেন সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর আশ্রয়-পরীক্ষা ও স্বপ্নতোক্তি। যেমন কবিত্বের, তেমনি প্রবন্ধরচনার অনেক সময় আচ্ছাদনের ব্যবহার উপকারী হয়; সাহিত্য বিষয়ে কিছু বলার থাকলে তার একটি প্রশস্ত উপায় হ'লে। বিশেষ কোনো কবি অথবা গ্রন্থের সমীক্ষণ, সেই অবলম্বনটিকে ছাড়িয়ে-ছাড়িয়ে লেখকের চিন্তা উন্মীল হ'তে পারে—এবং কবিতা সাধারণত এইভাবেই সমালোচনা লিখে থাকেন। রবীন্দ্রনাথও এর উদাহরণের অভাব নেই, কিন্তু

'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' ও সর্বশেষ 'সাহিত্যের স্বরূপ'—এই তিনটি গ্রন্থে বিস্তৃত রকম ভাষিক বা দার্শনিক আলোচনার দিকে তাঁর প্রবণতা দেখি; 'সাহিত্যের তাৎপর্য', 'সাহিত্যের সামগ্রী', 'সৌন্দর্যবোধ', 'সাহিত্যবিচার', 'সাহিত্যাবধি', 'তথ্য ও সত্য'—এই সব শিরোনামা, মানতেই হবে, প্রথম দর্শনে তেমন উৎসাহজনক নয়; আমাদের মনে হ'তে পারে যিনি 'সাহিত্য', 'সত্য' বা 'সৌন্দর্য' বিষয়ে তাঁর ধারণাটি বেশ স্পষ্ট কথায় বলে দিতে পারেন তিনি আর যা-ই হোন, কবি নন, এবং রবীন্দ্রনাথ কেমন ক'রে এই বিমূর্ত বাস্তবের বিচরণ করেছিলেন তা ভেবে আমাদের বিস্মিত হওয়াও স্বাভাবিক। কিছুটা বেদনার সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় যে ভতরিনে এই কবি তাঁর দেশের প্রধান পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছেন; যে-কোনো প্রশ্ন তাঁর সামনে উপস্থিত করতে লোকেরা যেমন আর সংকোচ করে না, তেমনি তাদের সম্ভাব্য-সাধনের চেষ্টাও তাঁর কর্তব্য-ভালিকার অন্তর্ভুক্ত; এমনকি, 'কবিতা কাকে বলে' এই রকমের অসম্ভব প্রশ্ন উপস্থাপিত হ'লেও তাঁর মৌন থাকার উপায় নেই। পক্ষান্তরে, এমন সম্ভাবনাও স্বীকার্য যে জীবনের প্রধান সৃষ্টিশীল অধ্যায় উত্তীর্ণ হবার পর, এবং তাঁর 'বিরুদ্ধে' একদল অর্বাচীনোর কলহ শুনতে গেয়ে, তিনি তাঁর অচেনা সাহিত্যবর্গকে গভেচন করে ব্যক্তি-কহার চেষ্টা করছিলেন; হয়তো তাঁর সাহিত্যিক আদর্শ ও বিশ্বাস সম্পর্কে নিজেই কাছে একটা জ্ঞানবধি দেবার ইচ্ছা তাঁর হয়েছিলো। এই প্রচেষ্টা বিপজ্জনক, কেননা কোনো ভাষিক ব্যাখ্যার মধ্যে কবি তাঁর কবিতাকে ধরাতে পারেন না; তবুকে ঝাঁটে করত পেলে বস্তু কতো ধানের খাঁটি বেরিয়ে পড়ে, আবার উদ্ধার হ'তে গেলে তা সর্বসাহিত্যের নিবিশেষ আধার হ'য়ে যায়। এ-অবস্থার কবিতা একমাত্র যা করতে পারেন রবীন্দ্রনাথও তা-ই করেছেন: অসিফিটল বা আলগারিকদের মতো বিষয়টিকে সূক্ষ্মগুণি আক্রমণ না-করে সেটিকে ঘিরে-ঘিরে কথা বলেছেন তিনি; তাঁর রচনার মধ্যে প্রবেশ করেছি শংশার, কৌতুক, পুনরুক্তি, অস্থিরতা; কোনো-একটি উক্তি ক'রে তখনই তাকে সীমিত, খণ্ডিত বা বিস্তারিত করেছেন; কোনো প্রবন্ধ শেষ করারাত্র

সেটিকে আর পূর্ণাঙ্গ বলে তাঁর মনে হয়নি—তাঁরই জেব টেনে, তাঁর প্রতিবাদে ও সর্মথনে, আবার লিখতে হয়েছে। সেইজন্য তাঁর তত্ত্বালোচনা এমন সঙ্গ্রাণ ও উদ্বিগ্ন, তাকে আমরা বলতে পারি একটি আন্দোলন: 'অলি বার-বার ঘিরে যায়, অলি বার-বার ঘিরে আসে'—লেখকের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধটি বেনে এইরকম, তা না-হ'লে যে ফুল কোটে না। এই 'ফুল' হ'লো রবীন্দ্রনাথের দু-একটি তীর্থ ও সম্ভ্রান্ত অহঙ্কৃতি, তাঁর হৃদয়ের মধ্যে অনির্ধ্বনীয়ের উদ্ভাস; সেটি কোনো প্রমাণলাপেক তথ্য নয় বলে উপমা, রূপক ও অলিধর্মী হিলোল ভিন্ন তাঁর সঙ্গে ব্যবহারের কোনো পথ নেই। তা নেই বলে তাঁর সব তর্ক গান হ'য়ে ওঠে—'ঘরে বাইরে'র বিমলার কথা চুরি ক'রে বলছি; কিংবা এর চেয়েও সঠিক বর্ণনা, যদি দিতে চাই তাও রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই পাওয়া যাবে। 'ছন্দ' গ্রন্থের আরম্ভে 'সই, কেবা শুনাইল শ্রামনাম', এই পংক্তি উদ্ধৃত করে তিনি মন্তব্য করছেন যে এই সাধারণ সাংবাদিকে ছন্দের মধ্যে এমনভাবে ছলিয়ে রেখে হয়েছে যে পাঠকের মনে 'কেবলই ঢেউ উঠতে লাগলো। ঐ কটি কথার...অন্তরের স্পন্দন আর কোনোদিনই শান্ত হবে না। ওরা অস্থির হয়েছে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ।' পড়ছন্দের এই ইন্দ্রজাল আমাদের কারোই অজানা নেই; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের গভীর অভিধাতে কখনো-কখনো অমনি ক'রেই অভিভূত হ'তে হয়, আমাদের মনের মধ্যে 'কেবলই ঢেউ উঠতে থাকে,' কথা শেষ হ'লেও স্পন্দন থাকে না। আরো আশ্চর্য এই যে তাঁর এই কিম্বদন্তি আবার সেখানেও গুরতে পাই যেখানে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক; বরং সেখানেই বেনে নিঃস্রবভাবে শুনতে পাই; তাঁর ছন্দ ও শব্দত্বের আলোচনা শুধু আমাদের বুদ্ধির কাছে বার্তা পাঠায় না, আমাদের সমগ্র সম্ভ্রান্তে পুলকিত ক'রে তোলে। হয়তো কোনো নীমাংসার তীরে তিনি উত্তীর্ণ করেন না আমাদের, কোনো তৈরি সভ্য কখনোই হাতে তুলে দেন না; কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে একটি বেগমধার করেন, যার ফলে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে আমাদের নিজেদের ভূট স্মৃতি, স্বপ্নের ভগ্নাংশ, চিন্তার

কবিতা

আঁবাচ ১৩৬৭

রশি, হয়তো ইজিরের কোনো নৃতন শিহরণ। আমরা চকন হয়ে উঠি, তেলা নিয়ে তলে পড়ি সমুদ্রে; তিনি আমাদের স্বাধীনভাবে সত্যাহরণে যাওয়া করিয়ে দেন—এই তিনি করেন আমাদের—যদি আমরা নিজেদের অক্ষমতাবশত মধ্যসমুদ্রে ছুঁব মরি, সে-দারিহ তাঁর নয়, আর যদি-বা তাঁর হয় তবু তো মালতে হবে যে বেরিয়ে পড়েই আমরা সার্থক হয়েছি। 'ওরা অস্থির হয়েছে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ': তাঁর প্রবন্ধনগ্রহের সু-পক্ষে এই কথাটি উক্তভিযোগ্য।

৫

রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনাকে অল্প এক ভাবে ভাগ করা যায়: একদিকে সরকারি বা গোপনিক, অল্প দিকে ঘরোয়া বা আটপোরে। এই বিভাগ তাঁর প্রবন্ধের পক্ষেও অর্থহীন নয়, কিন্তু পত্রাবলি ও ভ্রমণবৃত্তান্ত বিষয়ে আক্ষরিকভাবে প্রযোজ্য। পত্রাবলিকে বাদ দিয়ে তাঁর গল্পসাহিত্য বিষয়ে চিন্তা করা যায় না, কেননা তা শুধু পরিচাণে অল্প নয়, কখনো-কখনো সাহিত্যগুণে ভরপুর। কিন্তু যেগুলো তাঁর সভ্যতার চিহ্নি, এবং সেই সঙ্গে স্বর্গীয় সাহিত্য, সেগুলো সবই তাঁর যৌবনের রচনা; যেদিন থেকে শাস্তিনিকেতনের গুরুদেব ও ভ্রমণের গুরু-স্বামীর হবার দূরত্বা তাঁর ঘটলো, সেদিন থেকে চিহ্নি লেখার হযোগ তিনি হারানেন; তাঁর জীবনের শেষ দৃষ্টি বা গণিত বহুরে তিনি পত্রাবলি বা কিছু লিখেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ অংশ গল্পবৈদ্য প্রবন্ধ, বা অন্তত প্রকাশের জুই রচিত; অল্পগুলো অহরোধবন্ধার্বে বা কর্তব্যাবোধে লেখা, তাতে কখনো কোনো মহিলাকে তিনি সাধনা বা উপদেশ দিচ্ছেন, কখনো বা সমকালীন পুস্তক বা ঘটনা বিষয়ে তাঁকে কিছুটা অনিচ্ছা কাটিয়ে অভিমত দিতে হচ্ছে। শেষের দিকে তাঁর প্রতিটি চিহ্নি প্রতিক্রিয়া রেখে তবে তা ভাবে পাঠানো হ'তো; চিহ্নির স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে এত বড়ো বিয় আর নেই; তাঁর এই পর্যায়ের চিহ্নিপত্র সাধারণত এমন অব্যক্তিক যে প্রায় যে-কোনোটি যে-কোনো ব্যক্তিকে পারিয়ে দিলে অশোভন হ'তো না। অথচ এই অবস্থাতেও, তিনি নিতান্তই রবীন্দ্রনাথ

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪

ব'লে, অনেক পক্ষে অল্পবিস্তর সরসতার তিনি সঞ্চার করেছেন, তাঁর হাতের গুণে খুঁচরো স্বরের চিরকুটও স্বাচ্ছন্দ্যে, কাছের কথাও প্রয়োজনের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। যাকে বলে গুণবান বা দক্ষতা তা যেন তাঁর নয়স্বরণে হস্তাক্ষরের মতোই তাঁর সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো; তা দেখে তাঁকে ধন্ত না-ব'লে যেমন পারি না, তেমন আমাদের দীর্ঘবাস পড়ে সেই স্ববর্ণগুণ স্বরণ ক'রে, যখন পত্রলেখক ও প্রাপকের মধ্যে সূত্রাকরের উপজ্ঞান হানা দেয়নি। সেই যুগের একটি শ্রেষ্ঠ কল 'ছিন্নপত্র'—অমর কাব্য 'সোনার তরী' ও 'গল্পগুচ্ছ'কে মনে রেখেই একথা বলছি: এমন প্রাণোচ্ছল, যুগপৎ এমন ব্যক্তিগত ও সার্বিক, এমন চিরনতুন ও অক্ষরস্বরূপে পাঠযোগ্য পত্রপরিষদ রবীন্দ্রনাথও আর দ্বিতীয়বার রচনা করেননি। কল্পনা, স্বাক্ষর, মনস্বিতা; অল্পচিন্তনের আবিষ্কার ও বহির্ভাগতের বাস্তব তথ্য; চোখ দিয়ে দেখা ও মনে-মনে ভাবা;—এই সবই আছে 'ছিন্নপত্রে', আর সেই সঙ্গে আছে আর-একটি ব্যাপ্ত সভা, যার নাম বাংলাশে ছাড়া আর কিছুই দিতে পারি না। স্বভূত, নদী ও ভূগতকর্য বাংলায় পত্রীপ্রকৃতি, তাঁর কাহিনী, গদ্য ও বার্তা নিয়ে, এই পুস্তকের অক্ষর থেকে এমনভাবে আমাদের ইজিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে 'ছিন্নপত্র' নামটি উচ্চারণ করলেই বাংলাদেশের একটি মানসমুতি আমরা দেখতে পাই। এবং এগুলো ঝাঁটি চিহ্নি, বস্তুই বস্তু বা স্বাধীনতার কাছে বার্তাপ্রেরণ, এখানে সচেন শিল্পিতার কোনো চেষ্টা ছিলো না, লেখার পরে রবীন্দ্রনাথ ভুলেও গিয়েছিলেন। তাঁর স্বতঃকৃতি একান্তভাবে জরী এখানে।

অপরিচিত বা ঘন-পরিচিত ভক্তের কাছে আত্ম-উদ্ঘাটন রিলকের পক্ষে যেমন সহজ ছিলো, তেমনই ছিলো রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরোধী; আমরা দেখতে পাই তাঁর যে-কোনো পর্যায়ের প্রকৃষ্ট চিহ্নি কোনো নিকট স্বাধীন বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে লেখা হয়েছিলো। সত্যেরো বছর বয়সে, প্রথমবার বিলেতে গিয়ে, তিনি যে-স্বপ্নবৃত্তান্ত লেবেন সেটিকে গল্পসাহিত্যে তাঁর প্রতিভার প্রথম স্বাক্ষর বলা যায়; 'মুদ্রা-প্রবাসী'র পত্র, ভূগোল সাংগিক পক্ষে ছাপা হয়ে থাকলেও, প্রকাশের জুই লেখা হয়নি; জোড়াসাঁকোবাসী স্বাধীনদের

উদ্দেশ্যে যথার্থ ই চিঠি লিখেছিলেন বলে তাকে সেই অন্তরঙ্গতা ধনিত হয়েছে, যা পরে আমরা 'হিমপত্রে' ও 'হুবোপসাজীৱ জায়রিত'ে পাই, কিন্তু পরবর্তী ভ্রমণগ্রন্থ 'ও পত্রাবলিতে' যা বিলীয়মান। এই পুস্তকটির প্রমাণ করে যে যে-কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দয়াকারি' সাহিত্য 'সাদু'ভাষায় লিখছিলেন সে-কালেই, এমনকি চৌধুরীর বহু পূর্বে, তাঁর 'ধবোদা' সাহিত্যে 'চলিত' ভাষা স্নোতবিনী হয়ে উঠেছিলো; অতথানি স্বভাবমৈপুণ্য সত্ত্বেও কেন যে তিনি 'সদুপত্রে'র পূর্বরূপে চলিত ভাষার প্রকাশ্য ব্যবহারে স্ক্রুতি ছিলেন, আমরা তা ভেবে অবাক না-হয়ে পারি না।

উত্তরযৌবনে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধ কেউ ছিলেন না, ছিলো এক বিরাট ভক্তগুপ্তদার, সৌরকেন্দ্রিক বহু মণ্ডলে বিভক্ত। ততদিনে তাঁর ব্যক্তিজীবনে বহু পরিবর্তন ঘটেছে; পত্নী এবং ছই প্রজকতা মৃত; যৌবনের বন্ধু বা পরিবারভুক্ত বনিষ্টেবা মৃত অথবা হিম্মযোগ; বাংলাদেশে কেউ নেই যাঁকে তিনি মরকক বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত পারেন; সম্রাট তিনি বাংলা সাহিত্যের, জগতের তাগে প্রাচীর প্রতিভু, ইংরেজ-শাসিত নিখিলভারতের আত্মসংগঠার প্রতীক, এবং পূর্বে পশ্চিমে নিবন্তর জায়মাগ। তৎকালীন পক্ষে ও প্রবাহে এই সবই প্রতিফলিত হয়েছে। উপরন্তু, এই সময়েই গজরীতি নিয়ে স্নান্তি-হীন পরীক্ষার তাঁকে প্রবৃত্ত দেবি; তাঁর জীবনের শেষ কৃতি বহুরের গজে মৃত নৃতন ও নৃতনতর ভঙ্গি দেখা যায় পূর্বতন চলিত বহুরের রচনার মে-তুলনার প্রায় কিছুই নেই; যদিও চলিতভাষাকে আগেই একান্তভাবে মেনে নিয়েছিলেন, গজশিল্পে সচেতন পরীক্ষার 'লিপিকা'তেই আয়ত্ত। যা কোনোরকমেই গজ নয়, গজ-গজের মাথাগাখি জায়গায় অব্যবহিতভাবে পড়েও নেই, যা নিতুল-ভাবে গজ এবং নিতুলভাবে ছন্দাম্পনিত, এই ধরনের রচনাপূর্ণায় তাঁর অন্তর্জীবনের প্রধান অবদান। 'লিপিকার্য' তৃপ্ত না-হয়ে 'পুনশ্চ' লিখলেন; তারপর তিনটি নৃতনাট্যে গজকবিতার নৃতন রূপকল্প; 'শেষের কবিতা' থেকে 'সালঙ্ক' পর্যন্ত উপজ্ঞান; অবশেষে 'ছেলেবেলা', 'দহু পাঠ', 'গল্পমালা'। তুল্যমূল্য নয় এরা, কিংবা আমি এমন কথাও বলতে চাচ্ছি না যে সামগ্রিক

বিচারে এই পর্বায় পূর্বরচনার চেয়ে উৎকৃষ্ট; কিন্তু এ-বিষয়ে সম্মত নেই যে এই রচনারাধার মধ্য দিয়ে গজশিল্পের এক ভ্রাবিহিত বিচিত্র বিকাশ সম্ভব হয়েছে; বিশেষ অর্থে আধুনিক বলতে পারি এমন বাংলা গজের এরা প্রবর্তক ও বিবর্তক। গজের প্রতি বুদ্ধ কবির এই নিবিড় মনোযোগের একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে সাধুভাষার তুলনার চলিত ভাষা অনেক বেশি নয়, তাতে নীলা ও ভদ্রবৈচিত্র্যের অবকাশ রবীন্দ্রনাথের কানে ও মনে অসমোভাবে ধরা পড়েছিলো; এবং যৌবনে যেমন বাংলা গজের প্রতিটি সম্ভবপন ছন্দকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন, তেমনি প্রৌঢ়জীবনে গজের ধনিমাদুরীকে নানা রূপে উদ্ভাবন না-করে পারেননি। অজ্ঞ কারণ হয়তো এই যে তিনি ভিতরের দিক থেকে স্নান্ত হয়েছিলেন; বলার কথা আর ছিলো না বলে তাঁইল তাঁর অবলম্বন হয়ে উঠলো। তিনটি নৃতনাট্যের মধ্যে দুটিকই কাহিনীর অংশ তাঁর নিজের পূর্বরচনা থেকে আহরিত; 'ছেলেবেলা'র নৃতন কোনো উপাদান নেই; 'রাভা ও রাবী'র রূপান্তর হ'লো 'পগভী'; 'রাভা'র, 'শাপমোচন'; 'একটি আখ্যে গল্পের', 'তাদের দেশ', ও 'পূজারিনী' কবিতার, 'দটীর পূজা'। নৃত্য, সংগীত ও অভিনয়ের আবেদন থেকে চ্যুত করে দেখলেও, শুধু পঠনীয় পুস্তক হিসেবে, এই সব পুনর্লিখনের মর্মণা যে অনবীকার্য ভাৱ কারণই এদের গজরীতির কাঙ্ক্ষমিতা।

এই পর্বায়ের ভ্রমণগ্রন্থের প্রধান লক্ষণ এই যে রবীন্দ্রনাথ কখনো তুলতে পারছেন না তিনি রবীন্দ্রনাথ, 'ক্সফলের ভাৱ' বহন করে পৃথিবীতে বেরিয়েছেন। যেমন এককালে মর্ষ ইন্ডিয়া দিয়ে বাংলাদেশ ও ইংলণ্ডকে অস্ত্রস্থ করেছিলেন, জাপান, রাশিয়া বা দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে তেমন ব্যবহার আর নেই তাঁর; তাঁর চক্ষু আর তথ্য ভাষে না, জাগোজিয়া শুধু পূর্বপরিচিত জুইফল মাড়া ধের; নৃতন দেশের কোনো দৃশ্য বা আবহ আর সৃষ্টি করেন না আমাদের জন্ত। স্বদেশের সঙ্গে অন্তর্জাত দেশের তুলনার তিনি ব্যাপৃত; স্বদেশের জীবনিকর চিন্তার আচ্ছন্ন তাঁর মন; বিচার, বিতর্ক ও বিশ্লেষণে তিনি এতদূর পর্যন্ত নিযুক্ত যে 'বাশিয়ার চিঠি' প্রায় একটি রাজ-

নৈতিক নিবন্ধ হয়ে উঠলো। অথচ প্রতিটি পুস্তকে গল্প এমন বেগবান ও ছাতিময় যে তার প্রভাব তাত্ক্ষিক মূল্যকে ছাপিয়ে পড়ে; সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে বা পাঠযোগ্যতা শিল্পগুণে স্বরঞ্জিততার মূল্য পায়। আমার এই কথার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'বাকী'; তার ভাবগভীর স্বগতোক্তি মধ্য জ্ঞানের কথা বা আছে তা অল্প লেখকও শোনাতে পারেন, কিন্তু হৃদয়ের সান্নিধ্যলাভে যে-আনন্দ পাই তা রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব দান। এবং, কোনো বিষয়ব্যক্তিরকে, শুধুমাত্র ভাষার উপর কর্তৃত্বের ফলে, কতদূর পর্যন্ত রমণীয় রচনা সম্ভব, তার দৃষ্টান্ত 'ভাট্টাচার্যের পত্রাবলী'; পত্রপ্রাপিকা বালিকাটিকে রবীন্দ্রনাথের কিছুই বলার নেই, শুধু বোলাচ্ছিলে তার উপযোগী কথা বয়ন ক'রে যাচ্ছেন, এবং ফলত বা ঠিকিয়েছে তা সকলের পক্ষেই সম্ভোগ্য। একে এক ধরনের 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' বললে হয়তো ভুল হয় না।

মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের রচনার স্থায়িত্ববিষয়ে সন্নিহান হয়েছিলেন। রোগ ও জরা তাঁর নমকে তখন দুর্বল ক'রে দিয়েছে, তাঁর ভাষার তরুণ লেখকেরা অ-স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হচ্ছেন, সমাজস্থির মানস বাদের প্রভাবে এমন কয়েকটি অপবাদ তাঁকে স্নাত্তে হচ্ছে বা একবারেই অসাহিত্যিক ও অবাস্তব। ভাবতে বেরনা বোধ হয় যে তিনি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এর ফলে দুঃখ পেয়েছিলেন; বিরুদ্ধ মতের উত্তর দেবার সুযোগ হারাননি, এমনকি তরুণ লেখকদের প্রতি ব্যাধোক্তিও তাঁর পরিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। বিশেষত তাঁর আত্মকালের শেষ বয়সরটিতে তিনি নিজের রচনা বিষয়ে অবিচলভাবে কথা বলেছেন—যা এর আগে কখনোই করেননি; তার অনেক আগে প্রতিশ্রুতি প্রবন্ধাকারে বা বিভিন্ন লেখকের হৃতিকথায় বিদ্যুত আছে। বার-বার বলেছেন তাঁর ছোটগল্পের কথা—যাকে কোনো-এক সমালোচক 'পীড়িতবর্ণী' বলতে তিনি ব্যথিত হন; তাঁর ছবির বিষয়ে মুগ্ধ হয়েছেন মাঝে-মাঝে; স্বরণ করেছেন লণ্ডনে রটেনস্টাইনের বাড়িতে সেই সম্মান, যখন ইয়েটস তাঁর ইংরেজি 'পীড়িতবর্ণী' পাঠুলিপি পাঠ করেন। তিনি যে 'চোদ্দ অক্ষর মোহাতে' পানেন তা সহজে মনে করিয়ে

দিয়েছেন আমাদের; অবশেষে বলেছেন, 'বাংলাদেশের লোককে আমার গান গাইতেই হবে; আর-কিছু যদি নাও থাকে, তবু আমার গান থাকবে।' কিন্তু অনেক কথা বলেও তাঁর গল্প বিষয়ে কিছু বলেননি; এমন কি হ'তে পারে যে তাঁর নিজেরও মনে হয়নি যে তাঁর প্রসঙ্গে সেটাও আলোচ্য? সত্য, যিনি কবির অভিধা নিজের প্রাণ্য বলে জেনেছেন তাঁর আর-কিছু চাইবার থাকে না, ঐ একটি কথাতেই সব বলা হ'য়ে যায়; কিন্তু তাঁর গল্পের স্বতন্ত্র দাবিকেও উপেক্ষা করা অসম্ভব। আজকের দিনে, তাঁর মৃত্যুর হৃদি বছর পরে, সহজেই বলা যায় যে তাঁর গান বিষয়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে, এমনকি হয়তো উন্নয়নাত্মকভাবে; রেকর্ড, রেডিও ও সিনেমার বিপুল প্রচারের ফলে বাংলাদেশে আজ প্রায় এমন কেউ নেই যিনি তাঁর গানের দু-চার কলি না জানেন, কিন্তু অনেকে হয়তো দেউতাক বাইরে তাঁকে আর কোনোভাবে জানেন না। শিক্ষিত তরুণেরাও তাঁর গানের দ্বারা যতদূর মোহিত তাঁর পঠনীয় রচনাবির সঙ্গে ততদূর পরিচিত নন; তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করেছেন এমন যুবক আজকের দিনে বিরল; এবং তা নিয়ে আক্ষেপ করাও বুঝা, কেননা যুগধর্ম অগ্রতিরোধ্য, রবীন্দ্রনাথের 'প্রত্যাবর্তন'র জন্ম অপেক্ষা করা ভিন্ন উপায় নেই। সেই দিনের উদ্দেশ্যে বলে রাখতে চাই যে কোনো ভাবী পাঠক যখন সমগ্র রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গল্পরচনা পড়বেন, তাঁর ধারণা হবে তিনি গল্পশিল্পে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পুরুষ, এবং বিশ্বসাহিত্যেও গরীয়ান। বৈদেশিক কোনো-কোনো লেখকের কথা আমরা ভাবতে পারি ধারা তাঁর চাইতে ভালো নাটক, ভালো উপজাস বা প্রবন্ধ লিখেছেন, কিংবা ধাঁড়ের গল্প আরো তীব্র বা গভীর; কিন্তু গল্প-শিল্পের এমন ঐশ্বর্য, এমন বিচিত্র বৈভব আর কারো রচনায় প্রকাশ পেয়েছে কিনা সম্ভব। একজন কবির বিষয়ে এই কথাটা যুব আশ্চর্য পোনার, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে অপরিমেয়রূপে প্রতিভাবান ছিলেন সেটা তো তাঁর অপরাধ নয়।

কবিতা
আষাঢ় ১৩৬৭

ছোট কবিতা

অনুভব

সে যদি অপরিহার্য তবে কেন মন
বার-বার নিরুত্তর? আশ্রয়ানি পড়ন্ত বিকেলে
প্রত্যহ আসে বার, প্রাকৃত ভাষণ।
ধান কাটা শেষ হলে আদিগন্ত যৌন শূন্যতার
ভরে তীত্র অশঙ্ক ক্রান্তিতে, প্রগাঢ় আধার
নয়ন সহজ এক শান্তি আনে দেহের সীমায়।
ভালোবেসে অন্তরদ, তার নাম স্বপ্নে মনে হয়
ছুই আত্মা অবিচ্ছিন্ন গে-নারী অস্বর্গশাস্তা নয়।

ঘে-ধারণা ছিলো

ঘে-ধারণা ছিলো, তার অহস্তিত্ব নিভৃত নিলয়ে
পরিভাগ করে মন দীর্ঘ উপবাসী
নাগরিক হ'তে চায়; প্রেয়াস্পা বৃষ্টি কোন হৃদয়ী উর্বশী
হৃদংহত ঘোঁষনের একমাত্র অবলম্বনীয়। মুক্তিকাকে ছুঁয়ে

শপথ অত্যন্ত সত্য; বোনের শিকড়ে
সতেজ, অপরিমিত তেজস্কর সত্যতার বাদ;
নিখাসে কয়লার গদ। প্রশমিত বৃষ্টি বড়ে
উত্তেজনা পিকেটিং, ধর্মঘট। পল্লভরা-ধ'সে-পড়া উন্নত প্রাসাদ

কবিতা
বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪

মৃগপং মহাশব্দ; কালক্রমে নতুন পুথিবী
ধীরে-ধীরে উচ্ছ্বাসিত। অথচ হাণ্ডাকার্যে অভিজ্ঞতা নেই।
বিদ্যুৎ, অ্যাটম আর রকেটের অবশ্যজ্ঞাবহী
কলাফল ব্যক্ত হয়। পরিণত, সমৃদ্ধ রূপেই...

কৃত্রিম, অভ্যাসপুষ্ট। কণ্ঠস্থায়ী নাগরিক মন
বিমূর্ষ, বিখাদক্লিষ্ট। গাভ্রঘরে রূপবতী নর্তকীর গাল।
ধারণাবিমুক্ত চিন্তা: অনেকাংশে ভালো আজ ক্লকহুড়া, জারলের বন।

কবিতা
আষাঢ় ১৩৬৭

দুটি কবিতা

সেই পাগল

সেই এক দুর্লভ পাগল
প্রথম কোথায় কবে মনেও পড়ে না
লোহা ইট পার হয়ে, পার হয়ে বিকেলের সোনা
হয়তো বা শহরের অন্তিম সবুজ
আয়ুহীন শুদ্ধতাকে খোঁজে।

মুক্তবদ্ধ প্রমিথাস : মনে হয় দেখি যতবার
অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে কল্লোলিনী হয়ে আছে স্থির
শুভিত টোটেস ফুলে ; ভাবাহীন বিশ্বের গভীর
খনির রহস্য থেকে চোখ তার যেম আবিষ্কার।

মনে হয় কোনো-এক অপার্থিব মৌলিকের ধ্যান
আত্মার গুহায় ঢুকে নিয়ে গেছে তার অভিজ্ঞান
আমাদের পরিচিত যত কিছু হয়ে এসে পার
মাদু তার ছেয়ে আছে ওপারের গুচ অন্ধকার।

শাবধানে দেখি তাকে, ভয় করে অন্তরঙ্গ হতে,
তার নবুতায় যদি ছিঁড়ে যায় ? যদি সে হঠাৎ কাছে এসে
বলে ওঠে, “আপনার মৃত্যু হ’লো কিদে ?”

কবিতা
আষাঢ় ১৩৬৭

ব্যর্থ প্রেমিকের গান

নরক কি এ-সবক ? অচিকিৎসা অহুশোচনীয়
বিশ্বভিত্তি স্বর্ণ শেষে রয়েছে কি মুক্তি কামনার ?
না কি সেখানেও শীত—হিমশ্রব অথচ অদার,
আবার কটাহে বাবে এ-উচ্ছিষ্ট তৈলাক্ত ফুর ?

হে স্থতি, হৃদয় তরী, দুহনে তো ঘুবেছি অনেক
মুখর মাতাল সোতে, উন্মত্ত লবণাক্ত নীরে
অগ্রমত্ত ভোরে পাড়ি ; শেষ হ’লো সোনাল্লা ভীরে,
শেষে তোমাত্তেই ঐকি প্রেমচিহ্ন, হোক অভিযেক।

নরক এমনই বুঝি ? সর্বস্বাত, ছায়ায় গভীর !
ভেনন বিরত নই, ছায়াপথ আত্মীয় নারী,
তাদের শরীর আজো প্রজলন্ত স্বপ্নের কণায়
আমি তো কোটাতে পারি চিত্তন, মরীচিকাময়।

কবিতা
বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪

দ্রুত কবিতা

আদিগন্ত

নিশিদিন ঝ'রে ঘাই বসন্তের কীটিনাশ। তাপে ।
শরীরে আসদ ফোটে, কাটে বেলা বিপুল বিবাদে ;
অনেক দূরের আশ কাছের গোলাপে পেতে চেরে
বুকের বাগান ভেঙে একটি পাখির দৃশ্য উর্ধ্বে উঠে যায় ।
আর এক আবির্ভাব শোণিতের শেষ বিস্ফোরণে
আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে জ্বালায় উদ্ভাস শিখা চোখের নিখিলে ;
এবং তখনি—

আমার সমস্ত শ্রম অনায়াসে ব্যাণ্ড দেবি দিগন্ত অবধি ।

নিম্নিময়

ভূমি ফোটে চতুর্দিকে, বৃক্ষমূলে আমি ব'সে থাকি ।
একরা দুর্বার রাজি একমাঠ উধাও আকাশে
নক্ষত্রের মতো দীর্ঘ যত দীপ্ত বাসনার ধাঁধা ছুরেছিল
—আজ তারা কেউ নেই ভোদের অরান অবকাশে ।

যা লিখি, লিখেছি, সব শুধু ভূমি, তোমারি প্রতিমা ।
আমার গোলাপ তবু বিহ্বল গুলোর নিরুপায়ে
কীটার রক্তাক্ত ফোভ ব্যাণ্ড করে অনিশ্চেষ্ট ছোড়ির দহনে ।
ভূমি তাকে কোনোধিনি ওই দূর মন্দিরের গভীর পাষাণে
যদি স্পর্শ করে, তবে চেরে দেখো দুপের দুর্লভ মধুরিমা
কী গভীর রূপে মুক্ত দেবতার দক্ষিণ বাহুর বরাভয়ে ;

কে কাকে ফোটার শব্দে, কবিতায় কান পাতি জরে, পরাজয়ে ।

কবিতা
আষাঢ় ১৩৬৭

নক্ষিলা

মণিকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অহাতি দেবার লগ্ন এসেছে অন্ধকারের রাজ্যে,
সমর সহসা বলকে উঠলো কালপুরুষের বজ্রে,
প্রতিবিস্তিত মূর্ণবে কাঁপে অসমসাহসী দৃঢ়
চতুর্দিকেই ঘুরছে চতুর অবিকল অবিসৃষ্ট ।

অতএব নব নাগরিকতার আঁধার ছদ্মন বন্দী,
অধুনা বিবেকী বহু স্বয়ং এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী,
হৃদয়বর্ণ বজ্রহস্ত শাসার ঐপদী সাক্ষ্যে
ললিত শুভ কস্ত্র কঠোর সাজানো মরল বাক্যে ।

যেহেতু আকাশে বাউল বাতাস চৈত্রারিনেরা দৃষ্ট,
মদবিহীন মূসর শূন্য বাসনা অপবিত্র,
আয়েয় নীল নীল শরীর চিরক বক পৃষ্ঠ—
অন্ধকারের মৃত্যুগর্ভে আলোকিত পরিণতি ।

হৃৎতায় মুহু বন্দনা করি কাব্যবিহীন পড়ে
প্রলয়ের মতো নিরুদয় রক্তে আশের মধ্যে মধ্যে,
—আপাতত আছি নিরাপত্তার স্বয়ং-স্বষ্ট স্বর্গে
সহসা সময় বলকে উঠলো কালপুরুষের বজ্রে ।

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪

জ্ঞানান্তিকে

(পোল ভানেরি অহসরণে)

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কী কাজ করো তুমি ?—সবি তো করে থাকি ।
মূল্য কত, বলে।—মূল্য ? মুশকিল ।
যেমন এই ধরো বিরাগ তিল-তিল
পূর্ণ জ্ঞান আর অরুচি ধের ফাকি...
মূল্য কী তোমার ?—তা বলা মুশকিল...
কী চাও ?—কিছু না ; তা সবি তো নিয়ে থাকি ।

কী তুমি জানো, বলে।—বিরাক্তির সীমা ।
করো কী সর্বদা ?—স্বপ্ন দেখি খালি ;
এবং ঘটে আছে বুদ্ধিতরা ভালি—
তা দিয়ে রাত কবি উবার বঙ্কিমা ।
করতে পারো কিছু ?—স্বপ্ন দেখি খালি,
তাতেই দূর হয় মনোরজিত অমা ।

কী চাও, ঠিক বোলো।—আশ্বমদল ।
জানো কি কোনো পথ ?—তা-ই তো খুঁজি রোজ—
সব যে দিনযিনে নষ্টামির ভোজ
তাই জ্ঞানের বল খুঁজি অমর্গল ।
তাহ'লে কিসে ভর ?—ইচ্ছে, তার তেজ ।
তুমি কে ?—অভাঙ্গন, কেউ না, দুর্বল ।

কবিতা

আষাঢ় ১৩৬৭

কোথায় চলেছো যে ?—বিলুপ্তির কাছে ।
সেখানে করবে কী ?—থাকবে। প'ড়ে মৃত ;
সেখানে আর নয়, যেখানে অবিনীত
দিনের পর দিন পচবে একই নাচে ।
যাচ্ছে কোমথানে ?—কবরে নিশ্চিত ।
কবরে ? সেখানে কী ?—মৃত্যু জেগে আছে ।

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৯

সমুদ্র-কৈ

বটকৃষ্ণ দাস

সমুদ্র যেন বামিনী রায়ের গট,
রঙে ও বেথায় অপক্লপ বাজনা ;
কথু-কথু চলে অনাদিকালের ভট—
যেন কোমোদিনি বিহুনি হয়নি বোনা,
রঙে পোড়ায়, আঁহা, বিরহিণী নারী ।

মনোভার যেন বইতে পায়ে না দেহ,
চুপে পীড়া সহস্র ধমনীতে,
শুনচুড়া তার বেদনামণিতে, বেহ,
বিগলিত ধারা উদয়ের ত্রিষলীতে,
বাহুভুলে গ্রেম দিগন্তদ্বারী ।

সমুদ্র, আসি হৃদর মঞ্চস্থলে
দ্রুপিত এক অঙ্গুলিতে থাকি,
শিক্ষকভায় কোনোয়তে যিনি চলে,
চাঁক পেলে দেশী বিদেশী কবিকে ডাকি,
একযোগে কোনো দুবাস্তে দিই পাড়ি ।

পাড়ায়-পাড়ায় লোনা হাঁওয়া এসে ডাকে :
সমুদ্র, তাই তোমার কাছেই আসি,
কিছু পাই, কিছু ভাবনায় মিশে থাকে,
কিছু তার হাতে দিই থাকে ভানবসি,
কিছু কেড়ে নেয় জীবনের বাসিরাড়ি ।

কবিতা

আবাত ১৩৬৭

ওগো বধু হুম্মরী

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

নাগর-পারের ওগো বধু হুম্মরী
নাগর তোমার মুহুরিত পদতলে ;
বৃক্কের গভীরে ডুবেছে সোনার তরী,
বাসি অমৃত-ও একাকার নোনা জলে !

আকাশে কেবল বাতাল বৃত্ত চাঁদ
উলঙ্গ মেঘে মনের বেহালা বাজায় ।

অনেকে সেদিন এসেছিল নানা রূপে :
কেউ আলো, কেউ ফুল বা রূপের ভাল।
এনেছিল আর চেয়েছিল চুপে-চুপে
তোমারই গলায় পরাতে তাদের মালা ।
কিন্তু মজেনি অটল তোমার তছ,
কারণ ওরা যে অগতী শবাই গানে,
ওদের কথায় ফোটে না ইন্দ্রধনু—
সে-জাহ্নব কেবল সাগরই তখন জানে ।

তাই তো সেদিন সাগরে পাঠালে গ্রেম,
সাগর নিজেকে তোমার তরেই সাভায় ।

কিন্তু হঠাৎ ক' যে হয় তার পরে :
চেউয়ের বাসরে দোল খায় ঘনঘটা,
এপারে-ওপারে আকাশ আছড়ে পড়ে—
সহাকাল তার দিগন্তে বাড়ে জটা ।

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪

চকিত কাতর শাগর দাঁড়ায় ঘুরে,
সূর্যের মুখ স্নানসম্পাতে কালো,
সংগীত মরে ঝড়ের অশ্রুঘুরে,
মেহ ঢেকে নেয় কবরে দিনের আলো !

বহুকাল পরে যখন বুট নামে—
শাগর তখন লাক্ষিত দেহে লোটায়।

শাগর-পারের ওপরে বধু স্বন্দরী,
শাগর তোমার মুছিত পদতলে ;
বৃকের গভীরে ডুবেছে সোনার তরী,
বাসি অমৃত-ও একাকার নোনা জলে !

তবুও কি তুমি তাকেই কামনা করো,
বাসনা তোমার গোপনে কি ফুল কোটায় ?

কবিতা

আষাঢ় ১৩৬৭

পোল ভেরলেন-এর দুটি কবিতা

অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রিয় স্বপ্ন

আশ্চর্য, উজ্জল স্বপ্নে অজ্ঞাত নারীর আত্মদর
দেবি আমি, সে-বরবর্গিনী প্রিয়া, আমি প্রিয় তার ;
দেহমনে আদিক্রপা সে আর হবে না, কিন্তু নয়
অদরুপা ; ভালোবাসে, বুঁজে ছাপে রহস্য আত্মার।

সে-মর্গবেদিনী নারী, সমুজ্জল আমার হৃদয়
তার অহুচিন্তনেই,—যা দৃষ্টত একান্ত মরল
তা শুধু তাকেই ভেবে ; আর যে আত্মতা সমুদর
আমার ললাটে, মুছে দিতে পারে তারই অশ্রুদল।

স্বন্দরী, রেশমচুল ; মলিনা, তামাটে ; কিংবা লাল
চুল তার ? কী যে নাম ? কী মধুর প্রতিধ্বনিময় !
প্রেমিক-প্রেমিকাদের দিন যেন চলে ধীর লয়ে।

দৃষ্টি তার, পাখাণের প্রতিমার চোখে বেখাজাল ;
স্বপ্ন তার, শান্তি আর দুঃখে যেন হয়েছে সংশয় ;
উজারণ তার, মৃত প্রেমিকার স্মৃতি আনে ব'য়ে।

বড়ো রাস্তাগুলি

এদো ভবে নাচি !

ভরানক ভালোবাসতায় আমি তার ছুটি চোখ,
তার ছুটি চোখ, যার কাছে ছার তারার আলোক ;
ভালোবাসতায় আমি যে তাদের চকিত চমক।

এসো তবে নাচি !

তার যে জীবন এমনই আর্বাধা ছিল সত্যিই,
মানে না শাসন সে-স্বপ্ন, ছিল মগুতে ভক্তি ;
আর সে, জীবন নিলো ; যেন নেই মায়ার স্বত্তি ।

এসো তবে নাচি !

তারপরে শুরু হ'য়ে যায় তার স্বত্তির বেদন,
ফুলের মতন অধরে ঢেলেছে কতো চূষন...
তখনো আমার ফুলে যে তার হয়নি মরণ ।

এসো তবে নাচি !

মনে পড়ে যায়, মনে পড়ে যায়, তাকে আজো হয় !
যন চিত্তার ফুহেলিকাজালে সম্মারবেলায়
সব চেয়ে সেই নিরালা প্রহরে তাকে ভাবা যায় ।

এসো তবে নাচি !

স্বত্তিচিত্র

গোপাল ভৌমিক

স্বত্তিগুলি স্থির চিত্র
ফ্রেমে-ফ্রাটা মনের অ্যালবামে :
খুশি হ'লে গুলি পাতা
উন্টে বাই উন্মন খেয়ালে ;
অতীতের অভিক্ষেপে হই যদি নেহাং বিমনা
প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসি আর গুলবো না ।

আমি তবু ভাগ্যবান,
স্বত্তিগুলি চলচ্চিত্র নয় ;
হ'লে তার সঞ্চরণে
প্রতিদিন শরীর—গময়
বিদ্ধ হ'ত ক্ষমাহীন যজ্ঞার শরে ।
যেত না সাধনা করা অতীতের শবের উপরে ।

এখন সে জাহ্নবীর :
খুশি হ'লে যেতে পারি
তুলতেও পারি ইচ্ছে হ'লে ।
হাসি- ও বেদনামাধা
স্থির চিত্র আমি দেখি
বর্তমান-আবশিতে মুগ্ধের বদলে ।

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪

অপূর্ণের অন্তিম মন্ত্র

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আশীর্বাদ করো, হে চরম কুটিল, হে পরম সরল, হে মহান। আশীর্বাদ করো।
আশীর্বাদ করো এই হাওয়া, দুঃখ বেদনা আনন্দ, আশীর্বাদ করো।
আশীর্বাদ করো হাই তোলা, আশীর্বাদ করো তুচ্ছতা, আশীর্বাদ করো
স্বর্গস্তের মেঘের মহিমা। আশীর্বাদ করো।

কেন আশীর্বাদ? কারণ তাইতেই যে খোলে পথ, তাইতেই ছল কোটে।

এই দিন, এই বাত, এই চিরকাল ধরে আমি এক সজ-শেষ-করা কবিতার
কবি, মুখে টক-টক গন্ধ, বুকে বেদনা। বা শেষ করেছে, তা পেল না হর
সমাপ্তির, যা আরম্ভ করব, তার বাজেনা আগমনী। ওগো আমার লাগল না
ভালো, আশীর্বাদ করো।

তোমার মুখ কেবলি ভ্রূণে ওঠে, আর হারিয়ে যায়। এই পথে, এই
ভিড়ে, এই অনন্ত গাড়ির স্রোতে, এই মারি-মারি অট্টালিকার। কখনো
আমখানা চোখ, কখনো চোঁটের একটি কোণ। ভ্রূণে ওঠে, হারিয়ে যায়।
আশীর্বাদ করো। গও-খণ্ড মহুর্ভের খোঁড়া অহুতব চলন না সকাল-বিকাল-
সন্ধ্যা ধরে রাজির শিবিরে। আশীর্বাদ করো।

শুধু আমি, আমি আর আমি। এই দীনতা, এই অহংকার, আশীর্বাদ
করো। যা-কিছু হইল বাইরে আমার, যা-কিছু চাইল আলো, যা-কিছু চায়নি
আলো এখনো, আশীর্বাদ করো।

তুচ্ছতার রয়েছ তুমি, অপূর্ণতার হেসেছ তুমি। তোমাকে ভালোবাসার
প্রচণ্ড স্পর্শ আমার, আশীর্বাদ করো।

কবিতা

আষাঢ় ১৩৬৭

দুটি কবিতা

ভারাপদ রায়

ঈশ্বরপ্রতিম

সব নারিকেলতরু স্থির, জানি কীণ আন্দোলনে
এদের সম্মতি নেই। নিশ্চিত বাড়বে পূর্বাভাসে
ঈশানে জমেনি মেঘ, তবু স্থির অন্ধকার আসে,
আসে অন্ধকার, শূন্য অন্ধরাত্রি, জীবনে-মরণে।
আমি এই অন্ধকার কিংবা মৃত্যু কিংবা সনাতন
ঈশানের পুরুষোত্তম প্রার্থনা করিনি; দিনশেষে
তবু এই অধীনের মলিন অঙ্কলি গেলে ভেসে,
প্রাবৃত সজ্জল স্রোতে বুড়িয়ারা ভাষালো গগন।

কে তোমাকে সব দিলো; এই স্থতি স্তোত্রমেঘভার
গোপালির তীর বৃষ্টি, জলমিত্র অস্পষ্ট পৃথিবী;
উর্ধ্বশ্রী নারিকেল, বৈচিত্র্য, রক্ষ উইচিবি,
প্রাচ্যে ভাষালো সব, সব নীমা, তীর স্রোতধার,
বাইরে জিব্বনময় অন্ধকার মূখর অসীম,
কেউ কাউকে ডাকবে না, এই বৃত্ত তোমার একার,
এই জলময় ঘাঁপ, এই ঝড়-জল-অন্ধকার
দিগন্তে বিদ্যামলতা, ত্রাণে, দীপ্তি ঈশ্বরপ্রতিম।

মালিনীর প্রতি

ধোবন সমীপে এসে দাঁড়ানো না; দূরে যথা স্থিতি,
বর্তমানে প্রবাহিত; যথা গ্রামপ্রান্তে স্রোতধিনী

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪

তীরবর্তী স্পন্দমান—অহরূপ থাকো ; হে মালিনী,
তোমার মালক হতে একটি কুহব শুধু প্রীতি-
উপহার দিতে পারো। কোনোদিন পোখুলির তীরে
চিরাপিত অলিন্দে দাঁড়াতে পারো ; উজ্জল ছায়াশা,
অথবা বসন্ত কালে নগরীর প্রান্তে কিরে-আশা
স্বীণায় দাক্ষিণ্যে থাকো আবর্তিত বিখ্যাত নদীরে।

এতদিন এত যন্ত্রে কী ফোঁটালে, পদ না পলাশ ?
যা-কিছু ফোঁটাও তুমি মাঝিভবা তোমার একার,
এই ক্লান্ত জনপদে চিরায়ত স্বদীর্ঘ যাত্রার
আমি অহুগামী সাজ, আমি জীবিকার ক্রীতদাস,
অমাজারী ; প্রতিদিন তোমার কাননে, হে মালিনী,
হুটুক বিবিধ পুষ্প। তুমি থাকো অন্তহলে দুঃ,
দুঃস্বপ্ন দিনের উর্ধ্বে চিরস্বামী লাবণ্যে মধুর
প্রীতিবহ ; তুমি থাকো সৃষ্টিময় স্বপ্নাঙ্গ কাহিনী।

কবিতা

আষাঢ় ১৩৩৭

সেবা

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

এবার কেহ এসে নিবিড় ভালোবাসুক।
উষ্ণ-শীতল, লুক্ক-ফিকে, শাদা-কালো
অনেক রকম পা ফেলেছি চতুর্দিকে ;
উপবনে গছশিকার ক্লান্ত করে।

হাতের কাছে হুটুক কেহ আপন তাপে,
অল্পলিতে মধু স্বধা নিরভিমান।
বৃক্কের ভলে ছায়া দোলক নীল জলাশয়
তেউ যেন না ছুঁবিনীত আগের মতো।

ডেকে না সেই উল্লসিত বণাদনে
যুদ্ধ বড়ো নেপায় নাসারক্ক, রাহ
উষ্ণ ক'রে কাঁপার বড়ে, অজ্ঞাঘাতে
লুপ্তিত শোক দ্বায় রচে ঘোর বিরহ।

অবটিকে দাঁও ছেড়ে নীল দূরের মাঠে ;
শাখায় যুদ্ধ ছুটছে পাভা, ঠাণ্ডা যুশি।
হঠাৎ ভালো লাগে সেবা, জানি না তো—
কতক্ষণ এ-ভাবের নেশা ; স্থির জলাশয়
কতক্ষণ যে ধরবে ছায়ার পরমায়ু।

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪

অল, ভুলগুণ, আত্মা—

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

‘আত্মার বয়স কতো, মাঝিভাই?’ ‘মধ্যরাত্রে উঠে
রয়েন স্নিগ্ধাশা করে : ‘তুমি কি কখনো করপুটে
আত্মা রেখে তার উত্তাপ গ্রহণ করেছে? বলা তার
বাহির শীতল কেন? যেমন এনদীর কিনার,
নিসাড়, সহস্র দুখে বা কাড়ে না, তেমনি আত্মার
নয় প্রচ্ছদপট? সে-মলাট যদি যেতো টুটে
তবে কি স্ববীক্ষণায় সরতেন না শমী’র মৃত্যুতে?’

আকাশপগড়া

নবনীতা সেন

বৃথা চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আকাশে তাকাও।
পবিত্র, নিমুক্ত, বৃদ্ধ, অশোক অশীমে
সিদ্ধির দায়িত্ব ভাঙো, ভরসিত তার।
একে-একে চলে ওঠে।

আকাশে তাকাও,
মধ্যরাত্রে দিব্যরক্ত এমন বিদেশও
নহা বাজাবে ঘণ্টা অকালবোধনে।

কবিতা

আর্ঘ্য ১৩৬৭

স্রবণ : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

ইন্দিরা দেবীর জীবন ও সাধনাকে ধারা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে
জম্বুদ্বীপে সংলগ্ন একটি স্থানে যন্ত্র হিসেবে দেখেন, বর্তমান লেখক তাঁদের
অহুপদী মন। একথা বলে ইন্দিরা দেবীর ভৌগোলিক তথা ঐতিহাসিক
প্রেক্ষণিককে আমি অস্বীকার করছি না। শুধু এই কথাটাই স্পষ্ট গলায়
উচ্চারণ করতে চাই, ও-রকম বিচার আপেক্ষিক তো বটেই, উপবন্ধ
বহির্বিষয়কী।

এর কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব, এবং সেই ব্যক্তিত্বের চাহিদা। স্বজনের চেয়েও
সৃষ্টিরক্ষার বেদনা, উদ্ধারনার চেয়েও গুহ্যতার দায়িত্ব যে বড়ো কম নয়,
সে কথা তিনি প্রয়োগসিদ্ধরূপে বুঝেছিলেন। সৃষ্টি বলতে অবশ্য তিনি স্ববীক্ষ-
ণাত্মক প্রাথমিকসত্তারকেই বুঝেছিলেন। সৃষ্টিসংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর ছিলো
জ্ঞানবিশ্র ভক্তিবোধীর ভূমিকা।

জ্ঞানান্বন তাঁর বিশ্বকে মননে পরিণত করেছিলেন। স্ববীক্ষণাধ কথ্য
বলেছেন প্রত্যেক ধ্যান থেকে, প্রথম চৌধুরী—অনেক সময়েই—স্বকপোল-
নির্গীত ধারণার বশে। ইন্দিরা দেবী কিন্তু সমস্ত কিছুই সংজ্ঞা থেকে আরম্ভ
করতেন। এই সংজ্ঞাসন্ধিসা থেকেই তাঁর এত স্বাধাধ হবার পরিশ্রম,
অহুস্বে স্বচ্ছতার উপনীত হতে চাওয়ার তাগিদ।

তাঁর স্বরলিপিচেতনার মূলেও সেই একই প্রবণতা কাজ করছে। স্ববীক্ষ-
সংগীত-শিক্ষার্থীর সৃষ্টিতে তিনি স্বরলিপির সরস্বতী হয়ে বিরাজ করতেন।
গানের পবিত্রতা বজায় রাখবার প্রয়োজনে স্বরলিপির উপযোগিতার কথা
জোর করে বোঝানোর দরকার করেন না। সে একরকম স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়
বলা চলে। কিন্তু ইন্দিরা দেবী সিদ্ধান্তে আসবার আগে আবার ভালো করে
ব্যাপারটাকে খুঁটিয়ে দেখে নিতে চান। তাই বৈশিষ্ট্য এবং মার্গমিত পদ্ধতির
ভুলনা করতে গিয়ে তাঁকে বলতে হয় : “পাছে কেউ মনে করেন যে আমি
গায়ের জোরে একথা বলছি, সেইজন্য আমি স্বরলিপির মূল উপাদান একটু

কবিতা

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪

বিস্লেষণ করে দেখাতে ইচ্ছা করি।—ঐতিহ্যগত স্বরকে প্রথম দুটিগোচর ও পরে কঠর ও যন্ত্র করাই স্বরলিপি মুখ উদ্বেগ, একথা সর্ববাদিসম্মত। আমি যা কানে শুনিছি, কোন চিহ্ন বা অক্ষর যারা সেটিকে এমন বিশদভাবে লিখতে হবে, যাতে সেই লিপি অপর-যারা কানে না শুনেছে, তারাও লিখিত হয়টিকে অবিকল গলায় বের করতে পারে।”

তার এই সত্যকর্তার মধ্যেই তিনি বরীন্দ্রসংগীতের মুখোমুখি হয়েছিলেন। “ভাড়া গানের তালিকা” রচনা করে বরীন্দ্রনাথের গানে অপরাপর হরের ধারা এবং ভাবধারার প্রভাব নির্ধারণ করেছিলেন। কাছটি যে কতোখানি অসমাপ্য, তার “বরীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেদীসংগম” নামক প্রাথমিক পুস্তিকার হুচ্চাক বিদ্যাস দেখে একথা ক’জন বুঝেন, জানি না। কিন্তু ধারা কখনো না-কখনো তার কাছাকাছি এসে পড়েছেন, তারাই জানেন, মরণ এতটুকু শিল্পরূপে পৌছবার জ্ঞাত কী অসিতপরিমাণ কান্তি তিনি স্বয়ং করতেন। এক তবকের একটি পানও কেউ কখনো তাঁর কাছে একদিন শিখে উঠতে পেরেছেন কিনা, আমার জানা নেই। কারণ প্রতিটি পঞ্জির প্রচ্ছাদ্য, প্রত্যঙ্গের স্থাপত্যের মধ্যে তিনি তাঁর শিক্ষাবীর মারিধ্যসাধন করাতেন। ফলে হয়তো একটি চরণ শিখে নিতেই একটি বিন কেটে যেত।

ক্রমবিক্রম জনপ্রিয়তার সঙ্গে-সঙ্গে বরীন্দ্রসংগীতের মায়কী আর গায়কীর অনিবার্য ব্যবধান দ্রুতরত্নর হচ্ছে। শহরের অলিতে-গলিতে নিত্যনতুন গীতায়তন গুলিতে পল্লবগ্রাহকদেরই নৈদাঘ্য। অতীতের বরীন্দ্রসংগীতের বিশেষজ্ঞদের নিজ-নিজ সংস্কারের অসুখ স্বরাজ। আবার, বরীন্দ্ররচিত গানের অংশীদারের পক্ষে নিশ্চয় “যতো মত ততো পথ” নীতি বাটে না। ইন্দিরা দেবী তাঁর স্বাভাবিক ও হৃগুজীর অসন্তোষ নিয়ে রবিশ্রদ্ধাধিকপথটিকে পরিচ্ছন্ন রাখতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি শান্তিদের, শৈলজারতন কি অন্যদি দৃষ্টিদার কারো মতামতই তুচ্ছ করতেন না, পরন্তু তাঁর শিষ্টপ্রতি

১. মায়কী—পৃথিবী বিতা, শান্তিদের তর।

গায়কী—ভ্রমরী বিতা, শিককমিধনিত, য. রাহিস্যপেক প্রয়োজিত।

কবিতা

আবাত ১৩৬৭

সত্যীদের অবর্তিত গীতবীতি ও স্বরলিপি সংক্রান্ত যে-কোনো সংবাদই তাঁর কাছে সমগ্র বিবেচনা লাভ করেছে। কিন্তু, অস্তিত্ব বিবেষণে, তিনি ঠিকই বিভিন্ন পথের মধ্য দিয়ে পথ কেটে সেই রাস্তাপথে এসে দাঁড়াতে, যার নাম বরীন্দ্রসংগীত। আর স্বরলেখগুদ্বিই ছিলো তাঁর সেই আত্মীবন-অন্তঃস্বত মন্ত্র যার সাহায্যে তিনি এই পথে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ইন্দিরা দেবী শিল্পকে বিজ্ঞানের মধ্যবর্তিতায় অবস্থিত রাখতে চেয়েছিলেন। বরীন্দ্রসংগীতের মায়কী ও গায়কীর একটি মীমাংসামূলক সেলবন্ধনে তিনি বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর এই সব কাটন কার্যকরী যখন বুঝিনি, সেই যজ্ঞন ছাত্রাবস্থায় তাঁকে আমি আরেকভাবে জেনেছিলাম, আরেকভাবে নির্বিড় শ্রদ্ধাঞ্জলির অপ্রতিহত স্বযোগ পেয়েছিলাম। শান্তিদের তন পাঠভবনের সমান্ত একজন বালক হলেও ঔৎসাহ্য দিয়ে তিনি আমার সম্মানিত করেছিলেন। সেই বন্ধু-খারক নির্বিষ্ট জ্ঞাপর জ্ঞাপি, সেই, মুকুল-বরাধা আলাপগঠা আমি কিছুতেই ভুলতে পারবো না। আর যখন এই স্মৃতিরেখা আঁকতে বসেছি, তাঁর শারীরীয় মুখমণ্ডল ব্যাবহার এসে আমাকে অতনমক করে দিচ্ছে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

[পরপৃষ্ঠায় গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন প্রত্যা]

কবিতাজন, ২-২২ রাসবিহারী এলিফট, কলকাতা ২০ থেকে প্রকাশিত ও মাদ্রাসা মিটিং ওয়ার্কস
গ্রাইন্ডেট লিমিটেড, ৪৭ পেনসিল এলিফট, কলকাতা ১০ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক : মুদ্রকের বর

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

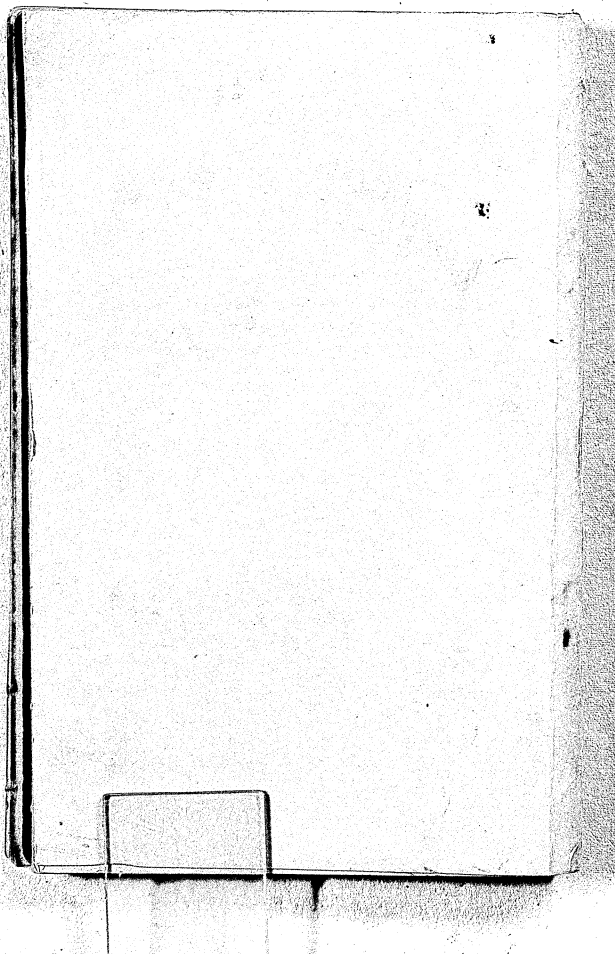
‘কবিতা’র এই আষাঢ় সংখ্যার সঙ্গে আপনাদের বর্ষ ২৪-এর চাঁদা নিশ্চেষ্ট হ’লো। বর্ষ ২৫-এর প্রথম সংখ্যা (আখিন, ১৩৬৭) আপাদী ভিত্তির মাগের প্রথম ভাগে প্রকাশিত হবে। আমাদের বিশেষ অহরোধ এই, ২০শে নবেম্বরের মধ্যে আপনাদের নতুন বছরের চাঁদা (চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে ছয় টাকা) মনি-অর্ডারযোগে অহগ্রহ ক’রে পাঠিয়ে দেবেন। ধারা গ্রাহক থাকতে আর ইচ্ছক নন, তাঁদের নিযেধাজ্ঞাও ঐ তারিখের মধ্যে পৌছনো দরকার। চাঁদা বা নিযেধাজ্ঞা ধারা পাঠাবেন না তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আখিন সংখ্যাটি বার্ষিক মূল্যের ভি. পি. ডাকে আমরা পাঠিয়ে দেবো; বাস্তবসম্মত বরচ পড়বে পাঁচ টাকা, ধারা রেজিস্টার্ড ডাকে পত্রিকা নেন তাঁদের পক্ষে সাত টাকা। ভি. পি. ডাক ব্যবহার করতে হ’লে আপনাদের ব্যয় ও আমাদের পরিশ্রম অনেকটা বেড়ে যায়, উপরন্তু ভি. পি. কেবল এলে আমাদের যা বার্ষিক ক্ষতি ঘটে তা তুচ্ছ নয়; অন্তর্য পুনশ্চ অহরোধ জানাই যে কোনো কারণে চাঁদা যদি স্বাধীনসময়ে পাঠাতে না পারেন, অন্ততপক্ষে ভি. পি. প্যাকেটটি কেবল দেবেন না। মনি-অর্ডারে চাঁদা পাঠাবার সময় নিম্নোক্ত নিয়মগুলি অহগ্রহ ক’রে মনে রাখবেন :

- (১) কুপনে নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর স্পষ্টভাবে উল্লেখ্য।
- (২) নতুন গ্রাহকেরা “নতুন গ্রাহক” কথাটি কুপনে লিখে দেবেন।
- (৩) যদি ইতিমধ্যে ঠিকানার বদল হ’য়ে থাকে, নতুন ঠিকানাটি কুপনে বা যতদূর চিঠিতে লিখে জানাবেন।

নমস্কারান্তে,

বৃজমোব বসু
সম্পাদক, ‘কবিতা’
কবিতাভবন

২০২ বাসবিশ্বী এভিনিউ, কলকাতা ২০



28

-4*

ISSN